সমরেশ মজুমদার

লীলা-খেলা

তিনরকমের প্রেম

সমরেশ মজুমদার

লীলা-খেলা

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

লীলা-খেলা

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

LILA-KHELA
(Collection of 3 Romantic Novels)
by
Samares Mazumder

ISBN 978-81-8374-273-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুদীপ্ত মণ্ডল

মূল্য—৩০০.০০ টাকা

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com *website* www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

তনুশ্রী ভট্টাচার্য সহৃদয়াসু
রামপ্রসাদ চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু
তপতী ও সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধায়

তিনরকমের প্রেম

সমরেশদা যখন বললেন, 'ছোট উপন্যাস চট করে ফুরিয়ে যায় বলে পাঠক এখন বড় সংকলনের দিকে ঝুঁকেছে', কথাটা একবাক্যে মেনে নিয়েছিলাম।

লেখক নিজেই পরামর্শ দিলেন, 'স্বপ্নেই এমন হয়, লীলাসুন্দর এবং সোনার শেকল—এই তিনটিই মূলত প্রেমের উপন্যাস। এই তিনটি উপন্যাসকে একমলাটে এনে ফেলো। পাঠক খুশি হবে। আলাদা-আলাদা বইগুলো যেমন আছে, থাকুক। যারা যেমন চান, তেমন নেবেন।'

দারুণ উপদেশ! স্বপ্নেই এমন হয়-তে ফ্যান্টাসি প্রেম, লীলাসুন্দর রোম্যান্টিক থ্রিলার, যেখানে খুনোখুনি বৈধ-অবৈধ প্রেমকে ঘিরে এবং সোনার শেকল-এ দেখছি এক অসহায় বাঙালি ছেলের বিদেশযাত্রা ও দুই অসমবয়েসি নিঃসঙ্গ মহিলার তীব্র আকর্ষণ।

সমরেশ মজুমদারের সরস উক্তি, 'তবে তো তিনরকমের প্রেম।'

২৬ ডিসেম্বর ২০১৩
কলকাতা

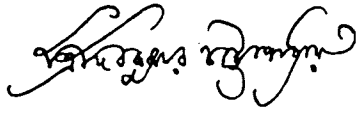

সূ চি প ত্র

লীলাসুন্দর ১১
সোনার শেকল ৯৩
স্বপ্নেই এমন হয় ১৮৩

লীলাসুন্দর

প্রথম অধ্যায়

দুর্যোধন মিত্র ভালো করেই জানেন যে, এই পাহাড়ি শহরে তাঁর কোনও বন্ধু নেই। লোকে তাঁকে ঈর্ষা করে, তাঁর সম্পর্কে বাঁকা কথা বলে। কিন্তু সেসব বলে তাঁর আড়ালে। এই জেলায় তাঁর চা-বাগান থেকে সবচেয়ে ভালো চা তৈরি হয় এবং সেখানে কখনও শ্রমিক বিক্ষোভ হয়নি। এই না হওয়ার পেছনে দুটো কারণ আছে। দুর্যোধন মিত্র বলেন, মালিক হিসেবে তিনি অত্যন্ত পেশাদার। শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে প্রচুর সুযোগ-সুবিধে এবং ভালো মাইনে দিয়ে থাকেন, যা অন্যান্য চা-বাগানে গেলে তারা পাবে না। নিন্দুকদের বক্তব্য হল, শ্রমিকদের মধ্যে যারা নেতা হতে চায় তাদের তিনি কিনে ফেলেন অথবা সরিয়ে দেন। রাতে বাড়ি ফেরার সময় কোথায় তারা হারিয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই নেতৃত্ব দেওয়ার মানুষ না থাকলে বিক্ষোভ-আন্দোলন কে সংগঠিত করবে।

এই জেলায় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার অর্ধেকটাই দুর্যোধন মিত্র নিয়ন্ত্রণ করেন। বাস-ট্যাক্সি ছাড়াও মালপত্র বহন করার জন্য পাহাড়ি এলাকার উপযুক্ত গোটা দশেক ট্রাক তাঁর আছে।

দুর্যোধন মিত্রের দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল অন্তত থ্রি-স্টার হোটেল তৈরি করার। পাহাড় কেটে আড়াই বছরের চেষ্টায় সেই হোটেল শেষ করেছেন ক'দিন আগে। ওপর-নীচের দুটো রাস্তার পাশ দিয়ে পাঁচতারা হোটেল তৈরি করিয়েছেন বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্টদের পরামর্শ নিয়ে। দেড়শো ঘরের ওই হোটেল যাতে ঠিকঠাক চলে তার জন্য দেশের বিভিন্ন হোটেলে কর্মরত দক্ষ কর্মচারীদের এনেছেন বেশি মাইনে দিয়ে।

দুর্যোধন মিত্রের বাসনা ছিল, এ হোটেল উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন। তাঁদের পক্ষে সম্ভব না হলে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তো রয়েছেনই। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রামচন্দ্র বণিক। রামবাবু দশ বছর আগেও এমএলএ ছিলেন। গত দু-বছর ধরে লোকসভার মাননীয় সদস্য। পঁচিশ বছর আগে রামবাবু ছিলেন ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের তরুণ তুর্কি নেতা। একবার ট্রান্সপোর্টের কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে ধর্মঘটের পক্ষে যাচ্ছিল। রামবাবু এসেছিলেন অন্য নেতাদের সঙ্গে দুর্যোধন মিত্রকে হুমকি দিতে; কিন্তু তাঁর কথাবার্তার ধরন খুব পছন্দ হয়ে গেল দুর্যোধন মিত্রের। তিনি দাবি মেনে নিয়ে বললেন, রামবাবুর যুক্তি তাঁকে প্রভাবিত করেছে। শ্রমিকরা খুব খুশি, ধর্মঘট হল না। কিছুদিন বাদে রামবাবুকে ডেকে এনে দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'তুমি ভালো বক্তা, আমি তোমার মধ্যে আগুন দেখতে পাচ্ছি। একটা সামান্য ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়ে রাখছ কেন?'

'আমি আর কী করতে পারি?' থতমত হয়ে বলেছিলেন রামবাবু। 'তুমি মূল রাজনীতিতে এসো। এখন কংগ্রসের অবস্থা খুব খারাপ। যিনি এমএলএ আছেন তাঁকে তো প্রায়ই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। তুমি কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলো। আমিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।' দুর্যোধন মিত্র আশ্বাস দিয়েছিলেন।

সেই শুরু। কয়েক বছরের মধ্যে নির্বাচনে জয়ী হলেন রামচন্দ্র বণিক। তাঁর নির্বাচনের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন দুর্যোধন মিত্র। তার হিসাব দেখিয়ে তিনি নতুন এমএলএ-কে বলেছিলেন, 'তোমাকে আরও এগোতে হবে।'

সেই থেকে এই পাহাড়ে যে কথাটা সবাই জেনেছিল এখানে দুর্যোধন মিত্রের কথাই শেষ কথা, রামবাবু সেই কথাতেই পরিচালিত হন। দ্বিতীয়বার এমএলএ হওয়ার পর রামবাবুর দল পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে উঠল। রামবাবু বিধানসভা থেকে লোকসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দলের একজন বিশ্বস্তজনকে এমএলএ করতে চাইলেন। সংঘাত লাগল তখন থেকেই। দুর্যোধন মিত্র লোকটিকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও রামবাবু সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। রামবাবু ততদিনে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছেন এবং দুর্যোধন মিত্রের দাদাগিরি আর মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু এই সংঘাতের খবর বাইরে প্রচারিত হল না। দুর্যোধন মিত্র রামবাবুর সিদ্ধান্তকে হজম করলেন ধৈর্য দেখিয়ে। বাইরের কেউ তাঁর অখুশির কথা জানতে পারল না।

এখনও রামবাবুর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। কিন্তু তিনি সবক্ষেত্রে দুর্যোধন মিত্রকে অস্বীকার করতে পারেন না। পারেন না কারণ দুর্যোধন মিত্রের অর্থবল বিন্দুমাত্র কমেনি, উলটে বেড়েছে। যে যে উপায়ে সেটা বাড়ছে তা সহজ করতে রামবাবুকেই সাহায্য করতে হয়। অনিচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। রামবাবু ভালোভাবেই জানেন তাঁর জনপ্রিয়তা এখনও দুর্যোধন মিত্রের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। তিনি যে মাঝে মাঝেই রামবাবুর সিদ্ধান্ত মেনে নেন তা নেহাতই একটা ছক, ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত, রামবাবুর রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দুর্যোধন মিত্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। মোটা টাকা তাদের নির্বাচনী তহবিলে দান করেন তিনি। রামবাবু চাইলেও তাঁর দল দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করবে না।

আজ সকালে রামবাবুর ব্যক্তিগত ফোন বাজল। সুইচ অন করে হ্যালো বললেন তিনি। কোনও নাম্বারের বদলে তাঁর মোবাইলে ফুটে উঠেছে প্রাইভেট নাম্বার শব্দ দুটো। এই ফোন কার তিনি জানেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'বলুন দাদা।'

'তুমি কী কথা বলেছিলে?' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ দাদা, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বোধহয় আসা সম্ভব হবে না, কিন্তু অর্থমন্ত্রী রাজি হয়েছেন। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।' রামবাবু বললেন।

'তোমার কথার অর্থ আজকাল আমি বুঝতে পারি না রাম।'

'কেন?'

'তুমি বললে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বোধহয় আসা সম্ভব হবে না। এটা বোধহয় বললে কারণ তিনি এখনও নাকচ করে দেননি। সামান্য হলেও সম্ভাবনা আছে বলেই বোধহয় বললে। অথচ তুমি অর্থমন্ত্রীকে রাজি করিয়ে ফেলেছ। এখন প্রধানমন্ত্রী যদি শেষ পর্যন্ত সময় দেন তাহলে অর্থমন্ত্রীকে কী বলবে? আপনাকে আমাদের দরকার নেই? দুজনকে তো একই কারণে আসতে বলা যাবে না।'

রামবাবু বললেন, 'আমার বলাটা ঠিক হয়নি। প্রধানমন্ত্রী আসতে পারবেন না জেনেই আমি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আগামী সপ্তাহের শেষদিকে উনি তারিখটা জানাবেন।'

'এতদিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তো জানো আমার হোটেলের কাজ শেষ। রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে। তুমি এই জেলার নির্বাচিত সাংসদ। তাই তোমার মাধ্যমেই আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছি।' আর কথা না বলে টেলিফোন রেখে দিলেন দুর্যোধন।

রামবাবু মুখ বিকৃত করলেন। দুর্যোধন ভেবে নিয়েছেন সামান্য শ্রমিক নেতা থেকে বিধায়ক এবং পরে সাংসদ করে তিনি তাঁকে কিনে নিয়েছেন। এই জেলাতে ওই একটি লোক ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে সাহসী হয় না। এই সমস্যার কথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দু-তিনজন নেতাকে বলেছিলেন তিনি, তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন কোনওরকম সংঘাতে যাওয়া বোকামি হবে। তা ছাড়া তাঁদের দলের জন্য শক্ত জমি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন দুর্যোধন। তিনি বিরোধিতা করলে দল বিপদে পড়তে পারে।

রামবাবু সেটা জানেন। গত বছর লোকসভার কয়েকজন সাংসদ ব্যাংকক-মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন শুভেচ্ছা সফরে। রামবাবু সেই দলে ছিলেন। কী মতিভ্রম হল, আর একজন তরুণ সাংসদের পাল্লায় পড়ে গোপনে গিয়েছিলেন ম্যাসাজ ক্লিনিকে। নিষিদ্ধ ফলের রস উপভোগ করেছিলেন। ঘটনার কথা দলের কেউ জানতে পারেনি। দেশে ফিরে আসার পর দুর্যোধন মিত্র জানতে চাইলেন সফর কেমন হল? খুব ভালো হয়েছে বলতে ভদ্রলোক নীচু গলায় বলেছিলেন, 'বাঃ! গুড। তবে ম্যাসাজ ক্লিনিকে গিয়ে তুমি ঠিক কাজ করোনি।'

রামবাবুর মনে হয়েছিল তাঁর শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। কথা হচ্ছিল টেলিফোনে, কোনওরকমে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'শুনতে পাচ্ছ?' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ দাদা।' শুকনো গলায় বলেছিলেন রামবাবু।

'তোমরা হলে জননায়ক। তোমাদের ওপর পাঁচজনের নজর তো থাকবেই। ধরো, যেখানে গিয়েছিলে সেখানে কেউ যদি তোমার ছবি তুলে রাখে তাহলে কী কাণ্ডটাই না ঘটবে। সেই ছবি দেখলে জনগণ তোমাকে ভোট দেবে? পার্টি তোমাকে কি ক্ষমা করবে? একটু ভেবেচিন্তে পা ফেলো!'

'দাদা, আ-আপনি—!'

'আরে না না। আমি তোমাকে কেন বিপদে ফেলব! রাখছি।'

সেদিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন তিনি। কী করে দুর্যোধন মিত্র জানতে পারলেন তা নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। কিন্তু ওই যে ছবির কথা বললেন তা কি এমনি এমনি বললেন? নিশ্চয়ই কেউ তাঁর সে সময়ের ছবি তুলেছে এবং তার কপি জোগাড় করেছেন দুর্যোধন মিত্র। কিন্তু মুখে বললেন বিপদে ফেলবেন না।

অতএব, দুর্যোধন মিত্রকে তোয়াজ না করে রামবাবুর উপায় নেই। বেশ কয়েকবার ভেবেছেন, লোকটাকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়? পাহাড়ি নির্জন রাস্তার বাঁকে ওঁর গাড়ির ছাদে ওপর থেকে বড় পাথর গড়িয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। দুর্যোধন মিত্রের ওপর যাদের রাগ আছে অথচ রামবাবুর কারণে সেটা গিলে ফেলে তাদের দু-একজনকে একটু উস্কে দিলেই কাজটা হয়ে যাবে। পুলিশ ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নেবে। কিন্তু তার পরেই ভাবনাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুর্যোধন মিত্র এ পৃথিবীতে না থাকলে কী হবে। ওই ছবিগুলো তো থাকবে। ওঁকে সরাবার আগে ছবিগুলোকে হাতানো দরকার। ওঁর কিছু হয়ে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে আসে। রামবাবুর স্থির করলেন, তিনি সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। চিরকাল নিশ্চয়ই সময় একরকম থাকবে না।

দুর্যোধন মিত্রের বাড়িটিকে স্থানীয় মানুষ শ্বেতপ্রাসাদ বলে। টিলার ওপরে বিশাল সাদা রঙের বাড়ি। বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। বাড়ির চারপাশের লোহার রেলিংগুলোও সাদা রং করা। গেটে অষ্টপ্রহর প্রহরী থাকে। কেউ দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে প্রহরী টেলিফোনে তাঁর সেক্রেটারিকে জানায়। সেক্রেটারি দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি দিলে তবে গেট খোলা হয়।

অপিস থেকে বাড়িতে ফিরে পোশাক পরিবর্তন না করে দুর্যোধন বাড়ির পেছনের সুইমিং পুলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিকেলের এ সময়টায় তাঁর স্ত্রীকে পুলের পাশের ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখা যাবে বলে তিনি জানেন। দুর্যোধন দেখলেন পুলের জল টলটল করছে। ভেতরটায় নীল রং থাকায় জলের গায়ে নীলচে ছোপ পড়েছে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্ত্রীর পাশে বসলেন তিনি। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চমৎকার আবহাওয়া। তবে মাসখানেক বাদে ঠান্ডা পড়ে যাবে। তখন তোমাকে এখানে বসতে হলে গরম পোশাক ব্যবহার করতে হবে।'

মহিলা সুন্দরী। দীর্ঘাঙ্গী। দিল্লি থেকে গ্রাজুয়েশনের পর ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স করেছেন। অল্প বয়স থেকেই পুরুষবিদ্বেষী এই মহিলা অবিবাহিত থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দুর্যোধনের বয়স তখন পঞ্চান্ন। ছিপছিপে মেদহীন

শরীর এবং বিপত্নীক এ মানুষটি মহিলাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি। একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তাঁর প্রদর্শনীতে এসেছিলেন দুর্যোধন। মোটা টাকার পোশাক কিনেছিলেন। সেদিন আলাপের সময় রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন, দুর্যোধন এক অপূর্ব পাহাড়ি উপত্যকার মুকুটহীন সম্রাট। মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন দুর্যোধন। যাওয়ার আগে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শহরে যাওয়ার জন্য।

বেশ কয়েকবার ফোনে অনুরোধ পাওয়ার পর কৃষ্ণা চৌধুরী তাঁর মাকে নিয়ে এসেছিলেন এই পাহাড়ে। যিনি কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হননি তিনি প্রথম দর্শনেই এ পাহাড়ের প্রেমে পড়ে যান। দুর্যোধনের প্রাসাদ, তাঁর আতিথ্য, সৌজন্যবোধ দেখে খুশি হয়। দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার তিন মাস পরে দুর্যোধন যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন দো-মনা করে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যান কয়েকটা শর্তে। এক, তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তার মানে এই নয় যে, তিনি দুর্যোধনকে অসম্মানিত করবেন। দুই, দুর্যোধনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র যে আমেরিকায় পড়াশোনা করছে, তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবেন না।

দুর্যোধন মেনে নিয়েছেন। তিনটি বছরের বিবাহিত জীবনে কোনও অশান্তি আসেনি। মাঝে মাঝে দিল্লিতে যান কৃষ্ণা, দিন পনেরো থেকে আসেন। তাঁর ওপর দুর্যোধনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

কৃষ্ণা মাথা না তুলে বললেন, 'হঠাৎ?'

দুর্যোধন মিত্র হাসলেন, 'বাড়িতে ঢুকেই মনে হল তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে যাই। এগুলো ব্যবসা একা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে পৃথিবীটাকে ভালো করে দেখি।'

এ সময় দুর্যোধন মিত্রে কোটের পকেটে মৃদু বাজনা বাজল।

কৃষ্ণা চোখ সরালেন, 'দেখছ তো, ব্যবসা তোমাকে ছাড়বে না।'

সেলফোন বের করে বন্ধ করতে গিয়েও নাম দেখে ওটাকে অন করলেন দুর্যোধন মিত্র, 'কী ব্যাপার।'

'এইমাত্র সরাসরি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল, সামনের মঙ্গলবার বিকেল তিনটে থেকে চারটে সময় দিয়েছেন। দিল্লি থেকে সকালের ফ্লাইটে আসবেন। নিজের শহরে একটি মিটিং করে এখানে পৌঁছবেন তিনটের সময়। তার মানে মাঝখানে তিনদিন সময় আছে। আমি বলেছি আপনার সঙ্গে কথা বলে কনফার্ম করব। এত বড় ব্যাপার আয়োজন করতে সময়টা একটু কম হয়ে যাচ্ছে না?' রামবাবুর গলায় উদ্বেগ ধরা পড়ল।

'কোনও উপায় নেই। যুদ্ধটা জিততেই হবে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সঙ্গে আমি কথা বলেই রেখেছিলাম, রাতে কথা বলব। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা—'

'বলুন দাদা।'

'তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সেলফোন বন্ধ করলেন দুর্যোধন। হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, 'দুটো ভালো খবর আছে কৃষ্ণা।'

'তাই?' সোজা হয়ে বসলেন কৃষ্ণা। চোখে কৌতূহল।

'আগামী মঙ্গলবার হোটেল উদ্বোধন করতে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী এখানে আসছেন। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।'

মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা, 'অভিনন্দন। সত্যি এটা আনন্দের খবর। কী নাম রাখছ হোটেলের? ঠিক করতে পেরেছ?'

'তোমার বলা নামটাই পছন্দ করলাম।'

'সত্যি?' হাত বাড়ালেন কৃষ্ণা হাসিমুখে।

সেই হাত ধরে আঙুলের গায়ে ঠোঁটে চাপ দেন দুর্যোধন। 'সত্যি।'

'উদ্বোধনের দিনেই অ্যানাউন্স করবে?'

'সিওর। অর্থমন্ত্রী বোতাম টিপলে পরদা সরে যাবে। তখন নামটা সবাই পড়তে পারবে। হিলটপ।' হাসলেন দুর্যোধন মিত্র, 'আমি তখন ঘোষণা করব যে নামকরণ তুমিই করেছ।'

'সো নাইস অব ইউ। এবার দ্বিতীয় ভালো খবরটার কথা বলো।'

'তুমি কীভাবে নেবে আমি বুঝতে পারছি না।'

কৃষ্ণা কথা না বলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'সুন্দর কলকাতায় আসছে, নেমেই সকালের ফ্লাইট ধরবে। এখানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে। এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে বলেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণা। কয়েক পা এগিয়ে রেলিংয়ে হাত দিয়ে জলের দিকে তাকালেন। দুর্যোধন মিত্র স্ত্রীর পাশে চলে এলেন, 'কৃষ্ণা।'

মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা, 'এটা তোমার কাছে ভালো খবর হতেই পারে কিন্তু বিয়ের আগে আমি তোমাকে যে শর্ত দিয়েছিলাম সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি!'

'কিন্তু কৃষ্ণা, আমাদের বিয়ে তিন বছর হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে ওর কোনও কথাই হয়নি। ও ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, তুমি রাজি হওনি, এ তিন বছর আমি ওকে দেশে ফিরতে দিইনি। ও আসুক, ওর সঙ্গে আলাপ করো, হয়তো তোমার ওকে পছন্দ হবে। আফটার অল ও তোমার ছেলে।'

'ছেলে? ওর বয়স কত?'

'সাতাশ।'

'তাহলে তো এগারো বছর বয়সে আমাকে মা হতে হত। তুমি কী করে ভাবতে পারলে একজন সাতাশ বছরের যুবককে দেখে আমার মধ্যে মাতৃভাব জেগে উঠবে? তা ছাড়া তোমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বা তার সন্তানের ছায়া যেন আমার ওপর না পড়ে, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।' কৃষ্ণার চোখ ভিজল।

'আমি চেষ্টা করেছিলাম সুন্দর যেন আমেরিকায় থেকে যায়, কিন্তু...।'

'কিন্তু...!'

'ওর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আর এক্সটেন্ড করছে না।'

'কেন?'

'কী বলব! একটি মহিলাঘটিত মামলায় ও জড়িয়ে গিয়েছিল।'

'চমৎকার।'

'আমি সেটা জেনে ওকে খুব ভর্ৎসনা করেছি। ও ক্ষমা চেয়েছে।'

'ওয়েল, তোমাকে একটা অনুরোধ করছি। কাল সকালের দিল্লি ফ্লাইটের টিকিট কেটে দাও। আমি ওখানে অনেক বেশি কমফোর্টেবল থাকব।'

'সে কী! তিনদিন পরে অর্থমন্ত্রী এসে হোটেলের উদ্বোধন করবেন আর তুমি কালই চলে যেতে চাইছ। আর ইউ ম্যাড?'

'এখনও নয়। তবে থাকলে হয়ে যেতে পারি।'

'কৃষ্ণা, প্লিজ, একবার ভেবে দ্যাখো, তুমি চলে গেলে আমি কী ব্যাখ্যা দেব? এত বড় একটা প্রজেক্ট উদ্বোধন করতে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী আসছেন আর আমার স্ত্রী তার দুদিন আগে চলে যাচ্ছেন, কী কৈফিয়ত দেব?'

'সমস্যাটা তোমার, আমার নয়।'

'তুমি আমাকে এত বড় সমস্যায় ফেলে দেবে?'

'আমি কোথায় ফেলছি? সমস্যা তো তুমি তৈরি করছ।'

'আমি কী করে সুন্দরকে বলি যে এখন তুমি এসো না।'

'সত্যি তো কী করে বলবে। তার চেয়ে অনেক সহজ আমাকে ছেড়ে দেওয়া।' কৃষ্ণা দ্রুত হেঁটে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

মাথা কাজ করছিল না দুর্যোধনের। অর্থমন্ত্রী জানতে চাইবেন মিসেস মিত্র কোথায়? আর কেউ না বলুক রামচন্দ্র বণিক মুখ বন্ধ করে নিশ্চয়ই থাকবে না।

নিজের শোয়ার ঘরে এসে পোশাক পালটে বাথরুমে ঢুকে মিনিট তিনেক স্নান করার পরেও অস্বস্তি গেল না দুর্যোধনের। সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে রাতপোশাক পরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই বাড়ির জানালা সচরাচর খোলা হয় না। প্রবল শীতের সময় ঠান্ডার বদলে গরম হাওয়া মেশিন ছড়িয়ে দেয় বাড়ির সর্বত্র। কাচের আড়াল থেকে দুর্যোধন দেখলেন সামনের পাহাড়ে আলো জ্বলে উঠেছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু ওই দৃশ্য উপভোগ করার মতো মন তাঁর এই মুহূর্তে নেই।

না, কৃষ্ণাকে বাদ দিয়ে হোটেলের উদ্বোধন তিনি ভাবতেই পারছেন না। তাঁর সম্মান একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। অথচ সুন্দর এলে কৃষ্ণা এ বাড়িতে থাকবে না। তিনি কৃষ্ণার ওপর একটু বিরক্ত হলেও রাগ করতে পারছেন না। বিয়ের আগে মহিলা যে শর্ত দিয়েছিলেন এটা তার অন্যতম। দুর্যোধন সে সময় এটা মেনেই নিয়েছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে ঘরে সেলার আছে সেখানে ঢুকতেই উর্দি পরা বেয়ারা ছুটে এলো। দুর্যোধন একটা লম্বা টুলে বসে বললেন, 'লার্জ হুইস্কি।' বেয়ারা পরম যত্নে সেটা তৈরি করে ন্যাপকিনে জড়িয়ে সামনে রাখল। রেখে নম্র গলায় বলল, 'সঙ্গে কী দেব স্যার?'

তখনই দুর্যোধনের খেয়াল হল তাঁর খিদে পেয়েছে। কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন, 'কয়েকটা কাজু দাও। আর আলোগুলো কমিয়ে দিও।'

আদেশ মান্য করে বেয়ারা বেরিয়ে গেলে দুর্যোধন ওই বড় ঘরে একাকী বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন। আর একবার কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বললে কি লাভ হবে? উত্তরটা তিনি ভালো করেই জানেন। কৃষ্ণার বেডরুম বেশি দূরে নয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর শোয়ার ঘর আলাদা করে নিয়েছিল কৃষ্ণা। যেদিন একত্রে থাকার বাসনা হত সেদিন সন্ধ্যা থেকেই আবহাওয়া পালটে যেত। এই বয়সে মা হতে চায়নি কৃষ্ণা। এখন সন্তান হলে তাকে মানুষ করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাবেন না জেনে জোর করেননি দুর্যোধন। কিন্তু এর জন্য তাঁদের মিলনে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু আজ আবহাওয়া অন্যরকম। এখন ওর ঘরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। গ্লাস শেষ হল। এ বাড়ির বেয়ারারা শিক্ষিত। তাই আড়ালে থেকেও তাঁরা নজর রাখে প্রভুর ওপর। দ্বিতীয়বার গ্লাস পূর্ণ করে দিয়ে গেল বেয়ারা।

দুটো চুমুক দেওয়ার পর সেলফোন বের করলেন দুর্যোধন। এখন নিউইয়র্কে সকাল সাড়ে দশটা। সন্ধ্যাবেলা কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লির ফ্লাইট ধরবে সুন্দর। তারপর প্লেন বদলে কলকাতায়।

নাম্বারটা টিপলেন দুর্যোধন। আড়াই সেকেন্ডের মধ্যেই রিং শুরু হল। বাজছে, বেজেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত সেটা থেমে যেতে শুনতে পেলেন তাঁকে বলা হচ্ছে যদি কিছু বলার থাকে তা বলতে, রেকর্ড করে রাখা হবে। খুব বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দিলেন দুর্যোধন।

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার পরে আবার মোবাইল চালু করলেন তিনি। রিং হচ্ছে। পাঁচবার বাজার পর ছেলের ঘুমজড়ানো গলা শুনতে পেলেন, 'হু দ্য হেল ইউ আর? ওঃ।'

'সুন্দর!' দাঁতে দাঁত চাপলেন দুর্যোধন।

একটু চুপ করে থেকে গলার স্বর স্বাভাবিক করতে চাইল সুন্দর, 'ওঃ ড্যাডি। তুমি এই সময়ে ফোন করবে ভাবতে পারিনি।'

'সাড়ে দশটা বেজে গেছে অথচ তুমি ঘুমাচ্ছ?'

'কাল লেটনাইট হয়ে গিয়েছিল। রাত তিনটের সময় ফিরেছি।'

'হোয়াট?'

'ওয়েল, ইট ওয়াজ মাই ফেয়ারওয়েল নাইট। সবাই ধরল।' একটু হাসার চেষ্টা করল সুন্দর, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে আসার সময় পাবে না। দরকার নেই, গাড়ি পাঠালেই হবে।'

'সুন্দর, তোমাকে আরও কয়েকদিন নিউইয়র্কে থাকতে হবে।'

'কেন?'

দুর্যোধন জানতেন এই প্রশ্নটা তাঁকে শুনতে হবে। বললেন, 'আমার কিছু দরকার আছে। তুমি সামনের সপ্তাহের মাঝামাঝি টিকিটটা চেঞ্জ করে নাও।'

'ওঃ ড্যাডি, আমি এখানকার সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি। এই ফ্ল্যাটের পজেশনও কাল থেকে আমার থাকবে না।'

'এক সপ্তাহের জন্য বাড়িয়ে নাও। এটা আমার ইচ্ছা।'

'তোমার হোটেলের ওপেনিং কবে?'

বিন্দুমাত্র সময় ব্যায় না করে দুর্যোধন বললেন, 'এটা নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী যেদিন সময় দেবেন, তার ওপর।'

'কিন্তু আমি সেদিন ওখানে থাকতে চাই।'

'ভালো কিন্তু তার চেয়ে অনেক জরুরি কারণে তোমার সাতদিন ওখানে থাকা দরকার। ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছ যখন, তখন কোনও হোটেলে গিয়ে থাক।'

'জরুরি কারণটা কী তা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, ফোনটা বাজলে দয়া করে ভয়েস মেলে পাঠিয়ে দিও না। আর হ্যাঁ, সামনের সপ্তাহের কবে টিকিট পেয়েছ তা আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাও। নেটে গেলেই তুমি টিকিট পেয়ে যাবে।'

'আধঘণ্টার মধ্যেই...!' সুন্দরের অনিচ্ছা পরিষ্কার।

'আমি অপেক্ষা করছি।'

মোবাইল অফ করে হাত নাড়ালেন দুর্যোধন। তিনি দুইয়ের বেশি পান করেন না, তা বেয়ারা জানে। দুই শেষ হওয়ায় সে আর সামনে আসেনি। দুর্যোধন শূন্যে হাত নাড়লেন, নেড়ে গ্লাসটা দোলালেন।

তৃতীয় পেগের আধাআধি সময়ে মোবাইল বেজে উঠল। সেটাকে অন করতে সুন্দরের গলা পেলেন, 'নেক্সট উইকের ফ্রাইডেতে। শেষ ফ্লাইট।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন।' ফোন অফ করে উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন।

অত্যন্ত সতর্ক পায়ে করিডোর দিয়ে হেঁটে কৃষ্ণার দরজার সামনে পৌঁছে গেলেন দুর্যোধন। না, তাঁর নেশা হয়নি। হলেও সেটা এত সামান্য যে কৃষ্ণা টের পাবে না। যে সমস্যাটা পাহাড়ের মতো তাঁর মাথায় চেপে বসে ছিল সেটা নেমে যেতে এখন অনেক হালকা লাগছে নিজেকে। তিনি দরজায় নক করলেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলল যে মেয়েটি সে কৃষ্ণার চব্বিশ ঘণ্টার আয়া। তাঁকে দেখেই কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'মেমসাহেবের খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে আছেন।'

'ওষুধ খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' বলেই মেয়েটি ইতস্তত করল, 'আমি আসছি।'

আয়া ভেতরে চলে গেলে দুর্যোধন ঘরে ঢুকলেন। কৃষ্ণার বেডরুমে যেতে হলে এই ঘর পেরিয়ে যেতে হবে। রাতে শোয়ার সময় ছাড়া আয়া এই ঘরেই থাকে। মিনিট খানেকের মধ্যে আয়া বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে, 'উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন স্যার।'

দুর্যোধন ভারী পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলেন হালকা নীল আলো জ্বলছে। কৃষ্ণা শুয়ে আছেন সাদা রাত পোশাক পরে।

দুর্যোধন ডাকলেন, 'কৃষ্ণা।'

স্থির শুয়ে থেকে কৃষ্ণা বললেন, 'জরুরি না হলে কাল কথা বলব।'

'ওষুধে কাজ হয়নি?'

'এটা জরুরি কথা নয়।'

'কৃষ্ণা, আমি খুব দুঃখিত। আই মিস ইট।'

'ধন্যবাদ।'

বিছানার পাশে চলে এলেন দুর্যোধন, 'এভাবে বলো না। আমি তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না।'

'এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না।'

'আমি বিয়ের আগে তোমাকে যে কথা দিয়েছি তা রাখব।'

'কীভাবে? তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাকে তুমি চাও।'

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'না। নাওনি। আমাকে স্তোকবাক্যে ভোলাতে চাইছ। সুন্দর তোমার ছেলে, তার ওপর তোমার স্নেহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি একজন সাতাশ বছরের যুবককে নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারছি না। লোকে স্টেপমাদারদের দুর্নাম দেয়। কিন্তু তাদের সমস্যার কথা ভাবে না। তার ওপর ওই ছেলে এই বয়সে ওম্যানাইজার হিসেবে যে কুখ্যাতি পেয়েছে তা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।'

'তুমি এটা জানলে কী করে?'

'তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যখন জেনেছিলাম সুন্দর নিউইয়র্কে থাকে তখন আমার এক বান্ধবীকে বলেছিলাম ওর সম্পর্কে খোঁজ নিতে। তার কাছে জেনেছি। একবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছে সে। যেসব পুরুষ মেয়েদের নিয়ে খেলা করে, তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। এসো।' কৃষ্ণা বলল।

দুর্যোধন হাত বাড়ালেন। কৃষ্ণার ডান হাতের ওপর আঙুল রেখে বললেন, 'আমি সুন্দরকে আসতে নিষেধ করেছি।'

কপালে ভাঁজ পড়ল কৃষ্ণার, 'কখন বললে?'

'একটু আগে?'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। ওর এখন এখানে আসার তেমন কোনও প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু কতদিন? ছেলে তো বাবার কাছে আসবেই।'

ঠিক। কিন্তু এলে ওকে হোটেলের স্যুটে থাকতে হবে। এ বাড়িতে নয়।'

'যদি কারণ জিগ্যেস করে?'

'উত্তরটা ঠিক তখন দেব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'তোমার নিষেধ ও মেনে নিয়েছে?'

'না মানা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।'

উঠে বসলেন কৃষ্ণা, 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

'নিজেকে ছোট লাগছে। আমার জন্য তোমার এই অসুবিধা হল।'

'মোটেই না।' দুর্যোধন আর পারলেন না। স্ত্রীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণা স্বামীর মুখে দামি হুইস্কির গন্ধ পেলেন। গন্ধটা তাঁর ভালো লাগল।

মিনিট চারেক পর দুজনে তৃপ্ত হয়ে পাশাপাশি শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হতে দুর্যোধন নীচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ওষুধ খেয়েছ তো?'

মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা, 'না।'

'মাই গড!'

'চিন্তা করছ কেন?'

'কাল সকালেই ওষুধ খাবে। এখন তো অনেক আধুনিক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার উচিত ছিল তোমাকে জিগ্যেস করে নেওয়া।'

'তুমি বড্ড হিসাব করো।'

'আমি কি আমার জন্য ভাবছি?'

'জানি।'

'তুমি মা হতে চাওনি। তিনটে বছর কেটে গিয়েছে। এখন কোনও দুর্ঘটনা ঘটুক তা আমিও চাই না।' দুর্যোধন বললেন।

'দুর্ঘটনা বলছ কেন? তোমার কি ভালো লাগেনি?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে এ নিয়ে ভেবো না।'

'যদি কনসিভ করো?'

'হলে হবে।' হাসলেন কৃষ্ণা।

'কী বলছ তুমি?' অবাক হয়ে গেলেন দুর্যোধন।

'আজ এখন মনে হচ্ছে আমি মা হতে চাই। আমার নিজের একটা সন্তান হোক। আই উইল প্রে, প্রার্থনা করব।' কৃষ্ণা বিছানা থেকে নেমে গেলেন।

ঠিক বেলা ১১ টায় দুর্যোধন মিত্রের অফিসে মিটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাননীয় সাংসদ রামচন্দ্র বণিক খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর আসতে একটু দেরি হবে। এই দেরিতে আসা একদম পছন্দ করেন না দুর্যোধন। কিন্তু সাংসদ তাঁর কর্মচারী নন যে, তিনি কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেন। নিজেকে মনে মনে বললেন তিনি, 'সহ্য করো, সহ্য করো। উদ্বোধনের আগে মুখে হাসি রাখো।'

এখন তাঁর সামনে বসে আছেন শহরের পুলিশপ্রধান, জেলাশাসক, মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার আর হিলটপ হোটেলের ম্যানেজার অবিনাশ ভার্গব। ভারতীয় হোটেল ইন্ড্রাস্ট্রিতে ভার্গবকে সবাই এক ডাকে চেনে। এরকম একজন মানুষকে বেশি মাইনে দিয়ে হিলটপের দায়িত্ব দিয়ে দুর্যোধন যে একটুও ভুল করেননি তা এই কয়েক মাসে স্পষ্ট হয়েছে।

ঠিক পনেরো মিনিট দেরি করে রামচন্দ্র বণিক ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'আমাকে মার্জনা করবেন সবাই, দেরির জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

দুর্যোধন রামচন্দ্রের স্মার্টনেস দেখে হাসলেন, 'বেটার লেট দ্যান নেভার, কাজ শুরু করা যাক। বসুন মিস্টার বণিক।'

বাইরের লোক সামনে থাকলে দুর্যোধন রামচন্দ্রের নাম ধরে ডাকেন না, তুমিও বলেন না। সাংসদকে সম্মান জানিয়ে তিনি নিজেকেই সম্মানিত করেন।

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'আপনারা সবাই জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহ করে আমার হোটেল

হিলটপের উদ্বোধনে আসছেন। তবে হিলটপ শুধু আমার হোটেল নয়, এই পাহাড়ের গর্ব হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। এরকম একটি আধুনিক হোটেল তিন-চারশো মাইলের মধ্যে নেই। যেসব ট্যুরিস্ট থাকার ভালো জায়গার অভাবে এদিকে আসেন না তাঁরা এখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। অর্থবান ট্যুরিস্ট আরও এলে এখানকার মানুষের রোজগারও বেড়ে যাবে। আমরা অর্থমন্ত্রীকে এই তথ্য দিয়েছি। অর্থমন্ত্রী আসছেন। নীচের এয়ারপোর্টে নামবেন। তাঁর এখানে আসা-যাওয়া এবং থাকার সময় কী ভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে তা আপনারা নিশ্চয়ই ঠিক করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার সাহায্যের দরকার হলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।'

জেলাশাসক বললেন, 'মাননীয় অর্থমন্ত্রী যাতে নিরাপদে নীচের এয়ারপোর্ট থেকে এই শহরে আসা-যাওয়া করতে পারেন তার ব্যবস্থা পুলিশ সুপার করেছেন। কিন্তু এখনও কলকাতা থেকে মাননীয় মন্ত্রীর সম্পূর্ণ সফরসূচি আমি পাইনি।'

রামচন্দ্র বণিক বললেন, 'সবে তো কাল বিকেলে ব্যাপারটা ফাইনাল হল, আজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। আমি যতদূর জানি অর্থমন্ত্রী হোটেল উদ্বোধন করে ঠিক এক ঘণ্টা এই শহরে থেকে নীচে নেমে যাবেন। ওই সময়ের মধ্যে তিনি লাঞ্চ সেরে নেবেন। উনি রাত্রিবাস করবেন নীচের সার্কিট হাউসে।'

পুলিশ কমিশনারের মুখে হাসি ফুটল, 'তাহলে তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। ওঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

জেলাশাসক বললেন, 'তাহলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই শহরে এসে পুরোটা সময় হিলটপের ভেতরেই থাকবেন। আমরা কি আজ হোটেলের ভেতরটা দেখে আসতে পারি? অবশ্য যেদিন উনি আসবেন সেদিন ওঁর নিরাপত্তার জন্য হোটেলের ভেতরে চিরুনি তল্লাশি চালাতে হবে।'

'অবশ্যই।' পুলিশ কমিশনার মাথা নাড়লেন।

দুর্যোধন মিত্র হোটেল ম্যানেজারের দিকে তাকালেন, 'আপনার কিছু বলার আছে?'

'না স্যার। হিলটপ এখন একদম তৈরি। ওঁরা যখন ইচ্ছে ভিজিট করতে পারেন।'

'গুড।'

রামচন্দ্র বণিক বললেন, 'কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যেভাবে আপনারা ভাবছেন শেষ পর্যন্ত তা সহজ নাও থাকতে পারে।'

'মানে? দুর্যোধন অবাক হলেন।

'আমি একটু আগে খবর পেলাম, যার জন্য আমার এখানে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, হিলটপের উদ্বোধনকে ঘিরে অসন্তোষের মেঘ জমছে। সেটা বিক্ষোভে পরিণত হতে পারে।' গম্ভীর মুখে বললেন, রামচন্দ্র।

জেলাশাসক অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'বিক্ষোভ কার বিরুদ্ধে?'

'প্রথমত, হোটেলের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। কারণ তিনি হোটেলটিকে চালু করতে আসছেন।' রামচন্দ্র বললেন।

দুর্যোধন খুব রেগে যাচ্ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু তিনি রাগ সংবরণ করে হেসে বললেন, 'মাননীয় সাংসদ যদি একটু বিশদে বলেন! কারা বিক্ষুব্ধ, বিক্ষোভের কারণ কী? আজ সকাল পর্যন্ত আমরা তো এসবের কিছুই শুনিনি।'

দুর্যোধনের ওই হাসি যে বানানো তা রামচন্দ্র ভালোভাবে জানেন। বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। হিলটপ তৈরি হয়েছে প্রায় তিন বছর ধরে। প্রায় সাতশো শ্রমিকের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়েছে। হ্যাঁ, শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন তারা দেখছে কিছু স্থানীয় ছেলেমেয়েকে বাদ দিলে বেশিরভাব কর্মচারীকে বাইরে থেকে এনে হিলটপে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারাও চাকরির দাবি করছে।'

'মাই গড! হোটেল-চাকরি কি মাল বওয়া শ্রমিক বা রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে করানো সম্ভব? তাহলে তো হাসপাতাল তৈরির কাজে যে শ্রমিক ছিল সেও পরে ডাক্তারের চাকরির জন্য বিক্ষোভ জানাতে পারে।' দুর্যোধন মিত্র সংযম হারাতে হারাতেও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসলেন।

পুলিশ কমিশনার জিগ্যেস করলেন, 'স্যার, ওরা কোন ইউনিয়নের মদত পাচ্ছে?'

'কোনও ইউনিয়ন নয়, সবাই এই ইস্যুতে এক হতে চাইছে।' রামচন্দ্র বললেন।

জেলাশাসক বললেন, 'তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল।'

দুর্যোধন বিরক্ত হলেন, 'কেন?'

'মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আসার পথে যদি শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায় তাহলে তাদের সরাতে আরও বেশি ফোর্স এনে রাখতে হবে। ওরা যদি রাস্তা আটকে রাখে তাহলে বলপ্রয়োগ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।' জেলাশাসক বললেন।

পুলিশ কমিশনার বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অযথা বলপ্রয়োগ না করে বুঝিয়ে বলতে। সেটা কি সম্ভব হবে?'

রামচন্দ্র বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি, অর্থমন্ত্রীর কাছে খবরটা পৌঁছোল, শোনার পর তিনি এই শহরে প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে পারেন। উনি খুবই শ্রমিকবাদী মানুষ। শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ওঁর উপস্থিতিতে হোক—এটা কিছুতেই চাইবেন না।'

জেলাশাসক বললেন, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা যায় না?'

রামচন্দ্র বললেন, আমি সেই চেষ্টাই করছি। ওরা যদি কোনও ইউনিয়নের মারফত বিক্ষোভ দেখাতে চাইত তাহলে কাজটা সহজ হত।'

দুর্যোধন মিত্র এবার মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার সুবর্ণ দত্তের দিকে তাকালেন, 'মিস্টার দত্ত, এ ব্যাপারে কোনও ইনফরমেশন আপনার কাছে নেই?'

'না স্যার।' টাক মাথা দু-পাশে নাড়লেন মিস্টার দত্ত।

'কেন নেই? আমার এত বড় প্রজেক্টকে কিছু লোক বানচাল করে দিতে চাইছে আর আপনি তার কোনও খবরই রাখেন না?'

'বিশ্বাস করুন, কোনও সোর্স থেকেই আমি খবরটা পাইনি। হোটেল তৈরির জন্য কন্ট্রাক্টর-শ্রমিক এসেছিল বিহার থেকে। অনেকগুলো দল এসেছিল। কয়েক মাস কাজ করে একটা দল দেশে ফিরে গেলে আর একটা দল আসত। ওরা বেশিরভাগই আনস্কিলড, খেত-খামারি করে বাকি সময়। ওরা যে কী করে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক হয়ে ফিরে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি না।' মিস্টার দত্ত বললেন।

রামচন্দ্র জিগ্যেস করলেন, 'ওদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলেরা কাজ করত না?'

'করত। খুব বেশি হলে আশি কি একশো।' মিস্টার দত্ত জবাব দিলেন।

'এই একশো জনের বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন একত্র হলে সংখ্যাটা কোথায় পৌঁছবে তা অনুমান করুন। যাক গে, এখনও যখন মিস্টার মিত্রের কাছে কেউ কোনও ডিমান্ড করেনি তখন অর্থমন্ত্রী আসছেন, নির্বিঘ্নে আসছেন ধরে নিয়ে কাজ করে যাওয়া উচিত হবে। হোটেল তৈরি?' রামচন্দ্র জিগ্যেস করলেন।

দুর্যোধন মিস্টার ভার্গবকে ইশারা করলেন জবাব দিতে।

মিস্টার ভার্গব বললেন, 'হ্যাঁ, উই আর রেডি। এত বড় হোটেলকে সক্রিয় রাখতে যে যে জায়গায় যেমন লোক রাখা দরকার, তা রাখা হয়ে গেছে।'

'টোটাল এমপ্লয়িজ কত?' রামচন্দ্র জিগ্যেস করলেন।

'একশো এগারো।'

'সবাই স্কিল্ড?'

'ইয়েস স্যার।'

জেলাশাসক বললেন, 'মিস্টার মিত্র, আজ এই পর্যন্ত থাক। শ্রমিকদের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটু খোঁজখবর করছি। দরকার হলে আবার বসতে হবে।'

মিটিং শেষ হল। জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনারের পরে ম্যানেজাররা বিদায় নিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বণিক ওঠার কোনও উদ্যোগই নিলেন না। পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে জিগ্যেস করলেন, 'দাদা, একটু ধোঁয়া খেতে পারি? পেট ফুলে গেছে।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে সিগারেট ধরালেন তিনি। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি কিছুতেই এই শহরের দুর্নাম হতে দেব না।'

দুর্যোধন লোকটিকে দেখছিলেন। কোনও কথা বললেন না।

সিগারেটে দুটো টান দেওয়ার পর রামচন্দ্র সোজা হলেন, 'ও হ্যাঁ, সুন্দর কবে যেন আমেরিকা থেকে আসছে? আগামিকাল?'

'হঠাৎ তার কথা কেন মনে পড়ল?' দুর্যোধন জিগ্যেস করলেন।

'বাঃ। মিত্র ইন্ডাস্ট্রিজের আগামী দিনের মালিককে ছাড়া নিশ্চয়ই হোটেল চালু হবে না। আপনি ভুলে গেছেন, ওর আসার কথা আপনিই বলেছিলেন।'

'ও এলে কি তোমার সুবিধা হবে?'

'আমার আবার সুবিধা-অসুবিধা। আমার জন্য তো আপনি আছেন। একটা কথা, মিস্টার ভার্গব থাকলে ভালো হত। যদিও উনি বলে গেলেন হোটেলের সব কর্মী নিয়োগ হয়ে গেছে, তবু...।' বললেন রামচন্দ্র।

'থামলে কেন?'

'খুব সামান্য ব্যাপার। আমার এক বন্ধুর বোন, দার্জিলিংয়ে থাকে। বেশ সুন্দরী, বছর একুশ বয়স। ডাউহিল থেকে পাশ করেছে। বাংলা হিন্দি ইংরেজিতে চৌকস। চাকরি খুঁজছে। আমি তো জানতাম না হিলটপে আর কোনও পদ খালি নেই। বলেছিলাম, চেষ্টা করব। রিসেপশনিস্ট হিসেবে ওকে চমৎকার মানাত।'

'রাম, তুমি তো জানো, আমি ডিপার্টমেন্টাল হেডদের ওপর কোনও কিছু চাপিয়ে দিই না; কিন্তু তুমি যখন বলছ তখন আমি মিস্টার ভার্গবকে নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। কী নাম মেয়েটির?'

লীলা, লীলা প্রধান।'

'কালকেই যেন সে মিস্টার ভার্গবের সঙ্গে দেখা করে।'

'অনেক ধন্যবাদ দাদা।' সিগারেট নেভাতে গিয়ে অ্যাশট্রে না পেয়ে রামচন্দ্র ইতস্তত করেছিলেন। দুর্যোধন বললেন, 'আপাতত জলের গ্লাসে ওটা ফেলে দাও।' তা-ই দিলেন রামচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে সাদা জল কুৎসিত হয়ে গেল। রামচন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই দুর্যোধন বললেন, 'একটু দাঁড়াও রাম।'

রামচন্দ্র চোখ ছোট করে তাকালেন।

'তুমি সেদিন কোনও একটা স্কুলের বিল্ডিং তৈরির জন্য ডোনেশন চেয়েছিল, আমার খেয়াল থাকে না সবসময়। দুটো চেক দিচ্ছি। স্কুলের নাম তুমি বসিয়ে নিও।' অ্যাটাচি খুলে চেকবই বের করে পরপর দুটো চেক লিখে সই করে সামনে রাখলেন দুর্যোধন মিত্র, স্কুলের নামটা পরে বসিয়ে দিও। ফর মাই রেকর্ড। আমি চেকে অ্যাকাউন্ট পেয়ি লিখলাম না। কারণ, জানি না, ওদের অ্যাকাউন্ট আছে কি না। থাকলে ক্রস করে দিও।' হাসলেন দুর্যোধন।

এগিয়ে এসে চেক দুটো তুললেন রামচন্দ্র। টাকার অঙ্ক দেখে তিনি হাসলেন। বললেন, 'অজস্র ধন্যবাদ।'

তারপর চেক দুটোকে পকেটে রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তিনি চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্র মোবাইল বের করে নম্বর টিপলেন, 'আমি দুর্যোধন

মিত্র বলছি। দুটি চেক নম্বর নোট করে নিন, আপনার কাছে এলে হোল্ড করে রাখবেন আমি না বলা পর্যন্ত।' ব্যাংক ম্যানেজারকে নম্বর দুটো জানিয়ে দিলেন তিনি।

না, কোনও বিক্ষোভ হল না, কেউ কালো পতাকা দেখাল না। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে দুর্যোধন মিত্র এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পাহাড়ে উঠে এলেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে। আকাশ পরিষ্কার, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মেঘ লেগে আছে। গাড়ির পেছনের আসনে অর্থমন্ত্রীর পাশে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বসে আছেন দুর্যোধন। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে অর্থমন্ত্রীর বডিগার্ড। তাঁদের আগে এবং পেছনে গোটাআটেক গাড়ি। সামনের গাড়িতে জেলাশাসকের সঙ্গে রয়েছেন রামচন্দ্র বণিক। অর্থমন্ত্রী প্লেন থেকে নেমে এসে রামচন্দ্রের হাতে হাত মিলিয়ে বলেছেন, 'তোমার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না রাম, চলেই এলাম।' রামচন্দ্র গদগদ হয়ে বলেছেন, 'আমি কৃতজ্ঞ। আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ইনি দুর্যোধন মিত্র, হিলটপ ওঁরই পরিকল্পনা।'

দুর্যোধন মিত্র গতরাত থেকেই খবর নিয়েছেন। না, কোনও বিক্ষোভের আয়োজন হচ্ছে না। পাহাড় অশান্ত হবে না। কয়েকজন সমাজবিরোধীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বটে, তবে তাদের পেছনে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থন নেই। তবু তাঁর মনে হয়েছিল না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যে পুতুলকে তিনি মানুষে পরিণত করেছেন, সে যে কখন শকুনির মতো চাল দেবে, তা কে জানে! আজ সকালে ব্যাংকের ম্যানেজার তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন, চেক জমা পড়েছে। তিনি বলেছেন, বিকেল ৪টে পর্যন্ত যেন সেটি ধরে রাখা হয়।

আজ এয়ারপোর্টে অর্থমন্ত্রীর জন্য যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁকে একলা পেয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি আপনার ব্যাংককে কোনও ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এসেছেন?'

'কেন বলো তো?'

'এই সময়ের মধ্যে অ্যামাউন্টটা ট্রান্সফার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল!'

হাসলেন দুর্যোধন মিত্র—'আমার চেক কখনো বাউন্স করে না, নিশ্চিন্ত থাকো। তুমি আমার উপকার করলে, আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

রামচন্দ্র আর কথা বাড়াতে পারেননি। কারণ জেলাশাসক এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন তো।'

'অবশ্যই।' জোর দিয়ে বলেছিলেন দুর্যোধন মিত্র।

গাড়ির কনভয় যখন পাহাড়ের প্যাঁচানো রাস্তা ধরে উপরে উঠছিল, তখন অর্থমন্ত্রী বললেন, 'অপূর্ব সুন্দর!'

'হ্যাঁ, এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি সুন্দর।'

'শুনলাম, এখানকার মানুষের জন্য আপনি অনেক কিছু করেছেন।'

'আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল। আমার আর ক্ষমতা কত। তবে আমরা চাইছি আরও ট্যুরিস্ট আসুক এখানে। পর্যটনের ম্যাপে এখানকার নামটা উঠুক—এ ভাবনা থেকে আমি হোটেলটার পরিকল্পনা করেছিলাম। আপনি উদ্বোধন করছেন। তাই গোটা দেশের মানুষ জেনে যাবে। ট্যুরিস্ট বেশি এলে এখানকার গরিব মানুষজনের রোজগার বেড়ে যাবে।' দুর্যোধন মিত্র নীচু গলায় বললেন।

'আমি পর্যটনমন্ত্রীকে বলব।' অর্থমন্ত্রী বললেন, 'আপনি একবার দিল্লি আসুন। আসার সময় কাগজপত্র তৈরি করে আনবেন।'

শকুনের চোখ শবদেহ সবার আগে দেখতে পায়। অর্থমন্ত্রীর কথায় দুর্যোধন মিত্র টাকার গন্ধ পেলেন। অর্থমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে জলের সমস্যা আছে?'

'এতকাল বৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হত। কয়েক মাস বৃষ্টি না হলে মানুষের কষ্ট বাড়ত। মিস্টার বণিক এমপি হওয়ার পর উপরের পাহাড়ে দুটো বড় জায়গায় জল ধরে রাখা হচ্ছে। ফলে সমস্যা কিছুটা কমেছে।' দুর্যোধন বললেন।

'দুটো কেন? আরও করা যায় না?'

'যায়; কিন্তু পাহাড়ের শক্ত মাটি-পাথর খুঁড়ে গর্ত করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, খরচও অনেক। তাতে জল জমবে অনেক, কিন্তু সেই জল তো সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে না। তবে একটা উপায় আছে খরচ তুলে নেওয়ার।' দুর্যোধন সবিনয়ে বললেন।

অর্থমন্ত্রী তাকালেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'স্যার, তিনটি পাহাড়কে কোনওরকমে যুক্ত করতে পারলে যে বিশাল জল আমরা পাব, তাতে অনায়াসে হাজার হাজার মাছ চাষ করা সম্ভব হবে। সেই মাছ বিক্রি করলে খরচ অনায়াসেই উঠে যাবে।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

'ইন্টারেস্টিং। ফলে প্রচুর মানুষের কাজ হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি আর দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন দিল্লিতে চলে আসুন। আপনার ভাবনাচিন্তা আমার ভালো লাগছে।' অর্থমন্ত্রী বললেন।

দুর্যোধন মিত্র আর কথা বললেন না। কখন থামতে হয় তিনি জানেন। এখন তাঁর চোখের সামনে কোটি কোটি টাকার মাছ। বিদেশে রফতানি করলে টাকাগুলো ডলার-ইউরো-পাউন্ড হয়ে যাবে।

প্রচারিত ছিল খবরটা, ব্যবস্থাও ছিল। শহরে ঢোকার পথের দুপাশে জড়ো হওয়া মানুষ অর্থমন্ত্রীকে জয়ধ্বনি দিল। ফুল ছুড়ল।

গাড়ির কনভয় এসে দাঁড়াল হিলটপের সামনে। অর্থমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাঃ!'

টিভির ক্যামেরাম্যান, সাংবাদিকদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল পুলিশবাহিনী। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, রামচন্দ্র বণিক এবং রাজনৈতিক নেতারা অর্থমন্ত্রীকে ঘিরে এগোতে লাগলেন হিলটপের গেট পেরিয়ে মূল দরজার দিকে। দুর্যোধন মিত্র ততক্ষণে চলে গিয়েছেন সেখানে। দরজার এপাশ থেকে ওপাশে সুন্দর ফিতে টানানো। মিস্টার ভার্গব হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে দু-মহিলা হোটেলকর্মী। একজনের হাতে ছোট্ট ট্রে-র ওপর কাঁচি রাখা। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন অবাক হলেন। এত সুন্দরী মেয়েকে ভার্গব পেল কোথায়!

অর্থমন্ত্রী এসে যেতেই দুর্যোধন মিত্র তাঁকে অনুরোধ করলেন ফিতে কাটার জন্য। সুন্দরী হেসে ট্রে এগিয়ে দিলে অর্থমন্ত্রী তার দিকে তাকালেন, মাথা নাড়লেন, তারপর কাঁচি তুলে ফিতে কাটলেন প্রথম চেষ্টায়। হাততালির ঝড় উঠল। অর্থমন্ত্রীকে একটি হ্যান্ডসেট এগিয়ে দিলেন ভার্গব।

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'স্যার, দয়া করে অ্যানাউন্স করুন।'

অর্থমন্ত্রীর গলা মাইকে শোনা গেল—'আমি হিলটপ হোটেলটির উদ্বোধন করলাম।'

ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ, হাততালি, জনতার গলায় আনন্দ।

দুর্যোধন অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মিস্টার ভার্গব বললেন, 'আপনি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন স্যার, তাতেই হবে।'

লম্বা স্ট্যান্ডের চারপাশে অনেক প্রদীপের সলতে তেলে ভেজানো। অর্থমন্ত্রী ট্রে থেকে লাইটার তুলে নিয়ে তার একটার মুখে আগুন ধরালেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন বাকিরা।

অর্থমন্ত্রী এবং নির্বাচিত অতিথিদের নিয়ে দুর্যোধন মিত্র এগিয়ে গেলেন ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে। সেখানে দরজায় সিল্কের সাদা শাড়ি, জামা পরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা

জানালেন শ্রীমতী কৃষ্ণা মিত্র।

দুর্যোধন নীচু গলায় অর্থমন্ত্রীকে বললেন, 'আমার স্ত্রী, কৃষ্ণা।'

অর্থমন্ত্রী নমস্কার জানালেন, 'আপনাকে দেখে কথাটা মনে আসছে।'

'কী কথা?' কৃষ্ণা হাসলেন।

'যে কোনও সফল মানুষের পেছনে একজন মহিলার অবদান থাকে।'

কৃষ্ণা আবার হাসলেন, 'ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করে এসেছেন বলে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।'

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'কৃষ্ণা দিল্লিতে বড় হয়েছে।'

'আচ্ছা!' অর্থমন্ত্রী মাথা নাড়লেন।

দশ মিনিট পর জমজমাট ব্যাঙ্কোয়েট হলে অর্থমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করলেন। পাহাড়ের অর্থনীতি, এখানকার মানুষের জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যাপারে মাননীয় সাংসদ রামচন্দ্র বণিকের সঙ্গে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন, এখানে হিলটপের মতো হোটেলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বিদেশি বা অন্য ট্যুরিস্টদের দরজা খুলে দেওয়ায় দুর্যোধন মিত্রকে ধন্যবাদ দিলেন। সবশেষে বললেন, 'শ্রী মিত্রের কিছু পরিকল্পনা নিয়ে গাড়িতে আসার সময় আলোচনা হচ্ছিল। সেগুলো ঠিকমতো করা গেলে এখানকার মানুষের আয় অনেক বেড়ে যাবে।' তিনি হিলটপের সাফল্য কামনা করলেন।

বক্তৃতার পর অতিথিদের লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানানো হল। অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে দুর্যোধন মিত্র, কৃষ্ণা মিত্র এবং রামচন্দ্র বণিক বসলেন ভিআইপি এনক্লোজারে।

চেয়ারে বসে অর্থমন্ত্রী বললেন, 'হিলটপ—খুব মানানসই নাম।'

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'নামটা কৃষ্ণার দেওয়া।'

সপ্রশংস চোখে তাকালেন অর্থমন্ত্রী—'বাহ! মিসেস মিত্র কি সাহিত্যচর্চা করেন?'

কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন—'না! কিন্তু আপনি আমাকে কৃষ্ণা বললে আমার ভালো লাগবে। আমি ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে সামান্য কাজ করেছি।'

'আই সি! কিন্তু এখানে থেকে চর্চা রাখতে পারছেন?'

'মাসে দুবার দিল্লি যেতে হয়...!'

অর্থমন্ত্রী দুর্যোধনের দিকে তাকালেন—'মিস্টার মিত্র, এবার যখন আসবেন, তখন মিসেসকে নিয়ে দেখা করবেন।'

খাবারের প্রশংসা করলেন অর্থমন্ত্রী। কথা দিলেন সময় পেলেই আবার আসবেন।

কৃষ্ণা বললেন, 'আপনি ব্যস্ত মানুষ, নইলে বলতাম আজ থেকে যান।'

অর্থমন্ত্রী বললেন, 'আজ বিকেলে সমতলে একটা মিটিং আছে। কী করব বলো, আমার স্ত্রী ঠিকই বলেন।'

'কী বলেন?'

'আমার কোনও ব্যক্তিগত জীবন নেই।' অর্থমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

অর্থমন্ত্রী চলে গেলে দুর্যোধন মিত্র ব্যাংককে জানিয়ে দিলেন চেক রিলিজ করে দিতে।

টিভির কল্যাণে সারাদেশে হিলটপের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তৃতীয় দিনেই ভার্গব জানালেন, 'প্রচুর ফোন পাচ্ছি। খুব ভালো বুকিং হচ্ছে।'

'আপনি নজর রাখবেন, স্ট্যান্ডার্ড যেন ঠিক থাকে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।'

'ও হ্যাঁ, উদ্বোধনের দিন যে মেয়েটি ট্রে হাতে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তাকে আপনি কোথায় পেলেন?' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'স্যার, মেয়েটিকে তো আপনি রেফার করেছিলেন।'

'আমি? কী আশ্চর্য! ওকে তো আমি চিনিই না।'

'সে কী! মেয়েটি বায়োডাটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। তখন হোটেলের সব পোস্টে লোক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলল, আপনি ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আর কথা বলে আমার মনে হয়েছিল, ওকে দিয়ে ভালো কাজ হবে। ইনফ্যাক্ট, এই দুদিন ও খুব এফিসিয়েন্টলি কাজ করেছে। আপনার রেফারেন্স বলে আমি আউট অব টার্ন ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি।' ভার্গব বললেন।

'মেয়েটির নাম কী?'

লীলা প্রধান। শি ইজ ফ্রম দার্জিলিং।'

এবার মনে পড়ে গেল দুর্যোধন মিত্রের। রামচন্দ্র এ মেয়েটির কথা তাঁকে বলেছিলেন, ওঁর বন্ধুর বোন? কিন্তু মেয়েটি যে এত সুন্দরী, তা তিনি অনুমান করতে পারেননি।

'ও কি সত্যি কথা বলেনি!' ভার্গবের গলায় সন্দেহ।

মাথা নাড়লেন দুর্যোধন মিত্র—'ঠিকই বলেছে। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম।' ভার্গব খুশি হলেন—'মেয়েটিকে একটু ঘষামাজা করলে হোটেলের অ্যাসেট হয়ে যাবে স্যার।'

রাতে কৃষ্ণার কাছে কথাটা বললেন দুর্যোধন। কৃষ্ণা হাসলেন—'আমি মেয়েটিকে লক্ষ করেছি। সত্যি সুন্দরী। দেখো, হোটেলের প্রতি আকর্ষণ না বেড়ে যায়।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!'

শুনেছি ছেলেরাই এসব ক্ষেত্রে পাগল হয়।'

'আমি ছেলে নই, বয়স্ক পুরুষ।' কথাটা বলতেই সুন্দরের মুখ মনে পড়ল দুর্যোধনের। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি জন্ম নিল তাঁর মনে।

দিনসাতেক পর সস্ত্রীক দিল্লি গেলেন দুর্যোধন মিত্র। পাহাড়ে জলাধার এবং মৎস্য প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা নিয়ে তিনি রামচন্দ্র বণিকের সঙ্গে একবারও আলোচনা করেননি। দিল্লিতে আসার আগে অর্থমন্ত্রীর আপ্তসহায়কের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে কবে কখন দেখা করবেন, তার সময় স্থির করে নিয়েছেন।

দিল্লিতে এলে এখনও হোটেলে ওঠেন দুর্যোধন। কৃষ্ণা চলে যান তাঁর বাপের বাড়িতে। এই নিয়ে তাঁদের কোনও সমস্যা হয় না। টেলিফোনেই যোগাযোগ থাকে। স্থির হয়েছে, পরের দিন অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে যখন দুর্যোধন যাবেন, তখন কৃষ্ণাকে তাঁর বাসস্থান থেকে তুলে নেবেন।

বেশ কয়েক মাস ধরে দিল্লিতে তার পরিকল্পিত ডিজাইনে তৈরি পোশাকের এক্সিবিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কৃষ্ণা। তাঁর মা এ কাজটির তদারকি করেন। দিন পনেরো পর এক্সিবিশন শুরু। কৃষ্ণার মা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, ওই সময় অর্থমন্ত্রী বিদেশে থাকবেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করে যদি প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করানো যায় প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করতে, তাহলে ব্যাপক প্রচার হবে।

পরের সন্ধ্যায় দুর্যোধন কৃষ্ণাদের বাড়িতে এসে এক কাপ কফি পান করলেন। কুশল বিনিময়ের পর তিনি যখন অর্থমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাচ্ছেন, তখন তাঁর মোবাইল বেজে উঠল। ওটা অন করে হ্যালো বলতেই সুন্দরের গলা শুনতে পেলেন—'ড্যাডি, তোমার কাছ থেকে কোনও ইনফরমেশন না পাওয়ায় ঠিক করলাম, আজই ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরব। এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিও।'

দুর্যোধন মিত্র কোনও জবাব না দিয়ে ফোন সুইচ অফ করে দিলেন।

'কে? খুব বিরক্ত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে!' পাশে বসে কৃষ্ণা হাসলেন।

'যত্ত আজেবাজে ফোন—এই মোবাইল টেলিফোন যেমন সাহায্য করে, তেমনি মাঝেমধ্যে জঞ্জাল বলে মনে হয়।' দুর্যোধন স্বস্তি পেলেন। কৃষ্ণা বোঝেননি কার ফোন এসেছিল। কিন্তু এখন তাঁর পক্ষে সুন্দরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই। তা ছাড়া তাকে ভারতে আসার ব্যাপারে কতদিন

তিনি ঠেকিয়ে রাখবেন?

অর্থমন্ত্রী দুর্যোধন মিত্রের পরিকল্পনাবিষয়ক কাগজপত্র নিয়ে চোখ বুলিয়ে তাঁর আপ্তসহায়ককে দিয়ে বললেন, 'এগুলো কালই শ্রীনিবাসনের কাছে পাঠিয়ে দেবে। বলবে, পরশু ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করব।'

চা খেতে খেতে অর্থমন্ত্রী বললেন, 'প্রজেক্টের খরচ কত হবে, সে ব্যাপারে আনুমানিক বাজেট করেছেন?'

'আরেকটু সময় লাগবে স্যার। তবে যা-ই হোক, তিন বছর থেকে রিটার্ন আসতে শুরু করবে এবং দশ বছরের মাথায় পুরো টাকা উঠে যাবে।'

'গুড। আপনার প্রজেক্ট যদি আমরা অ্যাপ্রুভ করি, তাহলে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেন্ডার চাইতে হবে। নইলে বিরোধীরা দুর্নীতির গন্ধ পাবে।'

'সেক্ষেত্রে স্যার, কাজটা আমি নাও পেতে পারি।' দুর্যোধন বললেন।

'আপনার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, আপনি ওখানে থাকেন, পাহাড়কে ভালো করে চেনেন। বাইরের কেউ কম টাকার টেন্ডার দিয়েছে বলে তাকেই কাজটা দেওয়া হবে এমন ভাবছেন কেন? আমরা অ্যাপ্লিকেন্টদের যোগ্যতাও বিচার করব। তা ছাড়া এটা যে আপনার ব্রেন চাইল্ড, সে কথাও আমি মনে রাখব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

অর্থমন্ত্রী এবার কৃষ্ণার দিকে তাকালেন—'নিজের বাড়িতে ফিরে কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'আগামী মাসের ৩ তারিখে আমার এক্সিবিশন।'

'৩ তারিখ?'

'হ্যাঁ, আপনি কী দিল্লিতে তখন থাকবেন?'

'বিদেশ যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে ইউনাইটেড নেশনসে যেতে হবে বলে আমারটা পসপন্ড করেছি।'

'ও!' কৃষ্ণা একটু চিন্তায় পড়ল?

'কী? আবার উদ্বোধন করতে হবে না কি? ডিজাইনের প্রদর্শনীর উদ্বোধন আমাকে দিয়ে না করিয়ে কোনও নামকরা ফিল্ম স্টারকে দিয়ে করানোই তো ভালো।'

কৃষ্ণা বললেন, 'আমি তাদের কাউকে চিনি না।'

'আমি মুম্বাইয়ের দু-একজনকে অনুরোধ করতে পারি।'

'ও! খুব ভালো হয়। আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি!'

'একদম নয়। সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সমন্বয় দেখলে ঈশ্বরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, আমি কোন ছার।'

ফেরার সময় খবরটা জানালেন দুর্যোধন মিত্র।

শুনে কৃষ্ণা অবাক—'ওমা, কাল তো এখানে এলে। আবার কালই ফিরে যাবে?

'শুনলে তো, নতুন প্রজেক্টের বাজেট তৈরি করতে হবে।'

'কত টাকার প্রজেক্ট হতে পারে?'

'আই ডোন্ট নো! হয়তো হাজার কোটি টাকা।'

'এত টাকা!'

'হুঁ! সরকারের কাছ থেকে লোন নিতে হবে। দশ বছরে শোধ করার পর ওরা কী চুক্তি করে, তার ওপর সব নির্ভর করছে। শোনো, তুমি এই এক্সিবিশনের ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করবে

না। আমি তোমাকে আপাতত দশ লাখ টাকার চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুম্বাইয়ের স্টারদের পেছনে তো অনেক খরচ করতে হবে। যদি আরও দরকার হয় জানিও।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

কৃষ্ণা হাসলেন—'অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে চেক পাঠাতে হবে না।'

'কেন?'

'এক্সিবিশনের খরচ চালানোর সামর্থ্য আমার আছে। তুমি আসার আগেই আমি তো একাই ছিলাম, তাই না?'

দুর্যোধন গম্ভীর হলেন। কৃষ্ণা টাকা নিলে তাঁর ভালো লাগত। হয়তো সুন্দর আসছে বলেই কৃষ্ণাকে টাকা দেওয়াটা জরুরি মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু এখন এ নিয়ে আর কথা বললেন না তিনি।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে ফিরে যাওয়াটা একদিন পিছিয়ে দিলেন দুর্যোধন মিত্র। নিউইয়র্ক থেকে সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরলে দিল্লিতে সুন্দর নামবে আগামীকাল রাতে। সে সময় পাহাড়ে যাওয়ার কোনও প্লেন নেই। ওকে ফ্লাইট ধরতে হবে আগামী পরশু সকালে। গোটা রাত নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে বসে সে কাটাবে না। ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরার জন্য এয়ার হোটেল দেবে না। নিজের পয়সায় হোটেলে থাকবে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পাঁচতারা হোটেলে ওকে যেতে হবে। একদিন দিল্লিতে থেকে ওর সঙ্গে একই ফ্লাইটে ফেরার কথা ভাবলেন দুর্যোধন। দিল্লিতে বাকি যে কাজগুলো ছিল তার কয়েকটা শেষ করার পর ওঁর খেয়াল হল কৃষ্ণাকে জানানো হয়নি তিনি দিল্লিতেই থেকে গেছেন। বিকেলে ফোন করতেই কৃষ্ণা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোথায়?'

'আর কী বলব, এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে ফ্লাইট মিস করেছি। মাথা এমন গরম হয়ে গিয়েছিল যে তোমাকে জানাবার কথা মনে ছিল না। আই অ্যাম সরি।' দুর্যোধন বললেন।

'আমি তোমাকে এই তিন বছরে বোধহয় খানিকটা চিনতে পেরেছি।'

'মানে?' হকচকিয়ে প্রশ্ন করলেন দুর্যোধন।

'তুমি ঘুমের জন্য ফ্লাইট মিস করবে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। যাকগে, তাহলে তুমি কি কাল ফিরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ফোন কোরো।'

মোবাইল অফ করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকলেন দুর্যোধন। কৃষ্ণা স্পষ্টই বলে দিল এই ফিরে না যাওয়ার পেছনে অন্য কারণ আছে। কারণটা কি তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছে না। পারলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হত। কিন্তু কেন হবে? ওর শর্ত ছিল, সুন্দরের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে না। কিন্তু বাবা হয়ে তিনি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না এমন কথা তো দেননি! তিনি যে কথা দিয়েছেন তা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করবেন। এর জন্য সুন্দরের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হবে। এবং সেই বলাটা খুব প্রীতিকর হবে না। কৃষ্ণা সে কথা ভাবার প্রয়োজন মনে করছে না।

নিউইয়র্কের ফ্লাইটটা দুবাই হয়ে দিল্লিতে পৌঁছল রাত দশটা নাগাদ। ওই ফ্লাইটেই সুন্দরের টিকিট আগের দিন যখন কাটা ছিল তখন দিন পিছিয়ে নিলে একই সময়ে তাকে দিল্লিতে নামতে হবে। হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে দুর্যোধন মিত্র ঠিক সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে খোঁজ নিয়ে জানলেন প্লেন দু'মিনিট আগেই নেমে গেছে। অবশ্য ইমিগ্রেশন করে ভেতরে ঢুকে বেল্ট থেকে সুটকেস নিয়ে বের হতে অন্তত আধঘন্টা লেগে যাবে।

বেশ কয়েক বছর পরে ছেলেকে দেখবেন বলে একটু উত্তেজনাবোধ করছিলেন দুর্যোধন। তাঁর পাঠানো টাকার কোনও হিসাব সুন্দর দিত না বলে ফোনে রাগারাগি করেছেন। যা খরচ হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি কী করে খরচ হয় তা তিনি বুঝতে পারতেন না। কথাটা বললেই সুন্দর এড়িয়ে যেত। অবশ্য একমাত্র ছেলের এই বেহিসেবিপনা শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করেছেন দুর্যোধন।

কিন্তু মহিলাঘটিত ব্যাপারে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে জানতে পেরে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেনি জেনে আমেরিকা যাত্রা বাতিল করেন। সুন্দর ফোনে তাঁকে জানিয়েছিল যে তার এক পাকিস্তানি বন্ধুর প্রথম বান্ধবী আত্মহত্যা করায় পুলিশ তাকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তার মতো অনেককেই করেছে। এটা একটা রুটিন চেকআপ ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বাস করেছিলেন দুর্যোধন।

মিনিট ত্রিশ পরে যাত্রীরা বেরুতে পারল। গেটের এপাশে তাদের আত্মীয়বন্ধুদের ভিড়, স্বাগত জানাতে এসেছে সবাই। ভিড়ের শেষে দাঁড়িয়ে দুর্যোধন মিত্র লক্ষ রাখছিলেন বেরুবার দরজার ওপর। তাঁকে দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে সুন্দর। বলবে, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ ড্যাডি! তুমি আমাকে রিসিভ করতে এত কষ্ট করলে কেন?'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনলে যে-কোনও বাবাই খুশি হবে।

দুর্যোধন উদগ্রীব হয়ে দেখছিলেন। এই সময় সুন্দর ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে এল। এসে চারধারে তাকাতে থাকল। দুর্যোধন এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। জিন্স আর গেঞ্জি পরা একটা শরীর দৌড়ে পৌঁছে গেছে সুন্দরের কাছে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। মেয়েটি গাল ছোঁয়াল সুন্দরের গালে। তারপর দুজনে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল পার্কিং লটের দিকে। স্তম্ভিত দুর্যোধনের ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল। তিনি দেখলেন ওরা একটা লাল গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে এয়ারপোর্টে এসে চেকিং করলেন দুর্যোধন মিত্র। বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে কী মনে হল, কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সুন্দর মিত্র নামে একজন কি এই ফ্লাইটে যাচ্ছেন?'

মেয়েটি কম্পিউটার টিপে মাথা নাড়ল, 'সরি স্যার, এই নামের কেউ এক্সিকিউটিভ ক্লাসে নেই। এক সেকেন্ড অমি ইকোনমি ক্লাস চেক করছি!'

সেটা দেখার পর মেয়েটি বলল, 'না স্যার। এই নামের কেউ নেই।'

অবাক হলেন দুর্যোধন মিত্র। নিউইয়র্ক থেকে দিল্লিতে নেমে থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা না করে এলে ওর নাম লিস্টে থাকত। নিজেকে খুবই প্রতারিত বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

দুপুরের মধ্যে পাহাড়ি শহরে পৌঁছে গেলেন তিনি। নীচের এয়াপোর্টে নেমে অবিনাশ ভার্গবকে ডেকে পাঠালেন।

মিস্টার ভার্গব চলে এলেন পনেরো মিনিটের মধ্যে। দুর্যোধন মিত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিলটপের খবর কী?'

'খুব ভালো। মনে হচ্ছে সামনের ফেস্টিভ মাস্থের বুকিং দু-তিনদিনের মধ্যে ক্লোজ করতে হবে। বাইরে থেকেও বুকিং আসছে।' মিস্টার ভার্গব বললেন।

'আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।'

'স্যার, এভাবে বলছেন কেন!'

'বলছি এই কারণে আমি আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমার ছেলে সুন্দর এতদিন ইউএসএ-তে ছিল। ম্যানেজমেন্ট করেছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ও হিলটপে জয়েন করুক।'

'আপনার ছেলে হিলটপে এলে তো খুব ভালো হবে।'

'কিন্তু ও আপনার অধীনে কাজ করবে। ধরুন, ওকে আপনি যদি সেলস অ্যান্ড প্রমোশনের দায়িত্ব দেন তাহলে কেমন হয়? ওর কাজের ব্যাপারে আপনার কাছে ওকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

আমার ছেলে বলে কোনও অ্যাডভান্টেজ নিতে ওকে দেবেন না।'

'এটা কি আপনার রিকোয়েস্ট?'

একটু ভাবলেন দুর্যোধন মিত্র। তারপর বললেন, 'এটা আমার পলিসি।'

'তাহলে ঠিক তা-ই হবে স্যার।'

'আর একটা কথা। হোটেলের ওপরে যে স্টাফরুম আছে তার একটায় ওকে থাকতে দেবেন। আমি চাই ও হিলটপেই থাকুক।'

'স্যার, স্টাফদের জন্য রুমগুলো তো খুব সাদামাটা। ওঁর অসুবিধে হবে।' মিস্টার ভার্গব বললেন, 'আপনি চাইলে গেস্টদের ঘরগুলো থেকে...।'

থামিয়ে দিলেন দুর্যোধন মিত্র, 'মিস্টার ভার্গব, আপনি কোথায় থাকেন?'

'স্টাফদের একটা ঘরে।'

'আপনার যদি অসুবিধে না হয় ওরও হবে না। হওয়া উচিত নয়। গেস্টদের রুমগুলো থেকেই তো রেভিনিউ আসছে, তাই না? আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ভার্গব, 'মিস্টার মিত্র কবে আসবেন?'

'মিস্টার মিত্র? ও, ওকে আপনি সুন্দর বলবেন। আপনি অনেক সিনিয়র। কবে আসবে? আই ডোন্ট নো। তবে আসবে নিশ্চয়ই।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

মিস্টার ভার্গব বিদায় নিতেই ইন্টারকমে পি-এ বলল, স্যার, আপনার একটা কল এসেছে, দিল্লি থেকে।'

'কী নাম বলেছে।'

'বললেন, এস মিটার।'

ফোন তুললেন দুর্যোধন, 'হ্যালো।'

'হাই ড্যাড, আমি এখন দিল্লিতে।'

'কখন এলে? গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন দুর্যোধন মিত্র।

'কাল মিডনাইটে। ঠিক ছিল, আজ সকালের ফ্লাইট ধরব। কিন্তু জেট ল্যাগ হয়ে গিয়েছে, রাতে ঘুমাতে পারিনি, ভোরে ঘুমিয়ে পড়ায় ফ্লাইট মিস করেছি।'

'ও।' মনে মনে চড় মারলেন দুর্যোধন।

'আমি কাল সকালের ফ্লাইট ধরছি।'

তোমার জেট ল্যাগ হয়েছে বললে। ওটা তিন-চারদিন থাকে। ঠিক হয়ে গেলে এসো। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।'

'তুমি বলছ? ও.কে.! থ্যাঙ্ক ইউ ড্যাডি।' লাইন কেটে দিল সুন্দর।

দাঁতে দাঁত চাপলেন দুর্যোধন। মিথ্যে কথাগুলোকে গিলতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তিনি নিশ্চিত সুন্দর ওই মেয়েটির জন্য আগে থেকেই প্ল্যান করেছিল। আজ ওর সঙ্গে থাকবে বলেই ওর নাম ফ্লাইটের লিস্টে ছিল না। কে ওই মেয়ে? কী নাম? সুন্দরের সঙ্গে ওর আলাপ কীভাবে হল? সুন্দর তো কখনও দিল্লিতে থাকেনি। সুন্দর যদি ওকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তিনি বাধা দেবেন না। মোবাইলের বোতাম টিপলেন দুর্যোধন, রিং হল, 'আমি এখন অফিসে। তুমি কোথায়?'

কৃষ্ণা বললেন, 'বাড়িতে। একজিবিশনের ওপেনিংয়ে আসবে তো?'

'অবশ্যই।' হাসলেন দুর্যোধন।

গাড়ি গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। ড্রাইভার সেখান থেকে সুন্দরকে নিয়ে নির্দেশমতো চলে এল হিলটপে। হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে কোমরে দুই হাত রেখে পাঁচতলা বিশাল হোটেলটির দিকে তাকিয়ে সুন্দর বলল, 'বাহ।'

ড্রাইভার বনেট খুলে দিতে হোটেলের দারোয়ান সুটকেস দুটো নামাচ্ছিল। সুন্দর আপত্তি

করল, 'এখানে কেন? নামাতে হবে না, বাড়িতে যাবে ওগুলো।'

দ্বিতীয় দারোয়ান সামনে এসে সেলাম করে বলল, 'বড় সাহেব অফিস রুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন স্যার।'

তাকে অনুসরণ করে হোটেলের লবিতে পা দিয়ে খুব খুশি হল সুন্দর। যে-কোনও আধুনিক হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দেবে হোটেলের লবি। সে রিসেপশন ডেস্কের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। স্বপ্নেও সে এমন সুন্দর নারী দ্যাখেনি। ইউনিফর্ম পরে ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছে যে, সে কি এই পৃথিবীর মেয়ে? দারোয়ানকে ছেড়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল সুন্দর। ওপাশে যে ছেলেটি সুট পরে কম্পিউটারে কাজ করছিল সে এগিয়ে এল, 'ইয়েস স্যার।'

'হু ইজ শি?' ইশারায় তখনও কথা বলছিল মেয়েটি।

'শি ওয়ার্কস হিয়ার।'

'হুম!' মেয়েটিকে আর একবার দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার দুর্যোধন মিত্রকে এখন কোন ঘরে পাওয়া যাবে?'

'উনি অফিসে আছেন। আপনার পরিচয়?'

'আমি ওঁর ছেলে।'

'আই সি! আই অ্যাম সরি স্যার। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

ইশারায় একজন বেয়ারাকে ডেকে নীচু গলায় রিসেপশনিস্ট বলল বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে। যাওয়ার আগে হেসে জিগ্যেস করল, 'নাউ, ওর নামটা নিশ্চয় জানতে পারি?'

'সিওর স্যার! লীলা, লীলা প্রধান।' তাড়াতাড়ি বলল রিসেপশনিস্ট।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সুন্দর দেখল দুর্যোধন মিত্র ল্যাপটপে চোখ রেখে বসে আছেন। সে বলল, 'হাই ড্যাড।'

চোখ তুললেন দুর্যোধন। 'ও, এসে গেছ। বসো।'

সুন্দর বসল। ল্যাপটপ বন্ধ করলেন দুর্যোধন, 'জেট ল্যাগ?'

'নেই।'

'গুড। হোটেল কেমন লাগছে।'

'ঘর দেখিনি। লবি ফ্যান্টাস্টিক।'

'আমি চাই তুমি হিলটপকে ভালোবাসো। নিজেকে এর সঙ্গে জড়াও।'

'গিভ মি এ চান্স ড্যাড।'

'নিশ্চয়ই' বলা মাত্র দরজায় শব্দ হল। দুর্যোধন সোজা হয়ে দেখলেন দরজা খুলেছেন মিস্টার ভার্গব।

'কাম ইন মিস্টার ভার্গব। মিট মাই সান সুন্দর।'

'হ্যালো!' হাত বাড়ালেন মিস্টার ভার্গব, 'অবিনাশ ভার্গব।'

'হ্যালো।' হাত মেলাল সুন্দর।

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'মিস্টার ভার্গব ভারতবর্ষের হোটেল ইন্ডাস্ট্রিজে অত্যন্ত পরিচিত নাম। এই হোটেলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি ওঁর হাতে তুলে দিয়েছি।'

'আই সি।'

'আমি ওঁকে অনুরোধ করেছি তোমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিতে। তুমি যেহেতু এমবিএ করেছ তাই সেলস আর প্রমোশনটা দেখার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। তোমার কাজের রিপোর্ট তুমি মিস্টার ভার্গবকে নিয়মিত দেবে। নাউ টেল মি, ইন্ডিয়ান মানিতে পার অ্যানাম কত হলে তুমি খুশি হবে?'

হাঁ হয়ে গেল সুন্দর, 'তুমি কি চাইছ আমি পেরোলে থাকি?'

'অফকোর্স! তুমি পরিশ্রম করবে অথচ টাকা নেবে না, তা কি হয়?'

'হিলটপ কি প্রাইভেট ওনারশিপ বিজনেস?'

'নো। প্রাইভেট লিমিটেড।'

'আমি কি শেয়ারহোল্ডার নই?'

'অবশ্যই নয়। তোমার পারফরমেন্স দেখার পর আমি ওটা নিয়ে ভাবব।'

কাঁধ নামাল সুন্দর। টেবিলে আঙুল ঠুকল দুবার। তারপর বলল, 'আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে।'

'টেক ইওর টাইম।'

মিস্টার ভার্গব বললেন, 'স্যার আমাকে কি এখন প্রয়োজন আছে?'

'ওহো, নো। আপনি নিশ্চয়ই যেতে পারেন।'

মিস্টার ভার্গব চলে গেলে সুন্দর বলল, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

'ইটস সিম্পল। না বোঝার কিছু নেই।'

'আমি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করে এসে নিজেদের হোটেলে আর একজনের অধীনে চাকরি করব?'

'অন্যায় কী?'

'আমি এত ইনএফিশিয়েন্ট?'

হাসলেন দুর্যোধন, 'তোমার সম্বল একটা ডিগ্রি। বাস্তব অভিজ্ঞতা কি আছে? শুধু থিওরি দিয়ে হোটেল চালানো যায় না। তার জন্য অভিজ্ঞতার দরকার হয়। ভার্গবের কাছে কাজ শিখলে তুমি-ই লাভবান হবে। ও হ্যাঁ, তোমার থাকার ব্যবস্থা হিলটপেই হয়েছে।'

'হিলটপে?'

'এতে হোটেলের সঙ্গে তোমার অ্যাটাচমেন্ট বাড়বে।'

'তুমি চাইছ আমি বাড়িতে না থাকি?'

'আমি চাই তুমি হোটেলে থাকো, তার ফলে এখানকার কর্মীরা আরও সিরিয়াস হবে। যাও বিশ্রাম নাও।'

'কোথায় যাব?'

বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন দুর্যোধন, 'সাহেবকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাওয়ার আগে তোমার অফিসরুমটা দেখে যেও। কোনও সাজেশন থাকলে মিস্টার ভার্গবকে বলো।'

সুন্দর উঠে দাঁড়াল। তাকে অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। বেয়ারার পেছনে বাইরে এসে সে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। বেয়ারা ততক্ষণে ওপাশের একটা ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু পা বাড়াল সুন্দর।

মাঝারি সাইজের ঘর। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। দেয়ালের রং চোখের আরাম দিচ্ছে। টেবিল-চেয়ার চমৎকার। বসল সে।

না, এই ঘরটি সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর কোনও উপায় নেই। কিন্তু দুর্যোধন মিত্রের হঠাৎ কি হল? এত আধুনিক হয়ে গেলেন কী করে? ইন্টারকমের বোতাম টিপল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অপারেটরের গলা পাওয়া গেল, 'ইয়েস স্যার।'

'মিস্টার অবিনাশ ভার্গব।' গম্ভীর গলায় বলল, সুন্দর।

একটু বাদেই মিস্টার ভার্গবের গলা শুনতে পেল সে, 'ইয়েস মিস্টার মিত্র। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো!'

'আপাতত না। অফিস ঠিকই আছে। আমার নামে কি গাড়ি অ্যালট করা হয়েছে?'

সুন্দর জিগ্যেস করল।

'অফকোর্স।'

'আরও কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলা দরকার।'

'আপনি বহুদূর থেকে এসেছেন। আজকের দিনটা রেস্ট নিন। কাল সকালে কথা বলা যাবে।' মিস্টার ভার্গব বললেন।

ফোন রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুন্দর। বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিগ্যেস করল, 'ড্যাডি এখনও ঘরে আছে?'

'না স্যার, উনি হেড অফিসে চলে গিয়েছেন।'

'কখন আসেন রোজ?'

'রোজ তো আসেন না, আর একেকদিন একেক সময় আসেন।'

মাথা নাড়ল সুন্দর। তারপর লবিতে চলে এল। সেই সুন্দরী, যার নাম লীলা, একা দাঁড়িয়ে কাজ করছিল। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মিষ্টি হাসল, 'গুড আফটারনুন স্যার।'

'আমি কী বলব? তুমি না আপনি?'

একটু গম্ভীর হয়ে গেল লীলা, 'তুমি বলতে পারেন।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'ওপরে। স্টাফরুমে।'

'নিশ্চয়ই এই শহরের মেয়ে নও।'

'না স্যার। আই অ্যাম ফ্রম দার্জিলিং।'

'তাই বল। এখানে তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আশাই করা যায় না। বাই দ্য ওয়ে, আমার পরিচয় জানো?'

'হ্যাঁ স্যার, শুনেছি।'

'না। আমাকে তুমি স্যার বলবে না। আমার নাম সুন্দর। নাউ লীলা আই নিড এ কার। আমার নামে নাকি একটা অ্যালট করা হয়েছে?'

'আপনি বাইরে গেলেই পেয়ে যাবেন।'

ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল সুন্দর। তারপর তীব্রগতিতে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে। মিনিট দশেকের মধ্যে শহর ছাড়িয়ে সে চলে এল পাহাড়ের ওপাশে। এদিকে ঘরবাড়ি কম, রাস্তা নির্জন। কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর একটা বাঁকে সে গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর নীচে নেমে সামনে তাকাল। বিশাল খাদের শেষে জঙ্গলে মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। সেটা ছড়িয়ে আছে বহুদূর পর্যন্ত। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এরকম জনমানবহীন এলাকার একটা হোটেলে তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে নাকি? অসম্ভব! মালিকের ছেলে হয়ে সেলস এবং প্রমোশনের দায়িত্ব নিয়ে মাইনে নিতে হবে? কত টাকা দেবে দুর্যোধন মিত্র? বারো লাখ টাকা বছরে? তার মানে চব্বিশ হাজার ডলার? একটা ট্যাক্সিওয়ালাও নিউইয়র্ক শহরে ওর দ্বিগুণ রোজগার করে। তা ছাড়া হোটেলে বসে সেলসের কাজ দেখা যায় না। ক্লায়েন্ট পেতে হলে তাকে দিল্লিতে অফিস করতে হবে। দুর্যোধন মিত্রকে এটা বুঝতে হবে। না বুঝলে তার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। সুন্দর সিগারেট ধরাল। আমেরিকায় থাকার সময় এই নেশা থেকে সে মুক্ত হয়েছিল বাধ্য হয়ে। সর্বত্র সিগারেটবিরোধী কথাবার্তা। কেউ সিগারেট খেলে তার দিকে মানুষ করুণার চোখে তাকায়। দিল্লিতে নেমে টিনার সঙ্গে দুটো রাত থেকে সিগারেট খেতে ভালো লাগছে। টিনাও সিগারেট খায়। টিনা আর ও সিগারেট একসঙ্গে খায়। আলাপ হয়েছিল নিউইয়র্কে। আলাপের দ্বিতীয় দিনেই টিনা বলেছিল, 'হাউ অ্যাবাউট

এ বন্ডলেস ফ্রেন্ডশিপ।' উদ্দাম যৌবনের স্বাদ দিয়েছিল টিনা। মুখ-চোখ অতি সাধারণ কিন্তু ফিগার অসাধারণ। আর সেটাকে ব্যবহার করতে টিনা জানে। মাস ছয়েক আগে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে দিল্লিতে ফিরে এসেছিল মেয়েটা। ফোনে যোগাযোগ ছিল। কবে কোন ফ্লাইটে দিল্লিতে নামছে টিনাকে জানিয়েছিল সুন্দর। ওকে পেয়ে দুর্যোধন মিত্রকে জেট ল্যাগের গল্প বানিয়ে বলতে হয়েছিল।

কিন্তু দুর্যোধন মিত্রকে এবার অন্যরকম লাগছে তার। এত ব্যক্তিত্ব ভদ্রলোকের আগে ছিল না। হঠাৎ যেন ভাবনার দিক থেকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছেন। এটা কি ওঁর নতুন স্ত্রীর অবদান? ভদ্রমহিলা নাকি দিল্লির মেয়ে, ফ্যাশন ডিজাইনার। বিয়ের খবরটা সুন্দর বাবার টেলিফোনে জেনেছিল।

'সুন্দর। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি একা হয়ে যাই। এই একাকিত্ব ভুলতে ব্যবসায় ডুবে গিয়েও শান্তি পাইনি। দিল্লিতে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হল। তিনি অবিবাহিতা, ফ্যাশন ডিজাইনার। আমরা একমত হয়েছি। তারপর বিয়ে হয়ে গেল।'

কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি সুন্দরের। ওল্ডম্যান বিয়ে করলে তার কী ক্ষতি। এ বয়সে নিশ্চয়ই বাবা হওয়ার সাধ হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই লেডিই দুর্যোধন মিত্রের এই ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোক্তা। মহিলা বোধহয় তার অস্তিত্ব মানতে পারছেন না। পারছেন না বলে দুর্যোধন মিত্র নিজের ছেলেকে কর্মচারী হিসেবে দেখতে চাইছেন। নিজের বাড়িতে যেতে না দিয়ে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। মাথা গরম হয়ে গেল সুন্দরের। গাড়িতে উঠে সেটাকে ঘুরিয়ে সোজা চলে এল দুর্যোধন মিত্রের প্রাসাদে। গাড়ি থেকে নামতেই পুরোনো দারোয়ান ছুটে এসে সেলাম করল। সুন্দর বলল, 'মেমসাব কে বলো আমি এসেছি।'

'মেমসাব তো এখানে নেই ছোটা সাহেব।'

'কোথায় গেছেন?'

'দিল্লিতে।'

'শিট!' আবার গাড়িতে উঠে বসল সুন্দর।

হোটেলে ফিরে এসে লবিতে পা দিতেই ওর মনে হল তার এত রেগে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। তার দেখা সেরা সুন্দরী এই হোটেলে কাজ করছে। ও কাছে থাকলে পৃথিবীর আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

সোজা রিসেপশনে গিয়ে সে বলল, 'আমি জানি না আমার ঘর কোথায়! তুমি কি দয়া করে খুঁজে দেবে?'

লীলা অবাক হয়ে পাশে দাঁড়ানো সহকর্মীর দিকে তাকাল। ছেলেটি বলল, 'স্যার ইওর রুম ইজ ইন ফিফথ ফ্লোর। আপনার লাগেজ ওখানে পৌঁছে গিয়েছে।' সে ইশারায় একজন বেয়ারাকে ডাকল। লোকটা কাছে এলে বলল, 'সাহেবকে ওঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো।' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

হাসল সুন্দর। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ লীলা।' তারপর বেয়ারাকে অনুসরণ করল। লিফটে পাঁচতলায় উঠে দেখল নাম্বারবিহীন ঘর আছে অনেক। সে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভার্গব সাহেব কোথায় থাকেন?'

'বাঁদিকের সেকেন্ড রুম স্যার।'

'ফার্স্ট রুমটা কার?'

'আপনার স্যার।'

একটু ভালো লাগল সুন্দরের, 'বাকি ঘরগুলোতে কারা থাকে?'

'হোটেলের ছেলে স্টাফরা দুজন করে এক ঘরে। শেষ দুটো ঘরে লেডিসরা।'

'লীলা মেমসাব কোন ঘরে থাকেন?'

'একদম শেষটায়।' বেয়ারা দরজা খুলে দাঁড়াল।

'এবার তুমি যেতে পারো।'

বেয়ারা চলে গেলে ঘরে ঢুকল সুন্দর। অনাড়ম্বর ঘর। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সব আছে কিন্তু কোনও বাহুল্য নেই। নিজের সুটকেস দুটো দেখল সে।

ফোন তুলে রুম সার্ভিসে ডায়াল করল। 'সুন্দর মিত্র বলছি।'

'ইয়েস স্যার।'

'আই অ্যাম হাংরি অ্যান্ড আই অ্যাম নট ভেজিটেরিয়ান। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ইয়েস স্যার।'

'ও হ্যাঁ, হোটেলে ব্লু লেভেল আছে?'

'ইয়েস স্যার।'

'একটা বোতল পাঠিয়ে দিন উইথ লট অব আইস। কুইক।'

সুটকেস খুলে পোশাক বের করে বাথরুমে গিয়ে একটা শাওয়ার নিল সুন্দর। তারপর ঘরে ফিরে টিভি খুলল। নিউজ হচ্ছে। বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল সে। রামু আঙ্কল! কী বলছে রামু আঙ্কল! শোনার আগেই অন্য খবরে চলে গেল সঞ্চালক। একটা সময় লোকটা ভ্যাগাবন্ড ছিল। ফালতু লেবার। দুর্যোধন মিত্র লোকটাকে প্রথমে নেতা বানালেন। তারপর এমএলএ। এমএলএ থেকে এমপি। বলা যায় না, সামনের বার এমপি থেকে মিনিস্টার বানিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দরজায় শব্দ হল। সুন্দর বলল, 'ইয়েস!'

বেয়ারা ঘরে ঢুকে পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে, হুইস্কির বোতল খুলে বরফ পাশে দিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

বোনলেস চিকেন মুখে পুরল সুন্দর। বাঃ! রামু কাকা কী বলছিল? এখানে না দিল্লিতে! ইন্টারেস্টিং। সে বোতলটা চোখের সামনে তুলল। এই পাহাড়ি শহরে লেভেল এখন চাইলেই পাওয়া যায়। কে যেন বলছিল, স্কটল্যান্ডে ব্ল্যাক লেভেল বছরে যত বোতল তৈরি হয়, ভারতবর্ষে তার দ্বিগুণ বোতল লোকে খালি করে। কোত্থেকে আসে সেগুলো? এই ব্লু লেভেল জাল না তো? সে বোতলের তলাটা পরীক্ষা করল। না! কোনও ফুটোর দাগ নেই।

তিন পেগ হুইস্কির সঙ্গে খাবার যখন প্রায় শেষ তখন সুন্দর টেলিফোন তুলে অপারেটরকে বলল, 'রামু আঙ্কলকে ধরুন তো।'

'স্যার রামু আঙ্কল কে?'

মাই গড! আপনি এখানে চাকরি করছেন কী করে? হু ইজ ইওর এমপি?'

'ওহো, সরি স্যার, এক্ষুনি দিচ্ছি।'

'অপদার্থ!' বিড়বিড় করল সুন্দর।

কয়েক সেকেন্ড পরে রামচন্দ্রের গলা শুনতে পেল সে, 'ওয়েলকাম ব্যাক? কেমন আছ? ও, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।'

'বাট রামু আঙ্কল, তোমার জনপ্রিয়তা কি আর আগের মতো নেই?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'হোটেলের অপারেটরকে বললাম রামু আঙ্কলকে ধরুন, কিন্তু ও জিগ্যেস করল, স্যার রামু আঙ্কল কে? হা-হা-হা।'

'ওরা আমাকে আঙ্কল বললে চিনবে না সুন্দর। রামু ভাইয়া বললে বুঝতে পারত। যাকগে। তুমি তো হোটেলেই আছ।'

'ইয়েস। ইওর ওল্ডম্যান এখানে থাকতে বলেছে। বাট রামু আঙ্কল, তুমি এখন কী করছ? তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। প্লিজ কাম হিয়ার।'

'খুব দরকার?'

'খুব।'

'ঠিক আছে, ঘণ্টা দুয়েক পরে যাচ্ছি।'

'নো নো। রাইট নাউ।'

'আচ্ছা!' হাসলেন রামচন্দ্র বণিক।

সুন্দর যখন পাঁচ পেগে পৌঁছে গেছে তখন তার দরজায় শব্দ হল। সে জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'কে ওখানে?'

রামচন্দ্র বণিক ঘরে ঢুকে হাসলেন, 'ও মাই গড! কতটা খেয়েছ?'

'এই তো। এতটুকু। বসো বসো রামু আঙ্কল। তোমাকে টিভিতে খুব হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল। কেন দেখাচ্ছিল?'

রামচন্দ্র হাসলেন। 'আর ইউ অলরাইট সুন্দর?'

'কেন?' চোখ বড় করল সুন্দর।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব টায়ার্ড। আর একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছ!'

'নো। আমি টায়ার্ড নই, বেশি ড্রিঙ্কও করিনি।'

'বেশ। কী কথা বলতে চেয়েছ।'

দুর্যোধন মিত্র, মাই ফাদার, লোকটাকে আমি চিনতে পারছি না।' তুমি চেনো?'

'কেন এ কথা মনে হচ্ছে?'

'বলছি, তার আগে বলো, তুমি দুর্যোধন মিত্রের সেকেন্ড ওয়াইফ, মাই স্টেপ মাদার, তাকে দেখেছ। আলাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। খুব ভালো ভদ্রমহিলা।'

'তা তো বলবেই।'

'আমি বানিয়ে বলছি না।'

'আমি কী করে জানব? তুমি কে? একটা সাধারণ শ্রমিক ছিলে, ওই লোকটা তোমাকে নেতা বানিয়েছে, এমএলএ, এমপি। তুমি তো ওর বউয়ের প্রশংসা করবেই।' মুখ ফেরাল সুন্দর।

'সুন্দর, উনি তোমার মা।'

'সরি, আমার একজনই মা অ্যান্ড শি ইজ ডেড।'

'ও.কে। হোয়াট ইজ ইওর প্রবলেম?'

'আরে রামু আঙ্কল, তুমি ইংরেজি বলছ? হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ! গুড। শোনো, আমি এখানে কেন এলাম? দুর্যোধন মিত্র আমাকে ওর এমপ্লয়ি করে দিল। অ্যান্ড আমার বস হল ওই ভার্গব লোকটা। আমাকে থাকতে হবে এই ঘরে। অ্যান্ড দ্যাট বিচ থাকবে ওই প্রাসাদে। আমি এটা মেনে নিতে পারছি না। এটা আমার সমস্যা। তাই না?'

'হুঁ। দ্যাখো সুন্দর, তোমাকে আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে জানি। মনে আছে, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে খুব ভালোবাসতে। আজ তোমার সমস্যা শুনে আমার খারাপ লাগছে। মিস্টার মিত্রের উচিত ছিল এই হিলটপ হোটেলটাকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া। ওঁর পরে তুমি এই হিলটপ হোটেলের মালিক হবে। একজন কর্মচারীর আন্ডারে তোমাকে কাজ করতে বলা ঠিক হয়নি।' রামচন্দ্র বণিক খুব ধীরে ধীরে বললেন।

'এই কথাগুলো তুমি ফাদারকে বলতে পারবে না?'

'কোনও কাজ হবে না। এখন উনি আমার কথা শোনেন না।'

'যাতে শোনেন সেই ব্যবস্থা করো।'

'মানে?'

'পলিটিক্যাল পার্টি তোমার হাতে।'

'ও! আমি তোমাকে বলব মাসখানেক ধৈর্য ধরতে।'

'তাই। বেশ। তাই হবে। হোয়াট অ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক?'

'সরি সুন্দর। গুড নাইট।' রামচন্দ্র বণিক উঠে দাঁড়ালেন।

পরদিন সকাল দশটায় মিস্টার ভার্গবের সঙ্গে কথা বলল সুন্দর। ভারতবর্ষ তো বটেই, পৃথিবীর অন্য দেশে হিলটপের কথা প্রচার করতে টুরিস্টদের আকর্ষণ করতে হলে এই পাহাড়ি শহরে বসে সে কিছুই করতে পারবে না। তার প্রস্তাব দিল্লিতে একটা অফিস খুলতে হবে। তার ফলে বিভিন্ন অ্যাসেম্বলি বা কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছাড়া সর্বভারতীয় কাগজগুলোতে হিলটপ সংক্রান্ত খবর ছাপাতে পারবে। বিজ্ঞাপন দেওয়াও অত্যন্ত দরকার। সাংবাদিকদের এখানে নিয়ে এসে আতিথ্য দিলে তাঁরা ফিরে গিয়ে বিভিন্ন কাগজে বিশদ লিখবেন। এগুলোর ব্যবস্থা দিল্লিতে অফিস থাকলেই সম্ভব হবে।

মিস্টারর ভার্গব সুন্দরের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে পারলেন না। হিলটপের ওয়েবসাইট হলেও ইনকয়ারি আসছে কিন্তু সুন্দরের প্রস্তাব অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হল তাঁর। তবে দেখতে হবে এ বাবদ কী রকম খরচ হবে। তিনি বললেন, 'আপনার ভাবনাটা আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি এ ব্যাপারে আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলুন।'

'নো। আমি আপনাকে জানালাম, আপনি ওঁকে রাজি করান।'

মিস্টার ভার্গব হাসলেন, 'বেশ তাই হবে।'

'দ্বিতীয় কথা, আপনি জানেন ক্লায়েন্ট এন্টারটেনমেন্ট একটা জরুরি ব্যাপার। আমি প্রতি মাসে কত টাকার বিল সই করতে পারি?'

'এখানে কেউ এলে হিলটপেই তাদের নিয়ে বসতে পারেন।'

'বাইরে যেতে হবে। কেউ তো সময় নষ্ট করে এখানে এন্টারটেইন্ড হতে চাইবে না।'

'কত হলে ভালো হয়?'

'অন্তত এক লক্ষ টাকা।'

মিস্টার ভার্গব একটা প্যাড টেনে নিয়ে নোট করলেন।

'আমি একজিকিউটিভ ক্লাসে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত।'

'ও.কে.।'

'কালকে আমাকে জিগ্যেস করা হয়েছিল আমার এক্সপেক্টেশন কত? ওয়েল, ফোর থাউজেন্ড ডলার পার মান্থ।'

'আমি মিস্টার মিত্রের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে কনফার্ম করব।'

সুন্দর উঠে দাঁড়াল। 'ও হ্যাঁ, আপনারা স্কচ কোথায় পান? কে কেনেন?'

'কেন বলুন তো?'

'কাল রাতে একটা ব্লু লেভেল নিয়েছিলাম। জিনিসটা জেনুইন নয় বলে আমার ধারণা হয়েছে। আমাদের ইমপোর্ট লাইসেন্স আছে?'

'না।'

'ওটা পাওয়ার ব্যবস্থা করুন।' সুন্দর বেরিয়ে গেল।

দ্রুত সুন্দরের প্রস্তাব এবং দাবিগুলো লিখে মেইল করে দিলেন মিস্টার ভার্গব দুর্যোধন মিত্রের কাছে।

দশ মিনিট পরে ফোন পেলেন ওঁর পি-এর কাছ থেকে, 'স্যার হেড অফিসে লাঞ্চ পর্যন্ত থাকবেন। আপনি ফ্রি হলে দেখা করতে বলেছেন।'

মিস্টার ভার্গব বললেন, 'আমি এখনই ওঁর কাছে যাচ্ছি।'

বেশ অস্বস্তি নিয়ে গাড়িতে উঠলেন অবিনাশ ভার্গব।

হোটেলটা ভালো করে ঘুরে দেখল সুন্দর। তারপর লবিতে নেমে এসে রিসেপশনে পৌঁছে দেখল কালকের ছেলেটির সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে কাজ করছে, সে মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, লীলা কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'স্যার, ওর ডিউটি বিকেল তিনটে থেকে।' মেয়েটি বলল।

মাথা নেড়ে নিজের ঘরে ফিরে এল সে। তারপর অপারেটরকে ফোনে ধরল, 'আমি সুন্দর মিত্র বলছি।'

'বলুন স্যার।'

'পাঁচতলার স্টাফ রুমগুলোতে কি ফোন আছে?'

'হ্যাঁ স্যার। ডাইরেক্ট ডায়ালিং নেই, এক্সটেনশন আছে।'

'লীলা প্রধানের ঘরের লাইনটা অন করুন।'

একটু পরেই অপারেটর জানাল, 'রিং হচ্ছে স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। এবার আপনি অন্য কাজ করুন। আমি চাই না আমাদের কথাবার্তা তৃতীয় মানুষ শোনে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ও.কে স্যার।'

লীলার গলা শুনতে পেল সুন্দর, 'হ্যালো!'

'লীলা?' সুন্দর জিগ্যেস করল।

'ইয়েস।' চেহারার সঙ্গে চমৎকার মানানসই ওর গলার স্বর।

'আমি সুন্দর। সুন্দর মিত্র।'

'ও!'

'তোমার তো তিনটে থেকে ডিউটি শুরু হবে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাহলে এখন নিশ্চয়ই রেস্ট নিচ্ছ।'

'স্যার, এনি প্রবলেম?'

'আর কী বলব। এখানে এসে খুব বোর হচ্ছি। ভাবলাম তুমি যদি ফ্রি থাক তাহলে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।' হাসল সুন্দর। 'আপত্তি নেই তো?'

'আমি—আমি—!'

'দাঁড়াও, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মনে রেখো আমি তোমার বস নই। বরং তুমি আমাকে বন্ধু ভাবলে খুশি হব। বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সুন্দর। আজ এই পর্যন্ত থাক। কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে চায় না সে। একেক খেলার একেক নিয়ম। টিনার সঙ্গে যে নিয়মে খেলতে হয়েছে তা লীলার সঙ্গে খেলা যাবে না। এখানে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য ধরার অভ্যাস তার কখনও ছিল না। আজ মনে হচ্ছে, এরও একটা আলাদা স্বাদ আছে। অন্য ধরনের রোমাঞ্চ। আর শুধু এর জন্যই এই পাহাড়ে থাকা যায়। এই সময় টেলিফোন বাজল। অপারেটর জানাল, 'বড় সাহেবের পি-এ লাইনে আছেন স্যার।' সুন্দর হ্যালো বলতেই পি-এ কথা বলল, 'স্যার, আপনি কি এখনই একবার হেড অফিসে আসতে পারবেন? স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

মিস্টার ভার্গব কাগজটা এগিয়ে দিলেন। পাঁচতারা হোটেলের সেল এবং কমিউনিকেশন যেসব অফিসার দেখেন তাঁদের বছরে কত টাকা দেওয়া হয়, খুব ভালো কাজ হলে কী পরিমাণ উৎসাহভাতা

তাঁরা পেয়ে থাকেন এবং ক্লায়েন্টদের মনোরঞ্জনের জন্য কত টাকার বিল তাঁরা সই করতে পারেন তার হিসাব ওই কাগজে আছে। হোটেল অনুযায়ী অঙ্কটা একটু বেশি বা কম থাকলেও দুর্যোধন মিত্র লক্ষ করলেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'এরা ইকোনমি ক্লাসে ট্রাভেল করে?'

'সাধারণত। তবে সিট না পাওয়া গেলে একজিকিউটিভ ক্লাসে।'

পি-এ দরজা খুলল, 'স্যার, উনি এসেছেন।'

'আসতে বলো।' কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন দুর্যোধন মিত্র।

ঘরে ঢুকল সুন্দর। 'গুড মর্নিং ড্যাডি।'

'গুড মর্নিং। হোটেল কেমন লাগল?'

'ভালো, বেশ ভালো।'

'শোনো, মিস্টার ভার্গব তোমার প্রস্তাবগুলো আমাকে জানিয়েছেন।

দিল্লিতে অফিস করার ব্যাপারটা আমারও পছন্দ হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষ তো বটেই, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে দিল্লিতে অফিস রাখা দরকার। গুড আইডিয়া।'

'থ্যাঙ্কস।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বাবদ আমরা কত খরচ করব? হিলটপের এখন যতগুলো ঘর আমরা গেস্টদের দিতে পারি এবং তার সবগুলো যদি ভরতি হয়ে থাকে তাহলে যে ইনকাম হবে তার কতটা আমরা ওই অফিসের জন্য খরচ করতে পারি তা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আমাকে আজই দেবে।'

'কিন্তু এটা খুব জরুরি'—সুন্দর বলল।

'আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু ওটা করে হিলটপের এক লক্ষ টাকা আয় বাড়ল অথচ ওই অফিসের জন্য দেড় লক্ষ টাকা খরচ হল, আমি তাহলে এখনই অফিসটা চাইব না। আমরা এক বছর দেখব। রেসপন্স ভালো দেখলে হিলটপের এক্সটেনশন হবে। আরও রুম বাড়বে। তখন খরচটা কাজে লাগাব।'

ড্যাডি, ক্লাসে আমাদের একটা গল্প বলা হত। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় হরলিক্সের উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ওরা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছে সমানে। সেই বিজ্ঞাপন দেখে লোক দোকানে গিয়ে শুনত ওটা নেই। এর ফলে চাহিদা এত বেড়ে গেল যে যুদ্ধ শেষ হলে প্রোডাক্ট বাজারে যখন বেশি দামে এল তখন বিক্রি বেড়ে গেল হুহু করে।'

'হোটেল হরলিক্স নয়।' হাসলেন দুর্যোধন, 'তবে আমরা একজন স্টাফ নিয়ে একটা ছোট অফিস দিল্লিতে খুলতেই পারি। দ্বিতীয় পয়েন্ট। তুমি চার হাজার ডলার মাসে চেয়েছ। আমেরিকায় এটা কিছু নয়। সেখানে এক কাপ চায়ের দাম দেড় ডলার। তা দিয়ে এখানে দশ কাপ চা কেনা যায়। আমরা তোমাকে প্রথম তিন মাস মাসে ত্রিশ হাজার করে দেব। তোমার কাজের রিপোর্ট ভালো দেখলে চতুর্থ মাস থেকে ষাট হাজার করে পাবে। ক্লায়েন্টদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য তুমি মাসে এক লক্ষ টাকার বিল সই করতে চেয়েছ। এটা পঁচিশ হাজারের বেশি সম্ভব নয়। প্লেনে তুমি একজিকিউটিভ ক্লাসে তখনই যেতে পারবে যখন ইকোনমি ক্লাসে কোনও সিট থাকবে না। ও.কে.? তুমি এবার যেতে পারো।'

'তুমি কি আমার বক্তব্য শুনতে চাইছ না?'

'ও, আমি ভেবেছিলাম তুমি এসব অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছ।'

'আমার পক্ষে তোমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

'ওয়েল! তুমি কি আজই হোটেল থেকে চলে যেতে চাইছ?'

'না, আমি মনে করছি তুমি আমাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছ না।'

'মর্যাদা কেউ কাউকে এমনি দেয় না, ওটা যোগ্যতা দেখিয়ে আদায় করে নিতে হয়। তুমি যদি সেটা করতে পারো তাহলে তোমার প্রস্তাবে আমি আপত্তি জানাব না।' দুর্যোধন মিত্র গম্ভীর মুখে বললেন।

'ওয়েল, আমি কয়েকটা দিন সময় চাইছি।'

'এই কয়দিন তুমি কী করতে চাইছ?'

মিস্টার ভার্গব চুপচাপ শুনছিলেন। এবার কথা বললেন, 'স্যার, আগামী পরশু থেকে গৌহাটিতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া টুরিজম কনফারেন্স শুরু হচ্ছে দু-দিনের। মিস্টার মিত্র যদি সেখানে হিলটপকে রিপ্রেজেন্ট করেন তাহলে খুব ভালো হয়।'

'নিশ্চয়ই।' দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'ওখানে গেলে হিলটপ প্রচারিত হবে। আপনি হিলটপ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ওকে দিয়ে দিন। অফিসকে বলুন এয়ার টিকিট বুক করতে, হোটেলের রিজার্ভেশন করতে।'

'ও.কে. স্যার। আমি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

মিস্টার ভার্গব বেরিয়ে গেলে সুন্দরের দিকে তাকালেন দুর্যোধন। 'কিছু বলবে?'

'তুমি আমার সঙ্গে একজন কর্মচারীর তফাত রাখছ না।'

'দ্যাখো, কাজের জায়গার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলো না।'

'কিন্তু আমি তোমার একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন এই ভাবনাটা মাথায় এনো না।'

'কী বলতে চাইছ?'

'ওয়েল, তোমার স্টেপ মাদার তো মা হতে পারেন।'

'মাই গড। আমি এটা কখনও ভাবিনি।'

'এসব কথা না ভাবাই ভালো।' দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'আরেকটা কথা। ব্লু লেভেল হুইস্কির নাম অনেক। এক রাতে হাফ লিটার শেষ করার বিলাসিতা আর কোরো না। তোমার যদি ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে হয় ট্রাই ইন্ডিয়ান হুইস্কি। এখন ইন্ডিয়ান হুইস্কির স্ট্যান্ডার্ড বেশ ভালো।'

'তুমি কি আমার ওপর মনিটরিং করছ?'

'হোটেলটাকে আমি আমার হাতের তেলোর মতো দেখতে চাই। আর একটা কথা, রিসেপশনে কাজ করে যে মেয়েটি, কী যেন নাম, হ্যাঁ, লীলা প্রধান, ওর সম্পর্কে তুমি কোনও ইন্টারেস্ট দেখিও না।'

'কেন?' শক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল সুন্দর।

'কেন মানে? তুমি বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'হোটেলের কোনও এমপ্লয়িকে সিকিউরিটি দেওয়া আমার কর্তব্য।'

'বুঝলাম না। আমি এমন কী করেছি যে লীলা বিপদে পড়েছে?'

'একজন সামান্য রিসেপশনিস্ট সম্পর্কে তুমি কেন ইন্টারেস্টেড হবে। তা ছাড়া ওকে রিকমান্ড করেছে রাম। ও এখানকার এমপি।'

'যদি লীলা মনে করে ওর কোনও সমস্যা হচ্ছে না আমার সঙ্গে কথা বলতে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কিছু বলার থাকবে না।' উঠে দাঁড়াল সুন্দর।

'শোনো, তুমি সময় চেয়েছ, তোমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। পরশু এই সময়ে তোমার মতামত জানাবে।'

'যদি তোমার প্রস্তাব একসেপ্ট না করতে পারি তাহলে আমাকে ওই হোটেল ছেড়ে

চলে যেতে হবে?'

'অফকোর্স।'

'কিন্তু কোথায় যাব?'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

'গুড। আমাকে কদিন পরে দিল্লিতে যেতে হবে। আমার স্টেপ মাদারের মোবাইল নাম্বারটা দিও তো, ওর সঙ্গে কথা বলব।'

কপালে ভাঁজ পড়ল দুর্যোধন মিত্রের 'কেন?'

'বাঃ। স্টেপ হলেও উনি তো সম্পর্কে আমার মাদার। আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় থাকা দরকার।' বেরিয়ে গেল সুন্দর।

দুর্যোধন মিত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। না। এই ছেলেকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। ও যদি হিলটপের কাজ না করে, এই শহর থেকে চলে যেতে হবে। তখন দিল্লিতে গিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করে কী বলবে তা তিনি বুঝতেই পারছেন না। তবে যা বলবে তা নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষে যাবে না। দুর্যোধন মিত্র স্থির করলেন, আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করবেন। এখন পর্যন্ত সুন্দরই তো তাঁর একমাত্র সন্তান।

এটা ভাবতেই মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটেছিল হিলটপের উদ্বোধনের আগে। তারপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। শরীরে সন্তান আসছে কিনা তার প্রমাণগুলো এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই বোঝা যায়। তাঁর নিজস্ব দ্বিতীয় মোবাইলটা ড্রয়ার থেকে বের করে কৃষ্ণার নম্বর টিপলেন তিনি। রিং হচ্ছে। তার পর ওর গলা শুনলেন, 'হ্যালো।'

'কেমন আছো?' দুর্যোধন জিগ্যেস করলেন।

'এটা নতুন নাম্বার?'

'হ্যাঁ। ব্যবহার করি না।'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভালো না। একটা কথা জানতে ফোনটা করলাম।'

'বলো।'

'তোমার কি এই ঘটনার পর কোনও শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে?' জোরে হেসে উঠলেন কৃষ্ণা, 'হঠাৎ?' তারপর বললেন, 'সময় হলে জানাব। রাখছি।' ফোন রাখলেন কৃষ্ণা।

ঘরে বসে টিভি দেখছিল সুন্দর। এতকাল দেশের বাইরে থেকে ভারতীয় টিভি না দেখে কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি তার। এখন স্বল্পবাস মেয়েদের উদ্দাম নৃত্য এমটিভিতে দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে পড়ল। ঠিক তখনই টিনার ফোন এল মোবাইলে।

'হাই টিনা।'

'উমম। গিয়ে অবধি একটাও ফোন করোনি!'

'সরি ডার্লিং, এত কাজের চাপ যে শ্বাস নিতে পারছি না।'

'বাট আই অ্যাম মিসিং ইউ।'

'মি টু।'

'তুমি যদি না আসতে পারো তাহলে আমি যেতে পারি।'

'আই উইল লেট ইউ নো।'

'কবে?'

'কয়েক দিনের মধ্যে।'

'আমাকে তুমি পাগল করে দিয়েছ।'

'তুমিও। ডার্লিং, সামবডি ইজ নকিং মাই ডোর। আমি পরে ফোন করব।'

রিসিভার রেখেই তার মনে হল এই ফোনের কথাবার্তা দুর্যোধন মিত্রের কানে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়ই। যাকগে। হু কেয়ার্স! কিন্তু টিনার সঙ্গে একটা কি দুটো রাত মন্দ লাগে না। কিন্তু তার পরেই ক্লান্তি আসে যা মেয়েটা বোঝে না। টিনার সঙ্গে শরীর ছাড়া অন্য কথা বলা যায় না।

অন্য কথা? ভাবতেই লীলার মুখ মনে পড়ে গেল। লীলার সামনে কোনও কথা না বলে এক হাজার বছর বসে থাকা যায়। সঙ্গে সঙ্গে লীলাকে ফোন করতে ইচ্ছে হল। গতকালের স্কচের বোতলে অনেকটা এখনও রয়ে গেছে। গ্লাসে একটু ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল সে। আজ সরাসরি লীলাকে বলা যাক। যত রাতই হোক ওর ডিউটি শেষ হলে যেন সে এই ঘরে আসে। সে প্রমিজ করবে লীলা না চাইলে ওকে স্পর্শ করবে না। ইটস ডিফারেন্ট গেম। অন্যরকম খেলা। খেলার নিয়মও আলাদা। গতকাল যা করে এসেছে সেই পথেই হাঁটবে না আজ।

দু-পাত্র খেয়ে সে অপারেটরকে চাইল।

'ইয়েস স্যার।'

'একটু আগে দিল্লি থেকে ফোন এসেছিল, আপনি নিশ্চয়ই নোট করেছেন।'

'না স্যার। আপনার কোনও ফোন তো আসেনি।' সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল। ভুল হয়ে গেছে। টিনা ফোন করেছিল তার মোবাইলে। সে বলল, 'ও আই অ্যাম সরি। রিসেপশনে দিন।'

রিসেপশন সাড়া দিলে গম্ভীর গলায় বলল, 'সুন্দর মিত্র বলছি। লীলা প্রধানকে ফোনটা ধরতে বলুন।'

'স্যার উনি তো ডিউটিতে নেই।'

'হোয়াট? ওর তো এখন ডিউটি করার কথা।'

'দুপুরে খবর এসেছিল ওঁর বাবা খুব অসুস্থ। শুনে ছুটি নিয়ে দার্জিলিংয়ে চলে গেছেন।'

'কী হয়েছে ওর বাবার?'

'আমি ঠিক জানি না স্যার।'

'ওর মোবাইল নাম্বারটা বলুন।'

'বলছি স্যার।' ছেলেটি মোবাইল নাম্বার বললে সুন্দর নোট করে রাখল।

'কখন গিয়েছে?'

'তিনটের সময়। একটু আগে অজিত ম্যানশনে পৌঁছে গিয়েছেন।'

'অজিত ম্যানশন?'

'দার্জিলিংয়ের অজিত ম্যানশনে ওঁর বাবা থাকেন।'

'ও.কে.।'

রিসিভার রেখে দিয়ে লীলার নাম্বারটা মোবাইলে টিপল সুন্দর। কোনও সাড়া পেল না। দ্বিতীয়বারে শোনা গেল 'দি ডায়ালড নাম্বার ইজ আউট অফ রিচ।'

আর এক পাত্র খেল সুন্দর। তারপর দিল্লিতে ডলার ভাঙিয়ে যত টাকা পেয়েছিল তা পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে এখন সন্ধ্যা নেমে গেছে।

গাড়ির চাবি পকেটেই ছিল। কাউকে কোনও কৈফিয়ত না দিয়ে সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। দার্জিলিং যেতে হলে নীচে সমতল হয়ে যেতে হবে। অন্তত চার ঘণ্টার পথ। এই রাতে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাসল সুন্দর। এই খেলায় বাড়াবাড়িটাই মজা।

সমতল ডিঙিয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় পড়তেই এমন বৃষ্টি নামল যে গাড়ি থামাতে বাধ্য হল সে। অন্ধকারে বৃষ্টির দেয়াল ভেদ করতে পারছে না হেডলাইট। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে গেল তার। তিন পেগ হুইস্কি ঘুমটাকে এনে দিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে রাত এগারোটা। এখন এগোলে মাঝরাতে দার্জিলিংয়ে পৌঁছবে সে। মোবাইলে নাম্বারটাকে রিপিট করল সে। একই কথা। না, ফিরে যাওয়ার জন্য সে আসেনি। মোবাইল ফোনটা অফ করে দিল সুন্দর।

দার্জিলিং শহরে যখন সে ঢুকল তখন দুটো বাজে। ওই নিশুতি রাতে রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। দোকান, বাড়িঘরের দরজাগুলো বন্ধ। অজিত ম্যানশন কোথায় জানার জন্য একটা মানুষকেও দেখতে পেল না সে। ডাডেন ডা রোড ধরে ম্যালের মুখে এসে গাড়ি রাখল সুন্দর। ওপরে তাকাতেই সে খুশি হল। যে বিশাল বাড়ির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটাই অজিত ম্যানশন। বড় বড় করে লেখা। কিন্তু এই বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেক ফ্ল্যাট আছে। তার কোনটায় লীলারা থাকে? দরজায় দরজায় নক করে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

গাড়ি নিয়ে সোজা ম্যালের ওপর কাবী হোটেলে চলে এল সে। বড় হোটেলের রিসেপশনে সারা রাত লোক থাকে। ঘর পেতে অসুবিধে হল না তাই।

সুন্দরের ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। টয়লেটেই ব্রাশ-পেস্ট থাকে। একেবারে স্নান করে নিয়ে সে রিসেপশনে এসে ভাড়া মিটিয়ে অজিত ম্যানশনে চলে এল গাড়ি নিয়ে। এখন ম্যাল মানুষভরতি। অজিত ম্যানশনের দোকানগুলো খুলে গেছে। একজনকে জিগ্যেস করতেই লীলাদের ফ্ল্যাটের হদিস পেয়ে গেল সুন্দর। বেল বাজাতেই দরজা খুলল লীলা। খুলেই চমকে উঠল। সুন্দর দেখল এই সকালে লীলার পরনে বাসন্তী রঙের সালোয়ার-কামিজ।

'তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?'

'ভালো নয়।'

'ডাক্তার দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'অসুখটা কোথায়?'

'হার্টের প্রবলেম।'

'কীভাবে নিয়ে যাবে?'

'আর একটু পরে কাউন্টার খুললে ট্রেনের টিকিট পেতে চেষ্টা করব। এনজেপি থেকে ট্রেন ছাড়ে।'

'কলকাতার কাউকে চেনো?'

'আমার মামা থাকেন।'

'আমি ওঁকে দেখতে পারি?'

'আপনি হঠাৎ?'

'এর জবাব আমি দেব না। কাল বিকেলে খবরটা পেয়ে গাড়ি নিয়ে আসছিলাম। রাস্তায় বৃষ্টি হওয়ায় আটকে যাওয়ায় মাঝরাতে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছি। না হলে কাল রাতেই আসতাম। চলো।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক শুয়ে ছিলেন খাটে। লীলা আলাপ করিয়ে দিয়ে তার বাবাকে বলল, 'হিলটপের এমডির ছেলে উনি।'

ভদ্রলোক হাতজোড় করলেন, 'আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। রামচন্দ্র বণিকের সুপারিশে মেয়ে ওখানে কাজ পেয়েছে। নতুন কাজ। তবু আমার অসুস্থতার খবর পেয়েই ওকে ছুটি দিয়েছেন আপনারা। মালিকের ছেলে হয়েও আমাকে দেখতে এসেছেন, এরকমটা আজকাল দেখা যায় না।'

'আপনি কথা বলবেন না। আপনি লীলার মা?'

ঘরে ঢোকা এক প্রৌঢ়া মাথা নাড়লেন।

'আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আমি আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুন্দর। পেছন পেছন এসে লীলা জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'প্লেনের টিকিট কাটতে। দুটোয় ফ্লাইট আছে। তিনটের মধ্যে উনি পৌঁছে যাবেন। আপনার মামাকে বলুন নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করে এয়ারপোর্টে আসতে।

'সরি স্যার, প্লেনের টিকিট আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারব না।'

'করতে হবে না। এটা হিলটপ বোস্টন দেবে।'

আধঘন্টার মধ্যে তিনটি প্লেনের টিকিট কিনে এনে সুন্দর বলল, 'আমাদের মিনিট দশেকের মধ্যে বেরুতে হবে। মামাকে ফোন করে ছিলেন?'

'হ্যাঁ ওর বন্ধু আছে, বিড়লা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু—!' লীলা থামল।

'কিন্তু কী?'

'আপনি যে এখানে এসেছেন তা হোটেলে বলেননি?'

'কেন?'

'আমার ফোনটা কাল থেকে কাজ করছিল না। একটু আগে বাজল। হোটেল থেকে বাবার অবস্থা জানতে চাইছিল। আপনি প্লেনের ব্যবস্থা করছেন শুনে ওরা অবাক হল। বলল, কাল থেকে আপনাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন।'

হাসল সুন্দর। বলল, 'ওঁদের নিয়ে নীচে আসুন। আমি গাড়িতে আছি।'

নীচে নামল সে। মোবাইল অন করে দুর্যোধন মিত্রের নাম্বার টিপল, 'সরি ড্যাড। তাড়াহুড়োতে তোমাকে বলে আসিনি।'

'আমি এইমাত্র খবর পেলাম তুমি দার্জিলিংয়ে লীলার বাড়িতে আছ।'

'না। এখন আমি গাড়িতে।'

'আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম।'

'ও ড্যাডি!'

'তুমি এক্ষুনি চলে এসো।'

'যাব। তুমি পুলিশকে বলে দাও আমি ফিরছি। ওদের বাগডোগরায় নিয়ে গিয়ে ফ্লাইটে তুলে দিয়ে ফিরে যাব।'

'হু ইজ পেয়িং দিস এয়ারফেয়ার?'

'অবশ্যই হিলটপ।'

'নো। লীলা যে চাকরি করে তাতে ও প্লেনের খরচ পেতে পারে না।'

'কলকাতার ডাক্তার যদি বলে অপারেশন করতে হবে তাহলে—!'

'মিস্টার ভার্গব ঠিক করবেন লীলা কতটা সাহায্য পেতে পারে!'

'মালিকের ছেলের কোনও কথার দাম নেই?'

'এই ক্ষেত্রে নয়।'

ফোন কেটে দিল সুন্দর। তারপর সেট অফ করে দিল।

মা-বাবাকে পেছনের সিটে বসিয়ে ড্রাইভিং সিটের পাশে বসল লীলা। গাড়ি চলতে শুরু করলে লীলা বলল, 'মামা ফোন করেছিলেন, এয়ারপোর্টে আসছেন।'

লীলার মা বললেন, 'বাবা, দেবদূতের গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখলাম। আমরা কাল হতাশায় ভেঙে পড়েছিলাম। আজ যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'আমি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সকালে আপনারা কি কিছু খেয়েছেন?'

'ওকে কমপ্ল্যান আর বিস্কুট দিয়েছিলাম।'

কার্শিয়াং টুরিস্ট লজ থেকে অনেকগুলো চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি কিনে দিল সুন্দর। লীলা জিজ্ঞাসা করল, হিলটপের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়ে গেছে।'

বলামাত্র ফোন বাজল। লীলা নাম্বার দেখে বলল, 'মিস্টার ভার্গব।'

'কথা বলো। কিন্তু আমাকে বলতে বলো না।' সুন্দর হাসল।

'হ্যালো।' রিং থামিয়ে কথা বলল লীলা। গাড়ি চালাতে চালাতে আড়চোখে তাকাল সুন্দর। লীলা বলল, 'ইয়েস স্যার। ও.কে. স্যার। কলকাতায় হার্ট স্পেশালিস্ট আজই দেখাতে চাই বলে উনি ফ্লাইটে যেতে বললেন। বাগডোগরা থেকে দুটোর সময় ফ্লাইট। টিকিট পেয়ে গেছি। ও.কে. স্যার।'

মোবাইল ব্যাগে রেখে দিল লীলা। 'কে'? জিগ্যেস করল সুন্দর।

'মিস্টার ভার্গব জানতে চাচ্ছিলেন।'

'কী?'

'আপনি আমাদের লিফট দিচ্ছেন কি-না। বললেন, বাবার অসুখের ব্যাপারটা জানিয়ে এখনই ছুটির অ্যাপ্লিকেশন মেইল করতে। আমরা কীভাবে কলকাতায় যাচ্ছি তা জানতে চাইলেন।' লীলা তাকাল, 'আপনি ওঁদের কিছু জানাননি স্যার?'

'চিন্তা কোরো না। ফিরে গিয়ে জানিয়ে দেব।'

'মিস্টার ভার্গব খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেল ওরা। আজ কোনও বিশেষ কারণে ভিজিটর্সদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তার টিকিট বিক্রির কাউন্টারও বন্ধ। একটা ট্রলিতে সুটকেসগুলো চাপিয়ে দিয়ে সুন্দর বলল, 'আপনারা ভেতরে গিয়ে চেক ইন করুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। সুন্দর লক্ষ করল যেতে যেতে লীলা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে গেল। পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশ সুন্দরকে বলল, 'ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরের রেস্টুরেন্টে চলে যান। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ওঁরা ওখানে যেতে পারবেন।' ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ির খোঁজে এগোল সুন্দর।

দোতলায় উঠে সে নীচের হলঘরটাকে দেখতে পেল। কাউন্টারগুলোর সামনে লাইন পড়েছে। লীলাকে দেখা গেল, সুটকেসগুলো ওজন যন্ত্রে তুলে দিচ্ছি। তারপর বোর্ডিং কার্ড নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে হেঁটে সিঁড়ির কাছে চলে এল। লম্বা খাড়া সিঁড়ি। সুন্দর চিৎকার করে বলল, 'লিফট আছে কি-না খোঁজ নাও।'

মুখ তুলে উপরে সুন্দরকে দেখে অবাক হয়ে গেল লীলা। কিন্তু লীলার বাবা মাথা নাড়লেন। তাঁকে ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে এল লীলা। ভিজিটর্স আর প্যাসেঞ্জারদের আলাদা করতে একটা কাঠের গেট রয়েছে। সিকিউরিটি চেকে যাওয়ার জন্য মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল। মা-বাবাকে দূরে দাঁড় করিয়ে কাঠের গেটের ওপাশে এসে দাঁড়াল লীলা, 'আপনি যা করলেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ স্যার।'

'কিছুই করিনি। লীলা, তোমার মাকে এখানে আসতে বলো, আমাকে তো যেতে দেবে না।' লীলা পেছনের দিকে তাকিয়ে একটু জোরে বলল, 'মা, একটু আসবে? লীলার মা এগিয়ে এলেন। সুন্দর বলল, 'সময় ছিল না তৈরি হওয়ার। কোনও প্রস্তুতি ছাড়া আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন। এটা রাখুন।'

পকেট থেকে মোটা খাম বের করে এগিয়ে দিল সুন্দর।

'এটা কী?' খামটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলেন লীলার মা।

'সামান্য টাকা আছে। আপনাদের সামনে অনেক খরচ। ওটা একবার দিন।'

লীলার মা খামটা ফেরত দিলে তার ওপর নিজের মোবাইল নাম্বার লিখে দিল সে। তারপর ওটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'প্রাথমিক কিছু খরচ এটা দিয়ে করা যাবে কিন্তু নার্সিং হোম যদি কোনও প্যাকেজ দেয় তাহলে সেই অ্যামাউন্টটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন।'

হঠাৎ কেঁদে ফেললেন লীলার মা, 'তুমি এত ভালো। আমাদের চেনো না জানো না তবু। কী ভাবে তোমার ঋণ শোধ করব জানি না।'

'আশ্চর্য! আমার মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। আপনাকে মা ভেবে যদি সামান্য কিছু করি তাহলে আপনি ঋণ শোধ করার কথা ভাববেন? যান। উনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।' হাসল সুন্দর।

মাইকে বারংবার যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছিল সিকিউরিটি চেক করাতে।

লীলা কাঠের গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আজ অবধি কারও কাছে কোনওরকম ফেবার নিইনি। জানি না আমার এই চাকরিটা থাকবে কি-না? আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছিলাম যার সঙ্গে এই ব্যবহারের কোনও মিল নেই। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

লীলা চলে যাচ্ছিল, সুন্দর তাকে ডাকল, 'লীলা!'

লীলা দাঁড়াল, ফিরে তাকাল।

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

মুখ তুলল লীলা। চোখে ঔৎসুক্য।

'আমাকে এখন থেকে আর স্যার বোলো না। সুন্দর বলবে।'

একটু ভাবল, মাথা নাড়ল, তারপর মা-বাবাকে নিয়ে সিকিউরিটি চেকিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল সুন্দর। তারপর রেস্টুরেন্টে ঢুকে রানওয়ের দিকে কাচের জানালার পাশে টেবিলে বসল। রানওয়েটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা মাঝারি সাইজের প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ পরিষ্কার। ওয়েটার এলে সে একটা ডাবল ডিমের ওমলেট আর টোস্ট দিতে বলল। সঙ্গে কফি।

খুব ভালো লাগছিল সুন্দরের। মহিলাদের সঙ্গে অনেক খেলা খেলেছে সে। ক্রিকেটের পরিভাষায় কোনওটা টোয়েন্টি-টোয়েন্টি, কোনওটা ওয়ান ডের পঞ্চাশ ওভারের। সেগুলো শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়। চটজলদি একটা উত্তেজনার আগুন পোয়ানো যার নিট ফল। কখনও টেস্ট ম্যাচ খেলেনি সে। এই খেলার মজাই আলাদা। তাড়াহুড়ো নেই, ক্লাসিক্যাল বাজনার মতো আলাপ থেকে শুরু। গোড়ায় পৌঁছনোর আগে অনেক চড়াই-উতরাই ডিঙোতে হয়। টোয়েন্টি-টোয়েন্টিতে নিতে জানতে হয়। এই খেলায় দিতে শিখতে হয়। স্পিন বোলিংয়ে কাজ হচ্ছে না, স্পিনারকে ডাকো। স্পিনার কাজে আসছে না, আচমকা স্লো বোলারকে ডাকো। ফিল্ডিং ছড়িয়ে দাও বাউন্ডারির কাছাকাছি। বোলারকে বলো ফুলটস দিতে। দুটো না হয় বাউন্ডারি হবে, তৃতীয়টায় অবধারিত ক্যাচ উঠবে। আজ অবধি কেউ তাকে বলেনি, কীভাবে তোমার ঋণ শোধ করব, জানি না। আহা। শুনতেই মন পবিত্র হয়ে গেল। মন যে পবিত্র হয় তা আগে জানত না সুন্দর। খাবার এল। খেতে খেতে সুন্দর দেখল এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাত্রীরা লাইন দিয়ে এয়ারক্রাফটের দিকে এগোচ্ছে।

এবার লীলাদের খেতে পেল সে। লীলা তার বাবার হাত ধরে এগোচ্ছে। পেছনে ওর মা। ধীরে ধীরে ওরা পৌঁছে গেল সিঁড়ির কাছে। বোর্ডিং কার্ড দেখিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। সুন্দর হাত তুলল। নিশ্চয়ই ভেতরে ঢোকার আগে ঘুরে তাকাবে লীলা। তখন তাকে হাত নাড়তে দেখলে খুশি হবে।

কিন্তু ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। একটু নিরাশ হল সুন্দর।

কফি শেষ করতেই প্লেনের চাকা গড়াতে লাগল। তারপর পূর্বে উড়ল বিমান। চোখের নিমেষে আড়ালে চলে গেল।

নীচু গলায় সুন্দর বলল, 'গুড বাই লীলা। যাত্রা শুভ হোক।'

বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে সুন্দরের গাড়ি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আঁড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন, মোবাইল কানে চেপে নীচু গলায় বলল, 'উনি এইমাত্র এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।'

বাগডোগরা থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়িতে পৌছাতে না পৌঁছাতে আকাশে মেঘ জমল। পাহাড়ের রাস্তায় পড়ার আগে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। মন খুব ভালো হয়ে আছে এখন। ভালো কাজ করলে মন যে আনন্দিত হয় তা আজ বেশি করে বুঝেছে সে।

রাস্তা সুনসান। দুপাশে ফরেস্টের বড় বড় গাছ। পেছনে একটা সুমো গাড়ি আসছে। এখন ঘড়িতে তিনটে বাজলেও মেঘ ও বৃষ্টির কারণে আলো কমে এসেছে। কী বলবেন মিস্টার দুর্যোধন মিত্র? একজন সামান্য কর্মচারীকে সাহায্য করার জন্য তাকে হিলটপ থেকে তাড়িয়ে দেবেন? দিতে চাইলেও পারবেন না। রামু আঙ্কল তার পক্ষে থাকবেন। অবশ্য এখনই বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চায় না সুন্দর। প্রাথমিক গালাগালগুলোকে না হয় হজম করে নেবে সে। শত্রুর শক্তি যাচাই না করে যুদ্ধে নামা উচিত নয়। এই শক্তির কতটা মিসেস দুর্যোধন মিত্রের হাতে তা জানা দরকার। নাঃ। এখন আর কোনও নোংরামিতে যেতে ইচ্ছে করছে না। তেমন হলে সে মিস্টার দুর্যোধন মিত্রকে বলবে, আমি তোমার সব কথা মেনে নেব, শুধু লীলাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে দাও। স্ত্রী হিসেবে। হাসল সুন্দর। কীরকম লজ্জা লজ্জা লাগল।

সুমোটা তাকে ওভারটেক করছে। কিন্তু একি! বড় গাড়িটা তার গাড়ির গায়ে চলে আসছে কেন? তীব্র হর্ন বাজাল সে। আর তখনই সুমো গাড়ি তার গাড়িকে ধাক্কা মারল। ধাক্কাটা এত জোরে যে সামলাতে পারল না সুন্দর, গাড়িটা উলটে খাদের গায়ের গাছগুলোকে নিয়ে নীচে নেমে যেতে লাগল। ধাক্কায় ড্রাইভিং সিটের পাশে দরজা খুলে গেল সশব্দে। গাড়িটা ঠোক্কর খেতে খেতে নীচে নামছে। তাকাল সুন্দর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে জ্ঞান হারাল সে। শরীরটা ঝুলে রইল পাহাড়ের খাঁজে। গাড়ি ততক্ষণে নীচে আছড়ে পড়েছে। প্রচণ্ড শব্দ হল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

সুমো গাড়ির ড্রাইভার উপরের রাস্তা থেকে সেই শব্দ শুনতে পেল, আগুনও দেখল। হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বৃষ্টির মধ্যে সুমো গাড়িটা এগিয়ে গেল পাহাড়ি শহরের দিকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাহাড়ের মুখে মেঘ জড়াতে বেশি সময় লাগে না। সেই মেঘ ভারী হয়ে গেলেই বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। খানিকটা বর্ষণের পরে আবার সব পরিষ্কার। পাহাড়ের খাঁজে সেই বৃষ্টির জল ভিজিয়ে দিয়েছিল সুন্দরকে। শীতল জল ও হাওয়ার স্পর্শে একটু একটু করে সাড় ফিরে আসছিল শরীরে। যখন জ্ঞান আধা পরিষ্কার হল তখন শারীরিক যন্ত্রনায় গলায় শব্দ ফুটল, 'আঃ।'

চোখ মেলল সে। বুঝতে পারল তার শরীর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাহাড়ের খাঁজে ঝুলছে। একটু অসাবধান হলে পড়ে যেতে হবে অনেক নীচে। কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল সে। এখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। শীত শীত করছে খুব। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর শরীরটাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে

নিয়ে বসার চেষ্টা করল সুন্দর। পাহাড়ের শরীর থেকে খানিকটা পাথর বেরিয়েছিল, তার শরীর ঘষটে ঘষটে সেইখানে পড়ায় প্রাণটা এখনও রয়ে গেছে। হাত-পা থেকে রক্ত বেরিয়েছে প্রচুর। জামা ছিঁড়ে গেছে। সে মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল। অনেকদূরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। এতটা উঠতে সে উঠবে কী করে? সোজা হয়ে দাঁড়ালেও ধরার মতো কোনও অবলম্বন পাবে না। নীচের দিকে তাকাল সুন্দর। পাশেই একটা বহু প্রাচীন গাছ। সেটা নীচ থেকে উঠে আসেনি। পাহাড়ের গায়েই জন্মেছিল। কীভাবে সে অত বড় হল তাই রহস্য। নীচে পাহাড়ের গায়ে পরপর কয়েকটা খাঁজ রয়েছে। ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে ওই সাহায্য পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ওপরে শরীরটাকে টেনে তুলতে যে শক্তি দরকার এই মুহূর্তে তার নেই। রাত নামবার আগে যদি সে নীচের মাটিতে নেমে যেতে পারে তাহলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হবে না। সুন্দর নীচের খাঁজে পা দিল। পায়ে জুতো থাকায় ঠিক জুৎ হচ্ছে না। সে নির্দ্বিধায় জুতো খুলে ফেলল।

আধঘন্টার চেষ্টায় সুন্দর যেখানে নেমে এল সেখানে জলের শব্দ পাওয়া গেল। প্রবল স্রোতে নদী বয়ে যাচ্ছে। ওপরে ওঠার চেয়ে নীচে নামা পাহাড়ে সহজ নয়। দুবার পা পিছলে যেতে যেতেও সামলে নিল সে। শেষ পর্যন্ত মরা আলোয় নদীটাকে দেখতে পেল। দেখে মনে জোর এল। নদীর কাছে গেলে তার এ যাত্রায় মৃত্যু হচ্ছে না।

হঠাৎ সুমো গাড়িটার কথা মনে এল। ওই গাড়ির ড্রাইভার ইচ্ছে করেই তাকে ধাক্কা দিয়েছে খাদে ফেলে দেওয়ার জন্যে। অত ভারী গাড়ির ধাক্কা যে তার গাড়ি সহ্য করতে পারবে না তা লোকটা জানত। কিন্তু লোকটা কেন কাজটা করল? বোঝাই যাচ্ছে সে এই পথে ফিরবে এই খবর ওর কাছে ছিল। কিন্তু একজন বিশেষ ড্রাইভারের সঙ্গে তার তো কোনও শত্রুতা নেই। বোঝাই যাচ্ছে কেউ তাকে কাজটার দায়িত্ব দিয়েছে। কে? প্রথমেই দুর্যোধন মিত্রের মুখ মনে পড়ল। লীলাদের কলকাতায় পাঠানোর প্রস্তাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। লীলাকে কতটাকা দেওয়া হবে তা স্থির করবেন মিস্টার ভার্গব। তার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু তাই বলে নিজের ছেলেকে খুন করতে লোক পাঠাবেন তিনি? মাথা নাড়ল সুন্দর। এটা সে ভাবতে পারছে না।

দ্বিতীয় জন, যিনি এই ক্ষমতা রাখেন, তিনি রামচন্দ্র বণিক। কিন্তু তার সঙ্গে তো ভদ্রলোকের ভালো সম্পর্ক। ইদানীং দুর্যোধন মিত্রকে সহ্য করতে পারছেন না, কবে তাঁর উপকার করেছেন বলে এখনও মাথার ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছেন বলে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। তার ওপর অর্থমন্ত্রী যেভাবে দুর্যোধন মিত্রকে কবজা করেছেন তাতে রামচন্দ্রের অসন্তোষ আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু সুন্দরের সঙ্গে তো তার কোনও বিরোধ নেই। খামোকা তাকে খুন করতে লোক পাঠাবেন কেন?

তৃতীয় মুখটিকে সামনাসামনি কখনও দ্যাখেনি সুন্দর। কৃষ্ণা মিত্র, মিসেস দুর্যোধন মিত্র। সুন্দরের দ্বিতীয় মা। এখানে আসার পর সে জেনেছে ভদ্রমহিলা নাকি অসামান্যা সুন্দরী। সেই কারণেই অহঙ্কারী। তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী পরিচালিত হন দোর্দণ্ড প্রতাপ শিল্পপতি দুর্যোধন মিত্র। যেখানে বাল্যকাল এবং যৌবনের শুরু কাটিয়েছে সুন্দর সেই বাড়িতে বাস করতে অনুমতি তাকে দেননি দুর্যোধন মিত্র এবং বুঝতে অসুবিধে হয় না তার পেছনে ভদ্রমহিলার ইচ্ছে অনিচ্ছে কাজ করছে। কিন্তু যতই তার উপস্থিতি ওঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না হোক, দিল্লিতে বসে খবর নিয়ে খুন করতে লোক পাঠানো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাহলে কে পাঠিয়েছিল? হঠাৎ মনে হল, সুমোগাড়ির ড্রাইভার ভুল করেনি তো? অন্য কাউকে খুন করার কথা ছিল, ভুল করে তাকেই খুন করার চেষ্টা করেছে। সুন্দরের মনে হল এটাই স্বাভাবিক।

একটা লম্বা গাছের ডাল ধরে ধীরে ধীরে সে যখন নদীর গায়ে নেমে এল তখন আলো নিভু নিভু। নীচু হয়ে হিমশীতল জলে মুখ হাত ধুতে গিয়ে জুলুনি টের পেল সুন্দর।

*

ফোনটা এসেছিল থানায়। গাড়ির নাম্বার দিয়ে বলা হয়েছিল ওটা খাদে পড়ে গেছে। অনেক নীচে গাড়িটাকে জ্বলতে দেখা গেছে। সাবইনস্পেকটর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায় হয়েছে ঘটনাটা!'

'সোনাইঝোরার পাশে।'

'আপনার নাম কি?'

সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা কেটে দিয়েছিল সংবাদদাতা। মদ্যপান করে গাড়ি চালিয়ে মাঝে মাঝেই খাদে নেমে যায় গাড়ি। এটা নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু যে খবর দিল সে নিজের পরিচয় দিল না কেন?

সাবইনস্পেকটর ওসি-কে খবরটা জানালেন। ওসি তাকে নাম্বারটা কোন বা কার গাড়ির খোঁজ নিতে বললেন। বিকেলের মধ্যে জানা গেল গাড়িটা কার। ওসি নিজে ছুটলেন দুর্যোধন মিত্রের অফিসে। সেসময় দুর্যোধন দিল্লিতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, মিনিট পাঁচেক বাদে ওসিকে ভেতরে ডেকে হেসে বললেন, 'কী এমন জরুরি ব্যাপার যে আপনাকে ছুটে আসতে হল?'

গাড়ির নাম্বার একটা কাগজে লিখে এনেছিলেন ওসি, সেটা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পাবলিক বলছে গাড়িটা আপনাদের কোম্পানির। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কে এটা চালাচ্ছিল?'

নাম্বার দেখে বুঝতে পারলেন না দুর্যোধন ঠিক কোন গাড়ি! তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাড়িটা কি আপনাদের আইন ভেঙেছে? যদি ভাঙে তাহলে এত সামান্য ব্যাপারে—!'

'গাড়িটা খাদে পড়ে গিয়েছে বলে থানায় ফোন এসেছিল। যে ফোন করেছিল সে বলেছে আগুন জ্বলতে দেখেছে।'

'মাই গড!' সোজা হয়ে বসলেন দুর্যোধন, 'কে ফোন করেছিল?'

'নাম বলেনি। লাইন কেটে দিয়েছিল।'

তৎক্ষণাৎ ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে গাড়ির নাম্বার বলে গাড়িটা কে চালাচ্ছিল জানাতে বললেন দুর্যোধন। তারপর উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, 'কোথায় হয়েছে?'

'বলেছে সোনাইঝোরার পাশে। ওখানে রাস্তাটা বাঁকের মুখে বেশ সরু।'

'আপনারা স্পটে গিয়েছেন?'

'আমার এসআই গিয়েছে। অনেক সময় এই সব উড়ো ফোনে ভুল খবর দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের হ্যারাস করে আনন্দ পায় হয়তো। তাই জানতে এলাম গাড়ি ঠিক আছে কিনা।' ওসি হেসে বললেন।

ইন্টারকমে রিং হল। দুর্যোধন মিত্র রিসিভার তুলে বললেন, 'ইয়েস।'

ওপাশের কথা শুনে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'কি? মাই গড!'

তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। কোনওরকমে রিসিভার রেখে তিনি ঠোঁট কাটলেন।

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দিলেন দুর্যোধন মিত্র, 'না। অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করছি না।' তারপর সোজা হয়ে বললেন, 'যে ফোন করেছিল সে বলেছে গাড়িটাকে নীচে পড়ে যেতে দেখেছে? আগুন ধরে গেছে?'

'হ্যাঁ।

'কি গাড়ি তা বলেছে?'

'না।'

'কখন হয়েছে ঘটনাটা?'

'তা বলেনি।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন মিত্র।

'আপনি যাবেন?'

'অফিসার গাড়িটা চালাচ্ছিল আমার ছেলে সুন্দর, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে আসছিল সে। আমার সঙ্গে দুপুরে কথা হয়েছে তার।'

পুলিশের জিপ দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ধারে। ওসির জিপ এল, দুর্যোধন মিত্রের গাড়ি যখন সেখানে পৌঁছাল তখন সন্ধে নেমে গেছে।

সাব ইনস্পেকটার ছুটে এসে ওসিকে বললেন, 'স্যার, ওইটে সোনাইঝোরা, এখন জল নেই। আমি যখন এসেছিলাম তখন কিছুটা আলো ছিল কিন্তু জঙ্গল থাকায় লোকেট করতে পারিনি। তবে একটা গাড়ি এখান থেকে নীচে পড়েছে।'

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে বুঝলেন?'

'ওই যে খাদের দিকের দেওয়ালটা ভেঙে গেছে। ওখানে চাকার দাগ আছে। দাগটা টাটকা। কিন্তু কাল সকালের আগে নীচে নামা যাবে না।'

দুর্যোধন মিত্র গাড়ি থেকে নীচে নেমে খাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। কথাটা কানে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যদি আপনি আহত অবস্থায় নীচে আটকে থাকেন তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন?'

ওসি বললেন, 'ঠিকই। কিন্তু এতটা ওপর থেকে পড়লে বেঁচে যাওয়ার চান্স খুব কম। তা ছাড়া এই অন্ধকারে অনুসন্ধান চালানো কী করে সম্ভব?'

দুর্যোধন বললেন, 'অন্ধকার যাতে বাধা না হয় তার ব্যবস্থা করছি।'

দুর্যোধন তাঁর অফিসকে নির্দেশ দিলেন জেনারেটার, জোরালো আলোর ব্যবস্থা করতে। তারপর দমকলকে খবর দিলেন মই দড়ি নিয়ে আসার জন্যে। এসব করার পরেই তাঁর ফোন বেজে উঠল।

বোতাম টিপতেই রামচন্দ্র বণিকের গলা শুনলেন, 'এইমাত্র দুঃসংবাদ শুনলাম। সুন্দর কি ড্রাঙ্ক ছিল?

'আমি ওর সঙ্গে ছিলাম না।'

'আপনি কোথায়?'

'সোনাইঝোরার পাশে।'

লাইন কেটে দিল রামচন্দ্র, দুর্যোধন ওসিকে বললেন, 'আপনাদের এমপি সাহেব আসছেন।'

জেনারেটার জ্বালিয়ে বড় বড় সার্চ লাইট জ্বেলে নীচের জঙ্গল আলোকিত করা হল। দমকল তাদের মই নামাল নীচে। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র বণিক এসে গেছেন। যেসব গাড়ি ওপর নীচে যাতায়াত করছিল পুলিশ তাদের দাঁড়াতে দিচ্ছিল না।

দুর্যোধন মিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র বললেন, 'এখানেই যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা আপনারা জানলেন কী করে?'

দুর্যোধন ওসিকে দেখালেন, 'ওঁদের কাছে উড়ো ফোন এসেছিল, যে করেছিল সে ওর গাড়ির নাম্বার বলেছিল।'

হুঁ! কিন্তু ব্যাপারটা তো মিথ্যে হতে পারে। কোন গাড়ি পড়ে যাচ্ছে যখন, তখন কি কেউ তার নাম্বার প্লেটের দিকে তাকায়? রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন।

ওসি শুনছিলেন, বললেন, 'আমরা কোনও ফাঁক রাখতে চাই না, এখানে কোনও গাড়ি পড়ে গেছে কিনা তা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জানা যাবে।'

তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। দমকলের কর্মীরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছেন। চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। হঠাৎ রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরের সঙ্গে আপনার শেষ কখন কথা হয়েছিল?

'সকালের একটু বাদে।'

'অ্যাকসিডেন্টের খবর পাওয়ার পর ওকে ফোন করেছিলেন?'

রামচন্দ্রের দিকে তাকালেন দুর্যোধন, 'তুমি কি এই সময় রসিকতা করছ?'

'মানে?'

'এই এত উঁচু থেকে কোনও গাড়ি নীচে পড়ে গেলে তার চালক কি ফোন ধরার অবস্থায় থাকবে? থাকলে সে তো নিজেই ফোন করবে।'

ওসি বললেন, 'ঠিক, ঠিক।'

আধঘণ্টা পরে নীচ থেকে শোরগোল ভেসে এল, দমকলের লোকজন গাড়িটাকে দেখতে পেয়েছে। মোবাইলে তাদের নেতা জানিয়ে দিল, ওপর থেকে পড়ার জন্যে ভেঙে দুমড়ে গিয়েছিল গাড়িটা, তার ওপর আগুন ধরে যাওয়ার একটা পিণ্ড পাকিয়ে গিয়েছে। গাড়ির ভেতর যে কেউ থাকুক সে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কাল সকালের আগে জঙ্গলে ছড়িয়ে যাওয়া হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে না। গাড়ির পেছনের নাম্বারপ্লেট পুড়ে দুমড়ে গেলেও নাম্বার পড়া যাচ্ছে বলে ওটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওসি দমকলের কর্তাকে বললেন, 'নাম্বারটা বলতে বলুন।'

যে নাম্বার নীচ থেকে জানানো হল তাতে আর সন্দেহ রইল না। দুর্যোধন মিত্র এতক্ষণ পরে থরথর করে কেঁপে উঠলেন। তবু শেষ আশায় পকেট থেকে মোবাইল বের করে সুন্দরের নাম্বার টিপলেন। কোনও শব্দ হল না। তিন-তিনবার শব্দহীন থেকে গেল মোবাইল। দাঁড়াতে পারছিলেন না দুর্যোধন মিত্র, কোনওরকমে হেঁটে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন, গাড়ি চলে গেল দুর্ঘটনার জায়গা ছেড়ে।'

রামচন্দ্র কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর ওসিকে বললেন, 'যে লোকটা থানায় ইনফরমেশান দিয়েছিল তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবেন?'

'খুব ডিফিকাল্ট। শহরের সমস্ত ড্রাইভারকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব নয়। তবে একটা ক্লু আছে বলে—।' ওসি থামলেন।

'কি ক্লু? আমাকে বলতে পারেন।'

'যে লোকটা ফোন করেছিল সে একটু তোতলা।'

'বাঃ। তোতলা ড্রাইভার তো শহরে বেশি থাকার কথা নয়।'

'না স্যার। তবে ড্রাইভার যদি এই শহরের না হয় তাহলে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে।' ওসি চিন্তিত।

চেতনা ফিরে এল সুন্দরের। নদীর ধার দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর সে আর চলতে পারছিল না। মাথা ঘুরছিল, শরীর আর পারছিল না। একটা ঝোপের পাশে বালির ওপর শুয়ে পড়েছিল। পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। কতক্ষণ ওভাবে ছিল তার জানা নেই। চেতনা ফিরতেই সে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। সামনে জলের শব্দ, পেছনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এসব জায়গায় বন্যজন্তু থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর তখনই তার মোবাইলের কথা মনে এল। দ্রুত সেটা বের করে বোতাম টিপতে গিয়ে দেখল আলো জ্বলছে না। হিলটপের নাম্বার টিপলেও কোনও শব্দ হল না। তার কাছে এই একটাই রাস্তা ছিল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার, অন্তত আজ রাত্রে, কিন্তু সেটাও কাজে আসছে না। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ার সময় নিশ্চয়ই আঘাত পেয়েছে যন্ত্রটা, পেয়ে অকেজো হয়ে গিয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সে ছুড়ে ফেলল যন্ত্রটাকে। খানিকটা দূরে পাথরে ঠোক্কার খেয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল

সেটা।

কিছু করার নেই। তার পক্ষে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সে যে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ফিরল না, এনিয়ে দুর্যোধন মিত্র ভাবনাচিন্তা করেননি? ওঁর স্বভাব অনুযায়ী তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে অবাধ্যতার জন্যে প্রচুর কথা খরচ না করলে তো শান্তি হওয়ার কথা নয়।'

সুন্দর মাথা নাড়ল। উপায় যখন নেই তখন এখানেই রাত জেগে কাটিয়ে দিতে হবে। একটা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে। সে ওঠার চেষ্টা করতেই কানে শব্দটা বাজল। রিং হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক শুনতে পাচ্ছে। মোবাইলের রিং। এখানে কোনও মানুষ নেই তাহলে কার মোবাইল বাজছে। শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে পাথরের ওপর মোবাইলের আলো জ্বলতে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হল সে। এটা তার মোবাইল। ছুঁড়ে দিয়েছিল রেগে গিয়ে আর ধাক্কায় আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে যন্ত্রটা। সে ওটাকে তুলে নিয়ে কানে চেপে বলল, 'হ্যালো।'

'আমি লীলা বলছি। আমরা সবাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আঃ। এসব কথা কেন?'

'মামা বাবাকে বিড়লা হার্ট সেন্টারে আনামাত্র ওঁরা ওঁকে ভরতি করে নিয়েছেন, ব্লাড টেস্ট হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে অ্যাঞ্জিওগ্রাম হবে। ওরা বলল, আর দেরি করে আনলে হাতের বাইরে চলে যেতে পারত।'

'ও.কে. লীলা।'

'আপনি নিশ্চয়ই হিলটপে পৌঁছে গিয়েছেন?' লীলা জিজ্ঞসা করল।

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। কাল ফোন করব।' লাইন কেটে দিল সুন্দর।

এবার একটুও ইতস্তত না করে দুর্যোধন মিত্রের বোতাম টিপল সে।

গাড়ি তখন দুর্যোধন মিত্রের বিশাল প্রাসাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। সিটের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন তিনি। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা পাক খাচ্ছিল বুকের ভেতরে। এই সময় তার মোবাইল শব্দ করে উঠল, বেশ বিরক্ত হয়ে ওটা পকেট থেকে বের করে চোখের সামনে তুলতেই চমকে সোজা হয়ে বসলেন। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মোবাইল অন করে কথা বলতে গিয়ে কাশতে হল গলা পরিষ্কার করার জন্যে, 'সুন্দর?'

'হ্যাঁ।' সুন্দরের গলার স্বর স্পষ্ট।

'তুমি—তুমি কোথায়?'

'নদীর গায়ে। আমার গাড়িটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'ও মাই গড! ঠেলে ফেলা হয়েছিল মানে?'

'আমি ফিরে গেলে এটা নিয়ে কথা বলতে পারি। কিন্তু আমার পক্ষে আজ ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আহত।'

'ও.কে., ও.কে.। যেখান দিয়ে গাড়িটা পড়েছিল তার কতদূরে তুমি আছ?'

'অন্ধকারে আমি আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু কাছাকাছি নদীর ধারেই আছি।'

'তুমি ওখানেই থাকো। আমি তোমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।' ফোন বন্ধ করে ড্রাইভারকে দুর্যোধন বললেন, 'গাড়ি ঘোরাও। অ্যাকসিডেন্টের স্পটে নিয়ে চলো।'

তারপর মিস্টার ভার্গবকে ফোন করলেন, 'ওসি-র নাম্বার আমার কাছে নেই। ওঁকে ফোনে ধরুন। দমকলের লোকদের যেন ওসি বলেন আমি না যাওয়া পর্যন্ত কেউ স্পট থেকে চলে না যায়।'

'এখনই বলছি স্যার। আমি ভাবতেই পারছি না মিস্টার সুন্দর মিত্র—!'

'না না। সে বেঁচে আছে। তাড়াতাড়ি কাজটা করুন। ভার্গবকে থামিয়ে দিয়ে চটজলদি বললেন দুর্যোধন মিত্র।

শেষ পর্যন্ত দমকলকর্মীরা সুন্দরকে ওপরে তুলে আনতে সক্ষম হল। তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গাড়ি ছুটল সমতলের নার্সিংহোমের উদ্দেশ্যে। সুন্দরের অবস্থা তখন বেশ খারাপ। সারা শরীর রক্তাক্ত। যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। ওসি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছিলেন কিন্তু দুর্যোধন মিত্র আপত্তি করেছিলেন। প্রশ্ন করার অনেক সময় পাওয়া যাবে কিন্তু আগে ছেলেটার চিকিৎসা শুরু করা উচিত। মিস্টার ভার্গব সুন্দরের সঙ্গে গেলেন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন দুর্যোধন মিত্র। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ডাক্তারদের হাতে পৌঁছে যাবে সুন্দর। তিনি গেলে শুধু রাতজাগা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। বরং কাল সকালে নার্সিংহোমে পৌঁছে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। প্রয়োজন হলে সুন্দরকে কলকাতা বা দিল্লিতে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাড়িতে ফিরে এসে পোশাক বদলে একটা বড় হুইস্কিতে বরফ ঢেলে সুইমিং পুলের পাশে বসলেন দুর্যোধন। সুন্দরের গাড়ি ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল খাদে, কেউ ওকে খুন করতে চেয়েছিল। গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখে খুনি নিশ্চিত হয়েছে যে সুন্দর বেঁচে নেই। ওই রাস্তা থেকে পড়ে গিয়ে বেঁচে যাওয়া আদৌ স্বাভাবিক ঘটনা নয়। লাক। স্রেফ কপালের জোরে বেঁচে গেছে ছেলেটা।

কিন্তু ওকে কে খুন করবে? দীর্ঘকাল ও এখানে ছিল না। ফলে কারও সঙ্গে শত্রুতাও তৈরি হয়নি। ওকে সরিয়ে দিলে কার লাভ হবে? মাথামুন্ডু ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। হঠাৎ লীলার কথা মনে এল। লীলা তার হোটেলের একজন সামান্য কর্মচারী। হ্যাঁ, সে যথেষ্ট সুন্দরী, সুন্দর আকর্ষণ বোধ করতেই পারে। কিন্তু অসম স্ট্যাটাসের মেয়ের জন্যে পাগলামি বরদাস্ত করা যায় না। আর এই ব্যাপারটা আর কারও অপছন্দের হতেও পারে। লীলার প্রতি আসক্ত অন্য কেউ ক্ষিপ্ত হতে পারে? এই লীলার চাকরির জন্যে সুপারিশ করেছে রামচন্দ্র বণিক। রামচন্দ্র কি চাইবে সুন্দরের সঙ্গে লীলা জড়িয়ে যাক? কিন্তু যেই করুক নিজে করেনি। ভাড়াটে লোক দিয়ে করিয়েছে। এই শহরে ভাড়াটে খুনি পেতে অসুবিধে হয়নি। দুর্যোধন মিত্র ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে এলেন। লীলার কারণেই সুন্দরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। সমতলের নার্সিংহোমেও যে সেই চেষ্টা হবে না তা কে বলতে পারে। তিনি পকেট থেকে মোবাইল বের করে ভার্গবকে ধরলেন।

'কোথায় তোমরা?'

'এই মাত্র পৌঁছে গিয়েছি। ডাক্তাররা সুন্দরের দায়িত্ব নিয়েছেন।' ভার্গব বললেন।

'ওর কন্ডিশন ডিটরিয়ট করেনি তো?'

'না স্যার।'

'বেশ। আপনি এখনই জেলার এসপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওঁকে আমার পরিচয় দিয়ে বলুন সুন্দরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। ওকে যারা খাদে ফেলে দিয়েছে তারা নার্সিংহোমেও হামলা করতে পারে।' দুর্যোধন মিত্র নির্দেশ দিলেন।

লাইন কেটে দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি। একবার ভাবলেন দিল্লিতে ফোন করে ব্যাপারটা জানাবেন কিনা। এত বড় ঘটনা না জানালে কৃষ্ণা অপমানিত বোধ করতেই পারে। যদিও সুন্দর সম্পর্কে কৃষ্ণার কোনও আগ্রহ নেই। সৎছেলের ব্যাপারে কৃষ্ণা রীতিমতো উদাসীন, তবু—!

স্ত্রীর মোবাইল নাম্বারটা বের করতে যেতেই দুর্যোধনের হাতের যন্ত্র বেজে উঠল। তিনি জানান দিতে ওসি-র গলা শুনতে পেলেন, 'স্যার, আপনাকে বিরক্ত করছি।'

'বলুন।'

'একটু আগে পিলখানার পাশের রাস্তায় একটা ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। কেউ সরাসরি

গুলি করেছিল ওকে।' ওসি বললেন।

'তা আমি কি করতে পারি?'

'না না—! আমরা যাকে খুঁজব ভেবেছিলাম, একজন ড্রাইভার যে তোতলা, এই লোকটি ঠিক তাই। ওসি বললেন।

'মানে?' সোজা হয়ে বসলেন দুর্যোধন।

লোকটা সমতলের। দিন দশেক আগে এখানে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল। কথা বলতে গেলে একটু তোতলায়। ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে প্রমাণ লোপ করতে ওকে খুন করা হয়েছে। ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে বলে আপনাকে জানালাম।' ওসি বললেন, 'রাখছি।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন দুর্যোধন মিত্র। তাহলে এই শহরে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করার শক্তি এবং সামর্থ কারও কারও আছে। ব্যাপারটা তিনি ভাবতেই পারছেন না। যারা এটা করছে তারা তো পরোক্ষে তাকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এত সাহস হল কার। যার মুখ মনে হল সে আর যাই করুক সুন্দরকে খুন করার কথা ভাববে না। সুন্দর যখন ছোট তখন থেকে ওকে খুব পছন্দ করত রামবাবু। তাহলে কে এত সাহসী হল? দুর্যোধন মিত্র সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনা। পাহাড়ের রাস্তায় এরকম প্রায়ই ঘটে থাকে। বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা লাগায় ডানদিকের গাড়ি খাদে পড়ে গেছে বহুবার। দ্বিতীয় কোনও গাড়ি না থাকা সত্ত্বেও স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারায় গাড়ি খাদে পড়েছে। দুর্ঘটনার পর নিজে থানায় যেতে ভয় পেয়েছিল বলে ড্রাইভার ফোনে পুলিশকে গাড়ির নম্বরটা দিয়েছে। দুর্ঘটনা হলে এই অবধি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পুলিশ জানাচ্ছে সেই তোতলা ড্রাইভারকে একটু আগে খুন করা হয়েছে। এর পরে তো আর অ্যাকসিডেন্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লোকটাকে যে ব্যবহার করেছিল সে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি, আসল খুনি কি জেনে গিয়েছিল পুলিশ একজন তোতলা ড্রাইভারের খোঁজ করছে? কী করে জানল? সন্ধের পরে যে কথা হয়েছিল খাদের পাশে দাঁড়িয়ে তা জানতে পারল কী করে? অস্বস্তি বেড়ে গেল দুর্যোধন মিত্রের।

এই সময় মোবাইল বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে সেটা তুলতেই সোজা হয়ে বসলেন দুর্যোধন মিত্র। কৃষ্ণা ফোন করছেন।

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে তিনি কথা বললেন, 'হ্যালো।'

'গুড ইভনিং। কৃষ্ণার গলায় খুশি।

'গুড ইভনিং।'

'কোথায় আছ?'

'বাড়িতে। সুইমিংপুলের পাশে।'

'আই অ্যাম মিসিং ইউ।'

'আমিও।'

'তাহলে কালই চলে এসো।

'কাল?' মাথা নাড়লেন দুর্যোধন, 'কাল যাওয়া যাবে না।'

হাসলেন কৃষ্ণা। দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসির কী হল?'

তুমি নাকি আমাকে মিস করছ! অথচ তোমার কাছে ওই কাজগুলো আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান। যাক গে, আমি কিন্তু কালই চলে যেতে পারি।'

'সেকি! তোমার একজিবিশন?'

'দুদিন না থাকলে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ও।' চিন্তায় পড়লেন দুর্যোধন। চটজলদি বললেন, 'আমাকে কয়েকদিন, ধরো তিনদিন, খুব ছোটাছুটি করতে হবে। তুমি এলে সঙ্গ দিতে পারব না। তিন দিন পরে আমি নিজেই দিল্লিতে যাব

বলে ঠিক করেছি। তখন সাতদিন কমপ্লিট রেস্টে থাকব। নো কাজ।'

'বিশ্বাস করতে পারি?'

'সিওর।'

'আর কি খবর বলো?'

'ব্যস। চলছে।' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারল দুর্যোধন।

'তোমার ছেলে?'

থমকে গেলেন দুর্যোধন। এই প্রশ্ন কেন করছে কৃষ্ণা। ছেলের কথা কখনও জানতে চেয়েছে বলে মনে পড়ছে না।

'এমনি ভালো ছিল। তবে আজ সন্ধেবেলায় একটা ছোট অ্যাকসিডেন্ট করেছে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালালে মাঝে মাঝে এমন হয়!'

'স্পেশালি যদি কেউ ড্রাঙ্ক হয়ে ড্রাইভ করে।'

'না না, সুন্দর সেসময় ড্রিঙ্ক না করা অবস্থায় ছিল।'

'তুমি ভালো বুঝবে। এটা তোমার প্রবলেম। আচ্ছা, বাই—!'

আলো নিভে যাওয়া মোবাইলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থামলেন দুর্যোধন মিত্র। কৃষ্ণা মিথ্যে বলেনি। সত্যি তো এটা তাঁর প্রবলেম। আর এই প্রবলেমটা দিনকে দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে।

এক্স-রে রিপোর্ট দেখে নার্সিংহোমের ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেলেন। যে ছেলেটা গাড়িতে বসা অবস্থায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে খাদে গাড়িয়ে পড়তে পড়তে ছিটকে বেরিয়ে পাথরের খাঁজে আটকে গিয়েছিল তার শরীরের বিভিন্ন জায়গার চামড়া থেতলে এবং কেটে রক্ত বের হওয়া ছাড়া হাড়গোড় ভাঙেনি! বাঁ-হাতের কনুই-এর হাড়ে একটা চিড় দেখা গেছে বটে কিন্তু সেটা তেমন মারাত্মক নয়। মাথায় বেশ চোট পেয়েছিল কিন্তু স্ক্যান করে দেখা গেল ভেতরে রক্ত জমে যায়নি।

তবে গত রাতে তাকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসার সময় যে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছিল তা ঘুমের ওষুধ খেয়ে পরের দিন ঘুম ভাঙার পর আর বলছে না। চোখও ঘোলাটে। তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একটা দুটো শব্দে জানান দিচ্ছে। ডাক্তাররা আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নিলেন সুন্দরকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। এখন অর্থপেডিক সমস্যার বদলে নিউরোলজিক্যাল সমস্যাই প্রবল হয়ে উঠেছে। মিস্টার ভার্গবকে অভিমত জানিয়ে দেওয়া হল।

মিস্টার ভার্গব দুর্যোধন মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সব শুনে দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'আপনি ওকে কলকাতায় নয়, দিল্লিতে নিয়ে যান। ওকে আজই ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজিক্যাল মেডিসিনে ভরতি করে দিন। আমি চাই না আপনি হিলটপ ছেড়ে বেশিদিন বাইরে থাকুন। আপনি যদি কাল এখানে ফিরে আসেন তাহলে পরশু আমি দিল্লিতে যাব।'

'ও.কে. স্যার। কিন্তু মনিটারিং-এর জন্যে একজনকে তো দিল্লিতে থাকতে হবে। আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে কি?'

'আমাকে চিন্তা করতে দিন।' দুর্যোধন মিত্র লাইন কেটে দিলেন।

দুপুরের ফ্লাইটে মিস্টার ভার্গব স্ট্রেচারে শুইয়ে সুন্দরকে দিল্লিতে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার ওকে হাঁটাতে নিষেধ করেছেন, সুন্দরের কথা ইতিমধ্যে দুর্যোধন মিত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ায় ভরতি হওয়ামাত্র চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপার রিপোর্ট করল মিস্টার ভার্গব দুর্যোধন মিত্রকে। কথা হল, মিস্টার ভার্গব কাল দুপুরের ফ্লাইটে ফিরে যাবেন।

বিকেল ছ'টায় সব কর্তব্য শেষ করে মিস্টার ভার্গব সেন্টুর হোটেলে চেক ইন করলেন। হোটেলেটা এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরে না হওয়ায় ফিরতে সুবিধে হবে। চাবি নেওয়ার সময় লক্ষ

করলেন হোটেলের একজিবিশন হলে ছবির প্রদর্শনী চলছে। ঘরে গিয়ে স্নান করে পোশাক বদলে স্রেফ সময় কাটানোর জন্যে মিস্টার ভার্গব লিফটে চেপে নীচে নেমে এলেন। প্রদর্শনী কক্ষে গিয়ে দেখলেন ভালোই ভিড় হয়েছে। আধুনিক চিত্রকলা দেখার অভ্যেস তাঁর নেই। কিন্তু রঙের আধিক্য থাকাতে দেখতে ভালো লাগছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ চোখ পড়ল দুজন মহিলার ওপর। একজন অন্যজনকে ছবির বিষয় বোঝাচ্ছেন। যাঁকে বোঝানো হচ্ছিল তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মিস্টার ভার্গব বলল, 'গুড ইভনিং ম্যাডাম।'

কৃষ্ণা মুখ ফিরিয়ে মিস্টার ভার্গবকে দেখে বেশ অবাক হলেন, 'আপনি! আপনি দিল্লিতে এসেছেন জানতাম না তো!'

এক লহমায় মিস্টার ভার্গব বুঝতে পারলেন আলাপ করতে আসা ঠিক হয়নি। সুন্দর দুর্যোধন মিত্রের ছেলে, তাঁর স্ত্রী-র নয়। কোনওদিন আলোচনা হয়নি, প্রসঙ্গও ওঠেনি। কিন্তু নিজের বাড়ি থাকতে সুন্দরকে যখন হোটেলের ঘরে থাকতে হয় তখন কোথাও যে বিরোধ আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কৃষ্ণা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। মিস্টার ভার্গব ঠিক করলেন সত্যি কথাই বলবেন। সংক্ষেপে ঘটনাটা জানালেন তিনি।

'ওয়াজ হি ড্রাঙ্ক?' কৃষ্ণা নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'সম্ভবত না। আমি গন্ধ পাইনি। ডাক্তাররাও কিছু বলেননি।'

'দিল্লিতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত কখন হল?'

'আজ সকাল এগারোটায়। স্যার পরশু এখানে আসছেন, আমি কাল চলে যাব।'

'কেন?'

'আমার হিলটপে থাকাটা বেশি জরুরি। এখানে যোগাযোগ রাখা ছাড়া আমার তো কিছু করার নেই।' মিস্টার ভার্গব বললেন।

'ওয়েল মিস্টার ভার্গব, আমাকে যখন অফিসিয়ালি জানানো হয়নি ওকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে তখন আপনাকে অনুরোধ, আপনি ভুলে যান আমার সঙ্গে এই দেখা হওয়ার কথা।' হাসলেন কৃষ্ণা।

'মানে?' বেশ অবাক হলেন মিস্টার ভার্গব।

'আপনি আমাকে ওর দিল্লিতে নিয়ে আসার খবর দিয়েছেন একথা কাউকে বলবেন না। আপনার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। ও.কে.?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার ভার্গব। তাঁর মাথা কাজ করছিল না, কিন্তু অনুমান করলেন ম্যাডামের কথা অমান্য করলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবেন।

রাত ন'টায় ওসির ফোন পেলেন দুর্যোধন মিত্র, 'এই সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত স্যার। কিন্তু বাধ্য হয়ে—!'

'আপনার বক্তব্য বলুন। ভদ্রলোককে থামিয়ে দিলেন দুর্যোধন মিত্র।'

'যে লোকটাকে আজ গুলি করা হয়েছে সে যে তোতলা ছিল তা কয়েকজন ড্রাইভারের কাছ থেকে জানা গেছে। লোকটা একটা সুমো গাড়ি চালাত।'

'সুমোর মালিক কে?'

'সেটাই সমস্যা হয়েছে। গাড়িটার নাম্বার দার্জিলিং মোটর ভেইকিলসের। ওদের অফিস বন্ধ হয়ে গেলেও আমাদের এক সহকর্মী খোঁজ নিয়ে জেনেছেন ওই সুমোর মালিক একজন নেপালি। যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেখানে গিয়ে জানা গেছে ওই নামের কোনও লোকের অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ

একেবারে গোড়া থেকেই বেনামে গাড়িটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।' ওসি বললেন।

'স্ট্রেঞ্জ!' দুর্যোধন মিত্র চাপা গলায় বললেন।

'আর ওই গাড়িটাকে ব্যবহার করার পেছনে নিশ্চয়ই মতলব ছিল। গাড়ি ধরা পড়লেও মালিকের খোঁজ পাওয়া যাবে না। ড্রাইভার তোতলা এই তথ্যটা আমরা না পেলে হয়তো ওকে মেরে ফেলা হত না।' ওসি বললেন।

'গাড়িটাকে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা থানায় নিয়ে এসেছি।'

দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি একা কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমার ঘরে আর কেউ নেই।'

'ঠিক আছে। আপনি আপনার থানার লোকদের বলুন যে লোকটা বেনামে সুমো গাড়িটাকে খাটাত তার পরিচয় জানতে পেরেছেন। বলবেন, লোকটা দার্জিলিং-এ থাকে।'

'কিন্তু স্যার কথাটা বাইরে গেলে লোকটা সতর্ক হয়ে যাবে।'

'কোন লোকটা?'

'যার কথা আপনি বলছেন।'

'আমি কারও কথা বলছি না। কিন্তু কথাটা প্রচারিত হলে খুনি ভয় পাবে। ভয় পেয়ে কিছু করে ফেললে আপনি ক্লু পাবেন। আর হ্যাঁ দার্জিলিং-এ গাড়িটা কোন গ্যারাজে রাখা হত সেই খবর নিন। গ্যারাজের মালিকের সঙ্গে গাড়ির ব্যাপারে কে কথা বলতে যেত সেটা জানতে পারবেন।' দুর্যোধন মিত্র ফোন রাখলেন।

ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। বিড়বিড় করে বললেন দুর্যোধন মিত্র। ইদানীং সে রীতিমতো অবাধ্য হয়ে উঠলেও ওকে এভাবে মরতে দিতে তিনি রাজি নন। ওকে পুত্র হিসেবে অবশ্যই তিনি স্নেহ করেন নাহলে ওর কাজকর্ম তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু স্নেহের একটা সীমা তিনি রেখেছেন। সুন্দর এখনও সেই সীমা অতিক্রম করেনি।

তাছাড়া যে লোকটি সুন্দরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল তার লক্ষ তো তিনি। সুন্দরের মৃত্যু দিয়ে যে তাঁর ওপর আঘাত করতে চেয়েছে, সুন্দরকে বাঁচিয়ে তুললে সেই লোকটিকে নিজের জিভ গিলতে হবে। ওই লোকটির হদিস পাওয়ার জন্যে সুন্দরের বেঁচে থাকা দরকার।

ফোন বাজল। তাঁর ব্যক্তিগত নাম্বার বেশি মানুষ জানে না। মোবাইল তুলে দিল্লির নাম্বার দেখলেন তিনি। অচেনা। ফোনটা কৃষ্ণার হতে পারে। ইদানীং ওর শখ হয়েছে নতুন নতুন নাম্বার থেকে ফোন করা। অন্তত এক ডজন সেলফোন কিনে ফেলেছে কৃষ্ণা। ইচ্ছে করেই ফোনটা অন করলেন না দুর্যোধন। বেজে বেজে থেমে গেল। হঠাৎ মনে হল সুন্দর যেখানে আছে সেখান থেকে ফোনটা কেউ করেনি তো! তার পরেই মাথা নাড়লেন, নাহ্। ওরা তো ভার্গবকেই যা জানাবার তা জানাবে। তাঁর ব্যক্তিগত নাম্বার ওদের জানার কথা নয়।

আবার ফোন বাজল। সেলফোন তুলতেই কৃষ্ণার নাম্বার যা তাঁর পরিচিত তা দেখতে পেয়ে বোতাম টিপে হ্যালো বললেন।

'এই মাত্র তুমি ফোনটা ধরলে না কেন?' কৃষ্ণার গলায় উত্তাপ।

'মাই গড! ওটা তোমার ফোন ছিল? নাম্বারটা আগে কখনও দেখিনি—।'

'বাজে কথা বলো না। তোমার পার্সোনাল নাম্বার দিল্লিতে আমি ছাড়া আর কে জানবে? কেমন আছ?'

'আমি যেমন থাকি!'

'মানে।'

'চারপাশে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো সমস্যা, আমি সাঁতরাচ্ছি, তুমি?'

'আমি? ওহো, আজ একটা একজিবিশন থেকে ছবি কিনেছি? তুমি অম্বিকা গুপ্তার নাম শুনেছ তো?'

'না। কে ইনি?'

'ওঃ মাই গড। তুমি কোথায় আছ! অম্বিকা এখন ভারতবর্ষের ওয়ান অফ দ্য টপ ফিমেল পেইন্টার। ছবিটা দেখলে তুমি খুব খুশি হবে।' কৃষ্ণা বললেন।

'গিয়ে দেখব!'

'তুমি কবে আসছ?'

'পরশু।' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি চেক পাঠাব?'

'কী জন্যে?'

'তোমাকে ছবির দাম তো দিতে হবে।'

'টেন পার্সেন্ট ডাউন করেছি। বাকিটা পরের দিকে দিতে হবে। কত জানো?'

দুর্যোধন চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার মন যা পেলে খুশি হয় তার দাম তো টাকা দিয়ে হিসেব করা যাবে না।'

'আঃ। চুপ করো। এগারো লাখ বলেছিল অম্বিকা, আমি দশে রাজি করিয়েছি।'

'গুড। আমি দিল্লিতে পৌঁছেই চেক দিয়ে দেব।'

'তোমাকে কীরকম অন্যমনস্ক লাগছে! কী হয়েছে?' কৃষ্ণা জানতে চাইল।

'আজ সারাদিন ধরে প্রচুর কাজ করেছি, কেউ একথা বলেনি।'

'কী করে বলবে? দুর্যোধন মিত্রের চাটুকাররা প্রশংসা ছাড়া কিছু জানে না।' কৃষ্ণা খুব গাঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

এবার দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'ব্যাপারটা ভুল বলোনি। সুন্দরকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে। ওর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। রাস্তা থেকে ওর গাড়ি খাদে পড়ে যায় যেটা আমার কছে অবিশ্বাস্য। আট পেগ মদ গিলেও ওর মতো দক্ষ ড্রাইভার এই ভুল করতে পারে না।'

'ওহ্ গড। এখন কেমন আছে ও? তুমি বলেছিলে মাইনর অ্যাকসিডেন্ট!'

'ওকে রেসক্যু করে আনার পরেও সেন্স ছিল, কথাও বলছিল। তখন বুঝলাম আর একটা গাড়ি ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছে ওর গাড়িটাকে। তার জন্যে অ্যাকসিডেন্ট। অবশ্য অ্যাকসিডেন্ট না বলে খুন করার চেষ্টা বলাই উচিত। কিন্তু লোকে জানত অ্যাকসিডেন্ট। যে করিয়েছে সে ভাবতে পারেনি সুন্দর বেঁচে যাবে। পড়ে গিয়ে মরে গেলে অ্যাকসিডেন্ট ভাবা ছাড়া অন্য সন্দেহ করা যেত না।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

'কে খুন করতে চেয়েছিল?'

হাসলেন দুর্যোধন মিত্র প্রশ্নটা শুনে, 'যে খুন করাতে চেয়েছে, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

'এখন কেমন আছে সুন্দর।'

'ভালো নয়। হঠাৎ ওর অবস্থার অবনতি হয়। কথাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই ওকে দিল্লিতে পাঠিয়েছি। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। ভার্গব সঙ্গে গিয়েছে।'

'এত সব ঘটে গেল, ওকে দিল্লিতে আনা হল অথচ আমাকে তুমি অন্ধকারে রেখে দিলে? আমি কেউ নই?'

'না না ডার্লিং। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে মাথা কাজ করেনি। তা ছাড়া তুমি একা থাকো, সমস্যায় ফেলতে চাইনি। আর আমাদেরও তো কিছু করার নেই। যা করার তা ডাক্তাররাই করছেন। আমি ভার্গবকে বলেছি কাল ফিরে আসতে।'

একটু থেমে কৃষ্ণা বললেন, 'ভার্গবকে আজ আমি দেখেছি।'

'ও কোথায়?'

'হোটেলের একজিবিশন রুমে।'

'ওখানে কি করছিল সে?'

'বোধহয় পেইন্টিং দেখতে এসেছিল।'

'ও কিছু বলেনি তোমাকে।'

'আমাকে দূর থেকে দেখেই এমন ভাবে সরে গেল যে আমি কথা বলার সুযোই পাইনি। তুমি আসার আগে যদি কোনও প্রয়োজন হয়, প্লিজ জানিও। গুডনাইট।'

একটু ভাবলেন দুর্যোধন মিত্র। ভার্গবকে তিনি বলেননি কৃষ্ণাকে দেখলে কথা না বলে সরে যেতে হবে। কৃষ্ণার কথা তাঁর মাথায় না থাকায় ভার্গবকে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু লোকটা একজিবিশনে গেল কেন? পেইন্টিং দেখতে পছন্দ করে বলে তো তিনি শোনেননি। তা ছাড়া কৃষ্ণাকে সে দেখতে পেয়েছে একথা ভার্গব তাকে টেলিফোনে বলেনি। অদ্ভুত।

সকালে অফিসে যাওয়া মাত্র রিসেপশনিস্ট জানাল রামচন্দ্র বণিক দেখা করতে এসেছেন। টেলিফোন না করে দেখা করতে কেউ এলে বিরক্ত হন দুর্যোধন। কিন্তু আজ হলেন না। রামচন্দ্র ঘরে ঢুকলেন নক করে। হেসে বললেন, 'আমি জানি আমার উচিত ছিল টেলিফোন করে আসা। কিন্তু খবরটা পেয়ে—। বসতে পারি?'

'অবশ্যই। কী খবর?'

চেয়ারে বসে রামচন্দ্র বললেন, 'পুলিশ খুব বাড়াবাড়ি করছে। শহরের প্রায় সব ড্রাইভারকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জেরার সময় অত্যাচার করছে। আমরা চাই সুন্দরকে যদি খুন করার চেষ্টা হয় তাহলে খুনি শাস্তি পাক। একজন ড্রাইভারকে তো মৃত অবস্থায় পাওয়াও গেছে। সেই যে খুনি তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে অন্যান্যদের হ্যারাস করা হচ্ছে কেন?'

দুর্যোধন মিত্র তাকালেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি এই অঞ্চলের ক্ষমতাবান এমপি। ফোন তুলে নর্থ বেঙ্গলের আইজি কে বললে এক সেকেন্ডে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওসি ক্ষমা চাইতে ছুটে যাবে তোমার কাছে। তা না করে তুমি আমার কাছে এলে?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন প্রধানমন্ত্রী চান না কোনও মন্ত্রী বা এমপি প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করুক। আমি পুলিশকে ফোন করলেই মিডিয়া সেটা ফলাও করে প্রচার করবে। আপনি টিভি দ্যাখেন?'

'খুব কম।'

'কাল দেখেছেন?'

'না।'

'সুন্দরের অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে টিভির চ্যানেলগুলো হইচই আরম্ভ করেছে। দুর্ঘটনা নয়, খুন ক্যাপশন দিয়ে তারা অনুষ্ঠান চালাচ্ছে। ফলে প্রশাসন খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় আমি যদি ফোন করে বলি শহরের ড্রাইভারদের হ্যারাস করা চলবে না তাহলে ওদের ক্যাপশন হবে এমপি খুনিকে আড়াল করতে চাইছেন। কিন্তু এটা বললে সমস্ত ড্রাইভার ধর্মঘট শুরু করবে। কিন্তু আপনি যদি পুলিশকে বলেন তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে বাবা হয়ে ছেলের খুনিকে আড়াল করতে চাইছেন। ধর্মঘটও এড়ানো যাবে।'

'তুমি পুলিশকে ফোন করলে মিডিয়া জানবে কী করে?'

হাসল রামচন্দ্র, 'পুলিশই নিঃশব্দে জানিয়ে দেবে। ওরা তো আমাকে ফাঁসাতে চায়।'

'ঠিক আছে, ভেবে দেখি।'

'সুন্দর নাকি স্টেটমেন্ট দিয়েছে আর একটা গাড়ি এসে জেনেশুনে তার গাড়িতে এত জোরে ধাক্কা দেয় যে সে ব্যালেন্স রাখতে পারেনি। তার মানে এটা খুন। আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?'

'তোতলা ড্রাইভার বেঁচে থাকলে এতদিনে জানা যেত।' দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আপনার সাফল্যে অনেকেই ঈর্ষান্বিত। কিন্তু তাদের কারও সাহস হবে বলে মনে হয় না। আমি কাল থেকে অন্য কথা ভাবছি।'

'কী সেটা।'

'ওই সুমো গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা কি পুলিশ বের করেছে।'

'বেসরকারি ভাবে জানা গেছে দার্জিলিং-এর গাড়ি। মালিক একজন নেপালি।'

'লোকটার নাম কি? কোথায় থাকে?'

'যে নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল সেই নামের কেউ ওই ঠিকানায় থাকে না!'

'খুনি নিশ্চয়ই কথাটা জানত।'

'জানত বলেই গাড়িটা ব্যবহার করেছে।'

'কিন্তু লোকটা দার্জিলিং-এ থাকে, আমার মনের সন্দেহটা তীব্র হচ্ছে।'

দুর্যোধন তাকালেন রামচন্দ্রের দিকে।

'কিছু মনে করবেন না, এটা আমার নিছক অনুমান। সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু আইন বলছে অপরাধী ধরা পড়ার আগে কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। এই আমি, এমনকী আপনাকেও সন্দেহ করা উচিত।'

'যা বলতে চাইছ তা বলো।'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, হিলটপ হোটেলের রিসেপশনিস্ট লীলার সঙ্গে সুন্দরের একটা সুসম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল। এ নিয়ে হোটেলের কর্মচারীরা হাসাহাসি করত। সেই লীলা ছুটি নিয়ে গেল দার্জিলিঙে। বোধহয় গিয়ে বাবা-মাকে বলেছে সুন্দরের কথা, আপনার কথা। অমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা? সুন্দর তো তাঁদের কাছে আকাশের চাঁদ। সে আপনার একমাত্র পুত্র। আপনার পরে সে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হবে। আহ্লাদে ওরা আটখানা হবেই।' রামচন্দ্র বলল।

'এসবের সঙ্গে খুনের সম্পর্ক কোথায়।'

'আছে। খবরটা চাপা থাকেনি। তার ওপর সুন্দর ছুটে গিয়ে প্লেনের টিকিট কেটে লীলা এবং তার বাবাকে কলকাতায় পাঠিয়েছে চিকিৎসার জন্যে। আপনি ভেবে দেখুন, লীলার মতো সুন্দরী মেয়ের এই বয়স পর্যন্ত কোনও প্রেমিক ছিল না, একি হতে পারে? সুন্দরকে পেয়ে লীলা সেই প্রেমিককে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করেছে। দার্জিলিং-এর একটা সাদামাটা যুবকের পক্ষে সুন্দরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ানো অসম্ভব। আহত প্রেমিক অনেক সময় সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়। সে-ই ওই তোতলা লোকটাকে ভাড়া করেছিল বলে আমার ধারণা।'

'ছেলেটার নাম কী?'

'এখনও জানতে পারিনি। লোক লাগিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারব। লীলার মতো সুন্দরীর যে প্রেমিক ছিল তাকে তো দার্জিলিং-এর পাবলিকের চেনার কথা।'

'তাহলে তোমার মনে হয় এ ব্যাপারে লীলার কোনও ভূমিকা নেই?'

'না। সোনার ডিম দেয় যে হাঁস তাকে কেউ মেরে ফ্যালে না।' রামচন্দ্র বললেন, 'ওসিকে যদি একবার টেলিফোন করেন—।' ঠিক তখনই ইন্টারকমে শব্দ হল। রিসিভার তুলতে দুর্যোধন মিত্র শুনলেন, 'স্যার, লোকাল থানার ওসি কথা বলতে চাইছেন।'

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'দাও।'

লাইন অন হলে দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'গুডমর্নিং অফিসার।'

'গুডমর্নিং স্যার। কিন্তু আমার পক্ষে বোধহয় দিনটা ভালো যাবে না।'

'কেন?'

'যে তোতলা ড্রাইভারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল সে মরার আগের চব্বিশ ঘণ্টায় কার কার সঙ্গে দেখা করেছিল তার একটা লিস্ট বানাতে বলেছিলাম আমার এসআইকে।' ওসি বললেন।

'ইন্টারেস্টিং।'

'পাঁচজনের নাম পেয়েছি। দার্জিলিং-এর দুজন, এখানে তিনজন।' ওসি বললেন, ড্রাইভারটি সেই ঘটনার পর এখানে এসেই আবার ফিরে যায় দার্জিলিং-এ। সেখানে গিয়ে ওই দুজনের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু দুর্ঘটনার কথা জানায়নি। সে টাকা ধার চেয়েছিল। বলেছিল চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে অনেক টাকা পাবে, তখন শোধ করে দেবে। ওই দুজন টাকা ধার দিতে রাজি না হওয়ায় সে এখানে ফিরে আসে। তারপর তো খুনই হয়ে যায়।' ওসি বললেন।

'খুব ভালো প্রগ্রেস। কিন্তু অফিসার এসব তো আপনার সরকারি তদন্তের কথা। আপনি আমাকে জানাচ্ছেন কেন?' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'তার পেছনে কারণ আছে স্যার। ফোনে সব কথা বলতে চাই না। আজ কখন আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারি?'

'আমার সেক্রেটারি আপনাকে জানিয়ে দেবে। ওহো, একটা কথা, আপনি ঠগ বাছার জন্যে, গাঁ উজাড় নাই বা করলেন!'

'মানে?'

'এখানকার সব ড্রাইভারদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে আপনার জুনিয়াররা হ্যারাস করছে। আমার মনে হয় এটা করার কোনও যুক্তি নেই।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

'একটু আগে আমি অর্ডার দিয়েছি। আর কোনও ড্রাইভারকে ডাকা হবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার।' ফোন রেখে দিলেন দুর্যোধন মিত্র। তারপর রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পুলিশ আর ড্রাইভারদের ডাকবে না।'

'অনেক ধন্যবাদ।' রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, 'সুন্দরের চিকিৎসার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজি আছি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে হেলথ মিনিস্টারকে বলব যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে দেখার জন্যে।'

হাসলেন দুর্যোধন মিত্র, 'দরকার হলে নিশ্চয়ই বলব।'

রামচন্দ্র চলে যাওয়ার পর ঘণ্টাদুয়েক খুব ব্যস্ত ছিলেন দুর্যোধন মিত্র। সেক্রেটারি এসে নেটে আসা মেইলগুলো টেবিলের একপাশে দিলে তিনি বললেন, 'একটা কফি দিতে বলো। বেশ কড়া। ও হ্যাঁ, ওসি যদি ফোন করেন তাহলে বলবে লাঞ্চের পরে যেন আসেন।'

সেক্রেটারি ঘাড় নাড়ল কিন্তু ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

'কিছু বলবে?'

'স্যার। কলকাতা থেকে লীলা দুবার ফোন করেছিল।'

'লীলা? কে লীলা?'

'স্যার, লীলা হিলটপের রিসেপশনিস্ট।'

'ও, হ্যাঁ। কি বলতে চায় সে?'

'প্রথমবার ফোনে ছুটি এক্সটেনশন করতে অনুরোধ করেছিল। আমি বলেছি, ভার্গব সাহেব এখন দিল্লিতে, তিনি ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'আচ্ছা।'

'দ্বিতীয়বারে জুনিয়ার মিত্রের খোঁজ করছিল। বলল, ওঁর মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাধ্য হয়ে অফিসের নাম্বারে ফোন করেছে।'

'তুমি কী বললে?'

'বুঝতে পারলাম লীলা অ্যাকসিডেন্টের খবরটা জানে না। তাই বলেছি, উনি এখন দিল্লিতে আছেন, এখানে ফিরলে জানিয়ে দেব। শুনে খুব হতাশ হল বলে মনে হচ্ছিল।'

'ও.কে.। তুমি যেতে পারো।'

মেলগুলো দেখছিলেন। বেশিরভাগই ক্লায়েন্টদের চিঠি। কম্পুটার থেকে বের করা প্রিন্ট আউটগুলোর ওপর তিনি নোট দিলেন কোন অফিসার কোনটা দেখবেন। তারপরের ভার্গবের মেল দেখতে পেলেন। ভার্গব জানিয়েছেন, সুন্দরের অবস্থা আগের থেকে ভালো বলছেন ডাক্তার কিন্তু তার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তবু নির্দেশমতো আজ দুপুরেই তিনি ফিরে আসছেন। দ্বিতীয়ত, আজ একটু আগে ম্যাডাম মিত্র তাঁকে ফোন করেছিলেন। সুন্দরের দেখাশোনার দায়িত্ব তিনি নিতে চাইছেন। স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে এ ব্যাপারে ভার্গব ফোনে কথা বলতে চান।'

নিজের মোবাইলে ভার্গবের নাম্বার টিপলেন দুর্যোধন মিত্র, 'ইয়েস ভার্গব।'

'স্যার। আই অ্যাম রিয়েলি সরি। কাল আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। ইন ফ্যাক্ট আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল যেন মুখ বন্ধ রাখি। কাল হোটেলের একজিবিশন হলে ম্যাডাম মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনিই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যখন নিজে থেকেই সুন্দরের দায়িত্ব নিতে চাইলেন তখন আমার মনে হল ব্যাপারটা আপনাকে জানানো উচিত। আমি আবার বলছি, দুঃখিত।' ভার্গবের গলা কাঁপছিল।

'ওয়েল, ভার্গব, আমি আশা করব, ব্যাপারটা আর রিপিট করবে না।'

'না স্যার।'

'কিন্তু, না, তোমার আজ ফেরার দরকার নেই।'

'ফিরব না স্যার?'

'আজকে এবং আগামিকাল সকালে তুমিই ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলবে। আজ হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করবে যাতে সুন্দরের কেবিনের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকে। ডাক্তার, নার্স এবং তুমি ছাড়া আর কেউ যেন সুন্দরের কাছে যেতে না পারে। তোমাদের কাছে যেন স্পেশ্যাল আইডেন্টিটি কার্ড থাকে। সেই কার্ড ছাড়া ডাক্তার বা নার্সকে সিকিউরিটির লোক ভেতরে ঢুকতে দেবে না। কাল আমি দুপুরের ফ্লাইটে পৌঁছাব। এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করে ওই কার্ড আমাকে দিয়ে তুমি এখানকার ফ্লাইট ধরবে। আমার যাওয়া আর তোমার আসার মধ্যে যে কয়েকঘণ্টার ব্যবধান থাকছে তাতে এখানে কোনও বিপ্লব হবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ইয়েস স্যার। কিন্তু ম্যাডাম—!'

'তুমি দেখছি আজকাল একটু কম বুঝতে পারছ!'

'ও.কে. স্যার। আমি এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি।'

মোবাইল বন্ধ করে রুমালে মুখ মুছলেন দুর্যোধন মিত্র। সাদা রুমালটায় আবছা দাগ পড়ল।

লাঞ্চের পরে ওসি এলেন। ভদ্রলোক এখন ইউনিফর্মে আসেননি। দুর্যোধন মিত্র সাধারণ কিছু কথা বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্যাটা কী?'

তোতলা ড্রাইভার দুর্ঘটনা বা খুন করার পর এখানে তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা করে। প্রথমে দেখা করে এমপি সাহেবের ড্রাইভারের সঙ্গে।'

'কী কথা হয় ওদের?'

'আমরা এখনও জানি না। ইচ্ছে করেই ওকে জেরা করিনি। তবে এমপি সাহেবের গাড়ি ও চালাত না, তাঁর ফ্যামিলি যে গাড়ি ব্যবহার করত, সেটা চালাত, সেটাও বেশিদিন নয়। আপনি

শুনলে অবাক হবেন, ওই লোকটি আগে ম্যাডাম মিত্রের গাড়ি চালাত!'

'তাই?' সত্যি অবাক হলেন দুর্যোধন মিত্র, 'কী নাম?'

'পূরণবাহাদুর। ও সবাইকে বলত ম্যাডাম ওকে ছেলের মতো ভালোবাসেন।'

মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন দুর্যোধন। কৃষ্ণা বাড়িতে পাহাড়ি কর্মচারী রাখা পছন্দ করত। বলত, ওরা খুব কর্তব্যপরায়ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটা তো গাড়িটাকে খাদে ফেলে দেয়নি। তাহলে ওকে সন্দেহ করছেন কেন?'

'আমি একবারও বলিনি সন্দেহ করছি। বলেছি ওই লোকটার সঙ্গে তোতলা ড্রাইভার দেখা করেছিল। কি কথা হয়েছিল তা জেরা করলেই জানা যাবে। এই তোতলা ড্রাইভার দার্জিলিং থেকে ফিরে ও যেখানে ভাড়া থাকে তার বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বলে যে সে বাইরে চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছে তাই ভাড়াটে হয়ে থাকবে না। বাড়িওয়ালাকে জেরা করে ঠিক এই তথ্য জানতে পেরেছি। লোকটি বাড়িওয়ালাকে জানিয়েছিল পরের দিনই ঘর খালি করে দেবে। এর অর্থ হল সে এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল। অথচ ও দার্জিলিং-এ বলেছিল তিনদিনের মধ্যে প্রচুর টাকা পাবে। টাকা পেলে সে পরের দিনই চলে যাবে কেন? তিনদিন অন্তত এখানে থাকত। তাহলে কি সে টাকাটা পাবে না বলে জেনেছিল?' ওসি যেন নিজের মনেই কথা বলছিলেন।

'ওই পূরণবাহাদুরকে জেরা করছেন না কেন?'

'এবার করব।'

'আর হ্যাঁ, বলেছিলেন, এখানকার তিনজন লোকের সঙ্গে ও কথা বলেছিল। দুজনের ব্যাপারটা বললেন, তৃতীয়জন কে?' দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার সমস্যা তো তাঁকে নিয়েই।'

'কে তিনি?'

'এমপি সাহেব।'

'মাই গড। রামচন্দ্র লোকটাকে চিনত?'

'হ্যাঁ স্যার।' লোকটা এমপি সাহেবের কাছে গিয়েছিল। কী কথা হয়েছিল তা একমাত্র এমপি সাহেবই বলতে পারেন।'

'জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে।'

'স্যার, আমি ভয় পাচ্ছি। ওঁর যা ক্ষমতা, আমাকে বহুদূরের পাহাড়ি নির্জন গ্রামে বদলি করে দিতে পারেন।'

'আপনি রাজ্য পুলিশের অফিসার, উনি কেন্দ্রের এমপি। কেন ভয় পাচ্ছেন?'

'উনি আইজিকে বললেই কাজ হয়ে যাবে।'

'বেশ। সেক্ষেত্রে আপনি জেলার এসপি সাহেবকে সব জানান।'

সোজা হয়ে বসলেন ওসি। 'অসম্ভব।' উনি তৎক্ষণাৎ এমপি সাহেবকে সব জানিয়ে দেবেন। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

'বলুন কী সাহায্য করতে পারি?'

'আমাকে যদি এমন জায়গায় বদলি করা হয় যা প্রায় শাস্তি, আপনি আইজি সাহেবকে বলে সেটা বাতিল করে দেবেন। আইজি সাহেব আপনাকে খুব মান্য করেন।'

'এত ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানি না অফিসার, কিন্তু আমি চেষ্টা করব।'

আধঘণ্টা পরে দুর্যোধন মিত্র সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন রামচন্দ্রকে ফোনে ধরতে। এক মিনিট বাদে সেক্রেটারি জানাল, 'স্যার, উনি ঘণ্টাদেড়েক আগে নীচে নেমে গেছেন, এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লির ফ্লাইট ধরবেন। দিল্লিতে পৌঁছালে কি তাঁকে ফোনে ধরব?'

'না।'

আজ কাজ করতে ভালো লাগছিল না দুর্যোধন মিত্রের। বিকেলের মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলেন। চুপচাপ নিজের খাটে শুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র এমন কোনও কাজ করতে পারে না যাতে সুন্দরের ক্ষতি হবে। ওকে প্রায় শৈশব থেকে দেখে আসছে সে। কিন্তু তোতলা ড্রাইভার সুন্দরের গাড়িটাকে খাদে ফেলে দিয়ে কেন রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবে? রামচন্দ্র কি তাকে নির্দেশ দিয়েছিল কাজটা করার জন্যে। এয়ারপোর্ট থেকে সুন্দর যে ফিরছে এ খবর রামচন্দ্র কি ওকে দিয়েছিল? কাজটা হয়ে গেলে মোটা টাকা বকশিশ দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল রামচন্দ্র? কিন্তু কেন? এসব করে ওর কী লাভ হবে? এমপি হওয়ার পর রামচন্দ্র অনেকটা বদলে গিয়েছে। ইদানীং তাঁকেই ঈর্ষা করছে সে। তিনি যে তাকে নীচু থেকে ওপরে টেনে তুলেছেন তা ভুলতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁকে আহত করতে সুন্দরকে হত্যা করাতে কেন চাইবে রামচন্দ্র? তোতলা ড্রাইভার রামচন্দ্রের কাছে টাকা পায়নি। না পেয়ে ও পালাতে চেয়েছিল কেন? আর এই লোকটার সঙ্গে রামচন্দ্রর যোগাযোগ হল কী করে? এমপি হওয়ার পর তো সাধারণ একটা ড্রাইভারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক সে তৈরি করবে না। তখনই দুর্যোধন মিত্রের মনে পড়ল পূরণবাহাদুরের কথা। পূরণই কি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে? তাহলে পূরণ সমস্ত ঘটনা জানে, তিনি বেল টিপলেন।

দু-মিনিট পরে বেয়ারা এলে বললেন, কেয়ারটেকারকে ডেকে দিতে। হন্তদন্ত হয়ে কেয়ারটেকার ঘরের দরজায় পৌঁছালে তিনি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন, 'এই বাড়িতে পূরণবাহাদুর নামের কোনও ড্রাইভার ছিল?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আশ্চর্য। আমি তাকে চিনতে পারছি না কেন?'

'ও ম্যাডামের একটা গাড়ি চালাত।'

'অ। ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছ কেন?'

একটু চুপ করে থেকে কেয়ারটেকার বলল, 'ও খুব বাড়াবাড়ি করছিল। ম্যাডাম ওকে স্নেহ করত বলে কাউকে কেয়ার করত না। যেদিন ম্যাডাম চলে যান সেদিন আমাদের এক নতুন অল্পবয়সি মেডসার্ভেন্টের শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে। অন্য কর্মচারীদের শান্ত করতে বাধ্য হয়েই ওকে ছাড়াতে হয়েছে।'

'আচ্ছা।'

'ও কোথায় আছে জানো?'

'জানি স্যার। এমপি সাহেবের ফ্যামিলির গাড়ি চালাচ্ছে। এখান থেকে যাওয়ার পরে ও বোধহয় ম্যাডামকে ফোন করে নিজেকে নির্দোষ বলে। ম্যাডাম আমাকে ফোনে বলেন, ওঁকে না জানিয়ে ছাড়িয়ে দিয়ে ঠিক করেননি। এর বেশি কিছু বলেননি বলে আমি আপনাকে জানাতে চাইনি। অবশ্য তার পরেই ও এমপি সাহেবের বাড়িতে কাজ পেয়ে গিয়েছিল।'

'তারপর ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোথাও?

'হ্যাঁ স্যার। একদিন বাজারে দেখা হয়েছিল। ব্যঙ্গ করে বলেছিল, ম্যাডাম যতদিন থাকবেন ততদিন ওর কাজের অভাব হবে না। তেমন হলে ও দিল্লিতে গিয়েও কাজ করতে পারে।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

কেয়ারটেকার চলে গেলে ওসিকে ফোন করলেন দুর্যোধন মিত্র, 'জেরা হল?'

'না স্যার। এমপি সাহেব দিল্লি চলে গিয়েছেন। ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'পূরণবাহাদুর?'

'অদ্ভুত ব্যাপার স্যার। সে নাকি চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।'

'ওর বাড়ির লোকজন?'

'নেপালের কোনও একটা গ্রামে ওর বাড়ি। এখানে কেউ নেই।'

ফোন কেটে দিলেন দুর্যোধন মিত্র।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় হাসপাতালে পৌঁছালেন কৃষ্ণা মিত্র। সোজা রিসেপশনে গিয়ে জানতে চাইলেন সুন্দর মিত্রকে তিনি কোথায় গেলে দেখতে পাবেন। সে অ্যাকসিডেন্টে আহত হয়ে গতকাল ভরতি হয়েছে। রিসেপশনিস্ট কম্পুটারে দেখে নিয়ে বলল, 'উনি থার্ড ফ্লোরে, আট নম্বর কেবিনে আছেন। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি ওঁর কে হন?'

'ওয়েল, আমি ওর স্টেপ মাদার।'

'আপনার সঙ্গে যদি কার্ড থাকে তাহলে দেখতে যেতে পারেন।'

'কার্ড? কীসের কার্ড?' অবাক হলেন কৃষ্ণা মিত্র।

'আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে হাসপাতাল থেকে ইস্যু করা কার্ড ছাড়া কেউ ওই কেবিনে ঢুকতে পারবেন না। সিকিউরিটি অফিসাররা সেই কার্ড পরীক্ষা করবেন।'

'মাই গড। এসব কেন?'

'মাপ করবেন ম্যাডাম, এর বেশি কিছু আমি জানি না।'

'ওয়েল, আমাকে একটা কার্ড দিন।'

'ম্যাডাম, মাত্র তিনটে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। দুটো ডাক্তার আর নার্স আর একটা পেশেন্টের গার্জেনের জন্যে। আপনি সেই কার্ডটা ব্যবহার করতে পারেন।'

রিসেপশন থেকে সরে এসে ভার্গবকে ফোন করলেন কৃষ্ণা মিত্র। বেজে যাচ্ছে, যেন অনন্তকাল বেজে যাচ্ছে কিন্তু বদমায়েসটা ফোন অন করছে না। হঠাৎ মরিয়া হয়ে গেলেন কৃষ্ণা মিত্র। লিফটে চড়ে থার্ড ফ্লোরে উঠে এলেন তিনি। আট নম্বর কেবিনের দিকে এগোতেই একজন স্বাস্থ্যবান লোক হাত বাড়িয়ে তাঁকে থামাল, 'ম্যাডাম, কার্ড দেখলাইয়ে।'

'কার্ডের দরকার নেই। আমি পেশেন্টের মা।'

'সরি ম্যাডাম আপনি যেই হোন, কার্ড ছাড়া ভেতরে যেতে দিতে পারব না। আপনি কার্ড নিয়ে আসুন।'

'ভেতরে কেউ আছে? মানে, পেশেন্টের কাছে আর কেউ আছে?'

'সরি ম্যাডাম, এই ব্যাপারে আপনাকে কোনও খবর দিতে পারবই না।'

কৃষ্ণা মিত্র সোজা হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের ঘরে চলে এলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি, তা জানেন?'

'এক মিনিট' বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কাউকে ফোন করে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে মামলা করতে হলে মিস্টার দুর্যোধন মিত্রের বিরুদ্ধে করতে হবে। তিনি জানিয়েছেন, পেশেন্টকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। ওটা সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট নয়। পুলিশ এনকুয়ারি করছে। পেশেন্টের বাবা হিসেবে মিস্টার মিত্র ভয় পাচ্ছেন এই হাসপাতালেও ওর ওপর আক্রমণ হতে পারে। তাই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পেশেন্টকে রাখা হয়েছে।'

'খুন করার চেষ্টা হয়েছিল।'

'নর্থ বেঙ্গলের পুলিশও তাই জানিয়েছে।' অ্যাডমিনিস্ট্রেটার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেশেন্টের

যা বয়স তাতে মনে হচ্ছে আপনি ওর নিজের মা নন!'

'ওয়েল, আমি স্টেপ মাদার।'

'ম্যাডাম, আপনি মিস্টার মিত্রের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করুন।'

বাড়িতে ফিরে এসে কৃষ্ণা মিত্র আবার ভার্গবকে ফোন করলেন। এবারও রিং হয়ে গেল। লোকটা ইচ্ছে করেই তাঁর ফোন ধরছে না। সামনে কাজের মেয়েটি এসে দাঁড়াল, 'কফি দেব।'

'না তোমার মোবাইলটা দেখি।'

মেয়েটি অ্যাপ্রনের পকেট থেকে তার মোবাইল ফোন বের করে দিলে তিনি চোখ ছোট করলেন, এত সস্তার মোবাইল ফোন কখনও ছুঁয়ে দ্যাখেননি তিনি। ভার্গবের নাম্বার ডায়াল করে কানের থেকে একটু দূরে ধরলেন যাতে রিং শোনা যায়। রিং হচ্ছে। এবারও ফোনটা অন করল না ভার্গব। মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দিয়ে চিন্তায় পড়লেন কৃষ্ণা মিত্র। ভার্গবের হলটা কি? তাঁকে এড়াতে চেয়েছে বলে চেনা নাম্বারের ফোন সে ধরেনি। কিন্তু এই নাম্বারটা তো ওর অচেনা। এটা ধরল না কেন? অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি? তার পরেই খেয়াল হল। ভার্গবের তো আজই ফিরে যাওয়ার কথা। হয়তো ফ্লাইটে ছিল, এখন গাড়িতে আছে, শুনতে পাচ্ছে না।

আজ মেজাজ গরম ছিল। অপমানের জ্বালা ভুলতে পারছিলেন না মিসেস কৃষ্ণা মিত্র। টিভির সামনে বসে যখন তাঁর তিনটে হুইস্কি খাওয়া হয়ে গেল তখন মোবাইল বেজে উঠল। খপ করে সেটা ধরে নাম্বার না দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো?'

'ম্যাডাম। ভার্গব বলছি, আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন—!'

'এবং, আপনি সেটা ধরেননি। এত সাহস পান কী করে?'

'সরি ম্যাডাম! আমি তখন সুন্দরের কেবিনে ছিলাম। মোবাইল সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল, পেশেন্টের কেবিনে মোবাইল ব্যবহার করা নিষেধ।'

'আপনি সেখানে কতক্ষণ ছিলেন।'

'এইমাত্র বেরিয়েছি। ডাক্তার একটু দেরিতে কেবিনে এসেছিলেন।'

'মিস্টার ভার্গব, সুন্দরের কেবিনের সামনে সিকিউরিটি গার্ড রাখা কার আইডিয়া?'

'ম্যাডাম, আমার নয়।'

'আপনি কি জানেন আজ আমাকে ওই কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।'

'দুঃখিত ম্যাডাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারে নেই।' ফট করে লাইন কেটে দিলেন কৃষ্ণা মিত্র।

আরও এক পেগ খাওয়ার পর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দুর্যোধন মিত্রের নাম্বার টিপলেন তিনি। শুনলেন ফোনের সুইচ অফ করে রেখেছেন দুর্যোধন মিত্র। ল্যান্ড লাইনে ফোন করলেন বাধ্য হয়ে। একটু পরে গলা শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'সাহেবকে মোবাইল অন করতে বলো।' লোকটি বিব্রত গলায় বলল, 'ম্যাডাম সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

লীলার বাবার অপারেশন ভালোভাবে হয়েছিল। খুব দ্রুত সেরে উঠছেন ভদ্রলোক। কিন্তু হঠাৎই তাঁর বুকে নতুন করে ব্যথা শুরু হল। আবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করার পর দেখা গেল অবশিষ্ট টাকাতে চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়। এদিকে অফিস তাকে জানায়নি ছুটি বাড়ানো সম্ভব হবে কিনা। এত অল্পদিন চাকরি করলে অফিস থেকে লোন পাওয়াও সম্ভব নয়। লীলা কী করবে বুঝতে পারছিল না। ওর মা মনে করিয়ে দিলেন সুন্দরের কথা।

সুন্দর নিজে উদ্যোগী হয়েছিল তাদের কলকাতায় পাঠাতে, বাবার চিকিৎসা করাতে। এ কথা লীলার কাছে পরিষ্কার যে সুন্দর তার সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু জুনিয়ার মিত্র সম্পর্কে সে অনেক কথা শুনেছে হিলটপে চাকরিতে যোগ দিয়ে। লোকটা খুবই মদ্যপ, মেয়েঘটিত ব্যাপারে চূড়ান্ত বদনাম আছে। ওর বাবা দুর্যোধন মিত্রের কোনও গুণই সে পায়নি। লীলা শুনেছে, ছেলের হালচাল দেখে দুর্যোধন মিত্র তাঁর বিশাল সম্পত্তির কথা ভেবে আবার বিয়ে করেছেন। সেই মহিলা যদিও বয়সে ওঁর থেকে অনেক ছোট কিন্তু দারুণ সুন্দরী।

সুন্দর সম্পর্কে শোনা কথাগুলো লীলাকে ভীত করেছিল। হিলটপেই সুন্দর থাকে, হিলটপ দেখাশোনার দায়িত্ব মিস্টার ভার্গবের সঙ্গে সুন্দরের। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সুন্দর কখনই তাকে বিরক্ত বা বিব্রত করেনি। ও যে তাকে পছন্দ করে সেটা লীলা বুঝেছিল। সুন্দরী মেয়েদের দিকে ছেলেরা তাকায় এবং তাতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু ওই দেখা অবধি থেমেছিল সুন্দর। তার বাবার অসুখের খবর পেয়ে সে যে দার্জিলিং-এ ছুটে আসবে তা ভাবতে পারেনি লীলা। যে সুন্দর এল সে যেন আলাদা মানুষ। যেন তার অনেককালের বন্ধু। তার সঙ্গে ওই বদনামি সুন্দরের কোনও মিল নেই। তবু ওর সাহায্য নিতে অস্বস্তিতে ছিল লীলা। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে নিতে বাধ্য হয়েছিল, কলকাতায় আসার পরে ভয় হচ্ছিল লোকটা যদি চলে আসে। কিন্তু সুন্দর আসেনি। শুধু আসেনি নয়, কোনও যোগাযোগ রাখেনি। সে নিজেই ওকে ফোন করে পৌঁছ সংবাদ দিয়েছিল, সেটা পেয়েও কোনও উত্তেজনা দেখায়নি সুন্দর।

লীলার মামা বললেন, 'দ্যাখ, আমার তো টাকাপয়সা খুব বেশি নেই। ডাক্তাররা বলছে, আর একটা অপারেশন তোর বাবাকে করতে হবে। অপারেশন না করলে হয়তো বছরখানেক উনি এভাবেই বেঁচে থাকতে পারেন। কী করবি?'

লীলা দু-হাতে মুখ ঢাকল, 'ভাবতেই পারছি না মামা।'

লীলার মা বললেন, 'তুই সুন্দরকে বল। ওর কাছে এটা কোনও টাকাই নয়। তুই বল মাইনের টাকা থেকে ধীরে ধীরে শোধ করে দিবি।'

মামা বললেন, 'এ ছাড়া তো তোর বাবাকে বাঁচানোর কোনও পথ নেই। লজ্জা করিস না।'

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল লীলা। সুন্দরের নাম্বার ডায়াল করতেই কানে এল, 'সুইচ অফ।' গোটা দিনে বার পনেরো চেষ্টা করেও অন্য কোনও কথা সে শুনতে পেল না, রিং হওয়া তো দূরের কথা। শেষ পর্যন্ত হিলটপের রিসেপশনিস্ট লিলি কাপুরকে ওর ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন করল লীলা।

লিলি কাপুরের তখন ডিউটি ছিল না। হিলটপের স্টাফ কোয়ার্টার্সে বসে টিভি দেখছিল সে। এবার গলা শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'এই! কেমন আছ তুমি?'

'ভালো নয়। বাবা খুব অসুস্থ!'

'ওহো!'

'আমার ছুটির ব্যাপারটার কি হল, জানো?'

'না। মিস্টার ভার্গব আজ দিল্লি থেকে ফিরলে জানা যাবে।'

'তোমাদের সব খবর ভালো?'

'এমনিতে সব ঠিকই আছে শুধু—, তুমি কি সুন্দর মিত্রের কথা শোনোনি?'

'না। কী হয়েছে?'

'ওকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কেন?' অবাক হল লীলা।

'অ্যাকসিডেন্ট। আবার কেউ কেউ বলছে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল।'

'সেকী! কবে?' লীলা এবার উত্তেজিত।

দার্জিলিং-এ গিয়েছিল। বিকেলে ফিরে আসছিল। আসার পথে পাহাড়ের বাঁকে নাকি একটা সুমো গাড়ি ধাক্কা দেয়। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পর ওকে উদ্ধার করা হয়। তারপর নীচের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দিল্লিতে ট্রান্সফার করেছে। অত ওপর থেকে গাড়িসমেত পড়ে গিয়েও মির‍্যাকলি বেঁচে গেছে সুন্দর।'

'কবে হয়েছিল ঘটনাটা?' নিস্তেজ গলায় বলল লীলা।

যে তারিখটা বলল সেই তারিখেই সুন্দর তাদের এয়ারপোর্টে এসে সি-অফ করে ফিরে গিয়েছিল। তারপর তারা প্লেন ধরে কলকাতায় যায়।

'এখন কেমন আছে?'

'এখানে খবরটা আসেনি। মিস্টার ভার্গব এসে যদি বলেন তাহলে জানতে পারব?'

'কোন হাসপাতালে আছে সুন্দর?'

লিলি হাসপাতালের নাম বলে হাসল। তোমাকে যেন একটু বেশি ইন্টারেস্টড লাগছে?'

'না না। পরিচিত মানুষের অসুস্থতার কথা শুনলে মন খারাপ হয়। রাখছি।' লাইন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সে। হঠাৎ খেয়াল হতেই মোবাইল অন করে ডায়ালড নাম্বারগুলো দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে পেয়ে গেল সুন্দরের নাম্বারটা। সে ফোন করেছিল ঠিক সন্ধে পাঁচটা ছেচল্লিশে। তখন সূর্যের ডুবে যাওয়ার কথা। অথচ লিলি বলল বিকেলে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং সন্ধের পর সুন্দরকে উদ্ধার করা হয়। তাহলে সন্ধের সময় সুন্দর তার সঙ্গে কথা বলল কী করে? যে গাড়িতে বসা অবস্থায় ওপরের রাস্তা থেকে নীচে পড়ে গেল তার পক্ষে তো বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। লীলা স্পষ্ট মনে করতে পারল সুন্দরের শেষ কথাগুলো, 'আমি ঠিক আছি। কাল ফোন করব।' যদিও পরের দিন শুধু নয় এই কয়েকদিনেও সুন্দরের ফোন আসেনি, কিন্তু আহত মানুষও অমন স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য অনুমান করল লীলা। কিন্তু কিছুই যদি সুন্দরের না হয়ে থাকে তাহলে হাসপাতালের ডাক্তাররা কেন দিল্লিতে নিয়ে যেতে বলবে? দিল্লির ডাক্তাররা কেন ভরতি করে নেবে? ভার্গব সাহেবই বা কেন দিল্লিতে যাবেন? তার কেবলই মনে হতে লাগল এই সব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সুন্দরই দিতে পারে।

ক্রমশ মনে ভার জমল। যে মানুষটা তাদের এতটা উপকার করল সে এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। মানবিকতার কারণে তার উচিত সুন্দরকে দেখতে যাওয়া। যদিও সে ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না, তবু—!

সন্ধের পরে লীলা হিলটপে ফোন করে জানতে পারল মিস্টার ভার্গব ফিরে এসেছেন। সে কথা বলতে চাইলে অপারেটার মিস্টার ভার্গবের সেক্রেটারিকে লাইন দিল, ভদ্রমহিলা কথা বলে মিস্টার ভার্গবকে জানালে তিনি লাইনে এলেন, 'ইয়েস!'

'স্যার আমি লীলা, রিসেপশনিস্ট।'

'ওয়েল লীলা তোমার ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। যে ক'দিন চাকরি করেছ তার জন্যে যা ছুটি পাওনা হয় তার চেয়ে বেশি ছুটি তুমি নিয়ে ফেলছ, তোমাকে তিনদিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে। আর কিছু?' নির্লিপ্ত গলায় বললেন মিস্টার ভার্গব।

'আমি জানি স্যার। কিন্তু আমার বাবা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে আবার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এবার বড়সড় অপারেশন করতে হবে। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আপনি প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন, এই অবস্থায় আমি ওঁকে একা ফেলে যাই কী করে? আবার এই চাকরিটা আমার খুব দরকার। চাকরি চলে গেলে আমাদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে। স্যার, আমি এসব ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। কী যে করি!' লীলার গলা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্বাস ফেললেন মিস্টার ভার্গব, 'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাকে উইথ পে ছুটি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যে-কোনও চাকরির মিনিমাম কিছু নিয়ম আছে। আমি তোমার জন্যে একটা সুবিধে দিচ্ছি। তোমার বাবার অসুখের জন্যে আমরা দুই মাস অপেক্ষা করতে পারি। এই দুই মাসের মধ্যে তিনি সুস্থ হোন বা না হোন তুমি ষাট দিনের মাথায় জয়েন করবে। তার আগে যদি পারো নাথিং বেটার দ্যান দ্যাট। তবে যতদিন ছুটিতে থাকবে ততদিন তুমি উইদআউট পে হয়ে থাকবে। রাইট?' মিস্টার ভার্গব জিজ্ঞাসা করলেন।

'ঠিক আছে স্যার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

হঠাৎ মিস্টার ভার্গবের মনে কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি মারতে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কৌতূহলে রূপায়িত হল। লীলা বলল, 'স্যার, আমি রাখছি!'

'দাঁড়াও! তোমার ফোন নাম্বারটা আমাকে বলো!'

লীলা মোবাইল নাম্বার বলার পর লাইন কেটে দিলেন মিস্টার ভার্গব।

কাগজে লিখে নেওয়া দশটা সংখ্যার দিকে তাকালেন মিস্টার ভার্গব। লীলার ফোন এসেছিল অপারেটার—সেক্রেটারির টেবিল ঘুরে। ওদের দুজনের কেউ যে কান পেতে এতক্ষণ কথা শুনছিল না তার কোনও স্থিরতা নেই।

মিস্টার ভার্গব নিজের মোবাইলের নাম্বার টিপলেন। লীলার মোবাইল বাজছে। তারপরেই ওর গলা শোনা গেল। মিস্টার ভার্গব বললেন, 'লীলা, মিস্টার ভার্গব বলছি। জেনারেল লাইনে তোমার সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাইনি। তাই—।'

'হ্যাঁ, স্যার, বলুন।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো সুন্দর একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পড়েছিল।'

'আমি জানতাম না স্যার। আজই শুনলাম।'

'শুনে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হল?

'আমার খুব খারাপ লাগছে স্যার।'

'শুধু খারাপ লাগছে?'

একটু চুপ করে থেকে লীলা বলল, 'আমার পক্ষে এর বেশি বলা সম্ভব নয়।'

'হুম'।

'উনি এখন কেমন আছেন স্যার?'

'আই ডোন্ট নো। ডাক্তাররা স্পষ্ট বলছে না। আচ্ছা, আমরা জেনেছি ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিং-এ গিয়েছিল। পুলিশ তোমার সঙ্গে কথা বলতে সেখানে যায় কিন্তু তোমাদের বাড়ি তালাবন্ধ ছিল। লোক্যাল পিপল বলেছে তোমরা চিকিৎসার জন্যে কলকাতা গিয়েছ। যাকগে, তুমি সুন্দরকে শেষ দেখেছ কোথায়?'

'স্যার, উনি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে এসেছিলেন।'

'তোমরা প্লেনে গিয়েছিলে কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, স্যার। উনিই জোর করে টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। বাবার শরীরের অবস্থা দেখে ওঁর মনে হয়েছিল ট্রেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।' লীলা বলল।

'তুমি কি ওকে দার্জিলিং-এ যেতে বলেছিলে?'

'না স্যার, আমি ভাবতেই পারিনি উনি দার্জিলিং-এ আসবেন।'

'তুমি কি এখান থেকে যাওয়ার আগে ওকে দার্জিলিং-এ যাচ্ছ বলে গিয়েছিলে?'

'না স্যার। হিলটপে চাকরির সময় আমি কখনও ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি।'

'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য লীলা? যার সঙ্গে তুমি কখনও কথা বলোনি, যার স্ট্যাটাসের সঙ্গে তোমার কোনও তুলনাই চলে না, সে শুধু তোমার বাবা অসুস্থ শুনে এতটা পথ একা ড্রাইভ করে

চলে গেল? শুধু গেল না, তোমাদের প্লেনের টিকিট কেটে কলকাতায় পাঠাল? কেউ বিশ্বাস করবে?'

'স্যার আমিও ভাবতে পারিনি।'

'এয়ারপোর্টে ওর সঙ্গে কেউ ছিল?'

'না স্যার। ওহো! মনে পড়েছে। আমরা যখন এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলাম তখন আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি তখন আপনাকে প্লেনে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাই, আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ। পড়ছে। দার্জিলিং-এ সুন্দর কোথায় ছিল? তোমাদের বাড়িতে?'

'না স্যার। উনি সকালে ঝড়ের মতো আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।'

'আচ্ছা লীলা, সুন্দর কি তোমাকে কিছু বলেছিল? কোনও আশংকার কথা। কেউ তাকে ফলো করছে কিনা—এইসব?'

'না স্যার। লীলা বলল, ওঁকে খুব স্বাভাবিক দেখেছিলাম।'

'লীলা তোমার কি মনে হয়, কেন সে আচমকা তোমাদের সাহায্য করল?'

'এটা ওর মহানুভবতা বলে মনে হয়েছে।'

'ও কি তোমাকে কোনও অ্যাপ্রোচ করেছে? আই মিন, আবেগের কথা—।'

'না স্যার।'

'তোমার সঙ্গে ওর শেষ কথা তাহলে এয়ারপোর্টেই হয়?

'না স্যার। আমার সঙ্গে টেলিফোনেও কথা বলেছিলেন।'

'টেলিফোনে? কখন? প্লেনে তো ফোন ব্যবহার করতে দেয় না।'

'আমরা কলকাতায় পৌঁছাবার পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

'মাই গড! সেটা কখন?' মিস্টার ভার্গব সোজা হয়ে বসলেন।

'সন্ধের একটু পরে। সময়টা পাঁচটা ছেচল্লিশ।'

'ইম্পসিবল। তার আগেই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে।' মিস্টার ভার্গব বললেন, 'একটা মানুষ ওপরের রাস্তা থেকে গাড়িতে বসা অবস্থায় নীচের খাদে পড়ে গেলে বেঁচে থাকার কথা ভাবাই যায় না। যদি বা বাঁচে তাহলে তার জ্ঞান থাকবে না, হাড়গোড় ভেঙে যাবে। সে তোমার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলবে কী করে?'

'স্যার! উনি কথা বলেছিলে। মোবাইলটা অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল। তারপর ওঁর গলা শুনতে পেয়ে আমি পৌঁছ সংবাদ দিয়েছিলাম। ওঁর গলার স্বর শুনে আমি প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, 'আমি ঠিক আছি। কাল ফোন করব। তখন একবারও মনে হয়নি উনি ভয়ঙ্কর আহত।'

'তুমি সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার মোবাইলে ওঁর ওই সময়ের নাম্বার স্টোর করা আছে।'

'ও.কে.! থ্যাঙ্ক ইউ লীলা। আমি প্রার্থনা করছি যাতে তোমার বাবা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। দরকার হলে আবার যোগাযোগ করব।'

'একটা কথা বলব স্যার?'

'ইয়েস।'

'আমি কি অফিস থেকে লোন পেতে পারি? বাবার অপারেশনের জন্যে—।'

'আমি কাল তোমাকে জানাব। বাই।'

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা হসপিট্যালে চলে এসেছিলেন দুর্যোধন মিত্র। প্লেন থেকে নেমে বাইরে বেরুতেই ভার্গবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দ্রুত কিছু বলে, স্পেশ্যাল ভিজিটিং কার্ডটা দিয়ে ভার্গব ছুটেছিল তার ফ্লাইট ধরতে।

ছেলের বিছানার পাশে বসে নিজেকে নিরাসক্ত রাখার চেষ্টা করলেন দুর্যোধন মিত্র। মুখ ব্যান্ডেজে মোড়া। দুটো হাতেও ব্যান্ডেজ। নাকের অক্সিজেনের নল আপাতত খোলা কিন্তু স্যালাইন চলছে। চোখেও ব্যান্ডেজ। বাকি শরীরটা কম্বলে ঢাকা।

নার্স পাশে এসে বললেন, 'আপনার ছেলে?'

মৃদু মাথা দোলালেন দুর্যোধন মিত্র।

'অদ্ভুত ফাইটিং স্পিরিট। অন্য কোনও ছেলে হলে দিল্লিতে নিয়ে আসা যেত কিনা সন্দেহ। কাল রাত থেকে চমৎকার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। জ্ঞান আসছে, চলে যাচ্ছে। ডাক্তার আশা করছেন আজ থেকে স্টেডি হবেন।' নার্স বললেন।

'কথা বলেছে?'

'বোঝা যায়নি। মে বি আমি বাংলা ভাষা জানি না বলে বুঝতে পারিনি। মনে হয় কাল আমরা ওকে বুঝতে পারব।'

'ওর চোখে ব্যান্ডেজ কেন?'

'হেমারেজ হয়েছিল। কিন্তু ওগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে।' নার্স সরে গেল সামনে থেকে। দুর্যোধন মিত্র দেখলেন ঘরের লাগোয়া টয়লেট-বাথরুম আছে। এই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সিকিউরিটির মুখোমুখি হতে হবে। আজ তাঁকেও ওরা আটকেছিল। কার্ড দেখার পর আইডেন্টিটি কার্ড দেখে নামের সঙ্গে ছবি মিলিয়ে নিয়েছিল। তারপর ওদের কাছে যে ভিজিটার লিস্ট আছে তার সঙ্গে আবার চেক করার পর ভেতরে আসতে দিয়েছিল সর্বাঙ্গ সার্চ করার পরে। হসপিট্যাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ভার্গব এই ব্যবস্থা করে গেছে। খুশি হয়েছেন দুর্যোধন মিত্র। ভার্গবের ওপর আস্থা বেড়ে গেল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে টয়লেটে গেলেন দুর্যোধন মিত্র। ওপাশে একটা দরজা। আর সেই দরজাটা বন্ধ। বন্ধ করা হয়েছে ওধার থেকে। অর্থাৎ ওধার থেকে দরজা খুলে যে কেউ এই টয়লেটে ঢুকতে পারে। অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। ভার্গবের এটা দেখা উচিত ছিল। দরজাটা এধার থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তিনি বেডের কাছে চলে আসতেই দেখলেন নার্স সুন্দরের টেম্পারেচার দেখছেন। দেখা হয়ে গেলে ভদ্রমহিলা যখন নোট করছেন তখন সমস্যাটা ওঁকে বললেন দুর্যোধন মিত্র।

নার্স বেশ অবাক হয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর বললেন, 'ওটা জমাদারের যাওয়া আসার পথ! রোজ দুবেলা পরিষ্কার করে যায়। এদিক দিয়ে বন্ধ থাকলে জমাদার আসবে কী করে?'

'একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাইরে সিকিউরিটি থাকলেও এই ঘরে লোক ঢুকতে পারে যার হাতে আমার ছেলের পরিণতি খারাপ হবেই।'

'আমি ভাবিনি স্যার। দাঁড়ান।' পকেট থেকে একটা ওয়াকিটকি বের করে কাউকে নার্স অনুরোধ করলেন আসার জন্যে। আর তখনই সুন্দর একটা কাতর শব্দ উচ্চারণ করল যার কোনও অর্থ নেই। দুর্যোধন কাছে এগিয়ে গেলেন, 'ইয়েস সুন্দর, আমি এখানে। তোমার পাশে। এভরিথিং উইল বি অলরাইট।'

আবার ঘুমে তলিয়ে গেল সুন্দর। হসপিট্যালের কেয়ারটেকার এসেছেন, বাইরের সিকিউরিটি জানাতে ওঁরা বাইরে এলেন। দুর্যোধন মিত্র সমস্যার কথা জানাতে লোকটি বললেন, 'ওই দরজায় তালাচাবি দেওয়া আছে। যে কেউ ঢুকতে পারবে না।'

'যারা ঢুকতে চায় তাদের কাছে কোনও তালাচাবি বাধা হতে পারে না। আপনারা যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে কিছু ঘটে গেলে—' শেষ করলেন না দুর্যোধন মিত্র।

আধঘন্টার মধ্যে দরজার এদিকেও খিল, ছিটাকানি লাগিয়ে দেওয়া হলে স্বস্তি পেলেন দুর্যোধন। জমাদার এসে নক করলে তার পরিচয় জেনে নার্স দরজাটা খুলে দেবেন। সিকিউরিটির একজন

তখন সেখানে থাকবে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন দুর্যোধন মিত্র। ভদ্রলোক বেশ আশাবাদী। বললেন, 'মাথায় চোট তেমন লাগেনি বলেই মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে যাবেন উনি। তবে তিনটি অপারেশন করতে হবে। পাঁজরার হাড় ভেঙেছে। দুটো পায়েই কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হয়েছে। আপনি একবার অফিসকে কন্টাক্ট করবেন। পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

দুর্যোধন হসপিট্যালের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাকে। ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে পেশেন্টের স্পেশ্যাল কেয়ার নিতে। পেশেন্ট যে বিশাল শিল্পপতির একমাত্র সন্তান তা তাঁরা জানেন। সুন্দরের ব্যাপারে তিনি দুবেলা খোঁজ নিচ্ছেন।

হি ইজ অল মোস্ট আউট অব ডেঞ্জার। একটা ছোট সমস্যা আছে। সেটা পুলিশকে নিয়ে। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আসা পেশেন্টের কথা পুলিশকে জানানো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। তাই জানানো হয়েছিল। দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছিল সেখানকার পুলিশ তদন্ত করছে জানার পর এঁদের আর কৌতূহল ছিল না। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে ফোন করে ভেরিফাই করার পর ওরা চুপ করে থাকত। সমস্যা তৈরি হল মিস্টার ভার্গব যখন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করলেন। স্পেশ্যাল কার্ড ছাড়া কাউকে পেশেন্টের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না মানে পেশেন্ট পার্টি ভয় পাচ্ছে পেশেন্টের ওপর অ্যাটাক হতে পারে। যেহেতু দিল্লিতে পেশেন্ট রয়েছে তাই পুলিশ এ ব্যাপারটা নিয়ে বিশদে কথা বলতে চাইছে।'

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমার কথা বলতে আপত্তি নেই।'

'আপনি কোথায় উঠেছেন?'

হোটেলের নাম বললেন দুর্যোধন মিত্র। বললেন, 'আজকের সন্ধে আমি হোটেলেই থাকব। ফোন করতে বলবেন প্লিজ।'

সন্ধে সোওয়া সাতটায় রিসেপশন থেকে জানাল একজন পুলিশ ইনস্পেকটার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। পাঠিয়ে দিতে বললেন দুর্যোধন মিত্র।

ইনস্পেকটার মধ্যবয়স্ক। সামনে বসে ধানাই পানাই না করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে সুন্দরের গাড়ির খাদে পড়ে যাওয়া দুর্ঘটনা নয়?'

'হ্যাঁ। আমরা লোকাল থানায় সেই রকম ডায়েরি করেছি।'

'আপনার মনে হচ্ছে দিল্লির হাসপাতালেও সে নিরাপদ নয়?'

'এটা খুব স্বাভাবিক।'

'কেন?'

যারা ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিল তারা চাইবে না ও মুখ খুলুক। কথা বলতে পারলে পুলিশ হয়তো খুনির কথা জানতে পারবে।'

'কিন্তু স্যার আপনারা যে শহরে থাকেন সেটা একটা সাধারণ ছোট পাহাড়ি শহর। সেখানে যারা খুন করতে চেষ্টা করেছিল তারা দিল্লিতে কী করে সক্রিয় হবে। সেই ক্ষমতা কী করে পাবে?' ইনস্পেকটার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি নিশ্চয়ই এই প্রবাদটা শুনেছেন, পঙ্গুও প্রাণের দায়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া খুনিদের যে দিল্লিতে যোগাযোগ নেই তা তো আমি জানি না। হয়তো খুব শক্তিশালী আন্ডারওয়ার্ল্ডের দল ওদের সঙ্গে আছে।'

'আই সি।' একটু ভাবলেন ইনস্পেকটার, 'আপনার কী কোনও ধারণা আছে, ওকে খুন করে খুনিদের কি লাভ হবে?'

'স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে যারা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে খুন করতে চেয়েছিল তারা টাকা নিয়েছিল।

এ ছাড়া কোনও স্বার্থ নেই।'

'তার মানে কেউ ওদের পাঠিয়েছিল?'

শ্যাই। তবে ওদের নয়, একজনই গিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। সে·মারা গিয়েছে।'

ভাবে?

গকে মেরে ফেলা হয়েছে?'

র খুনি ধরা পড়েছে?'

যতদূর জানি, না।'

'আপনি কাকে কাকে সন্দেহ করেন?'

হেসে ফেললেন দুর্যোধন মিত্র, 'আপনারাই তো বলেন, কেউ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, তাহলে সব সন্দেহ করতে হয়।'

'তবু কোনও ব্যক্তিবিশেষকে?'

'নাঃ। মাথা নাড়লেন দুর্যোধন মিত্র।'

'আপনার সন্তান কি এই একটি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার অবর্তমানে সুন্দরই সমস্ত অধিকার পাবে?'

'যদি সে ঠিক পথে চলে—।'

'বেঠিক পথে চলার কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'এটা একেবারেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন অফিসার।'

'সরি। আপনার বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক কেমন?'

'আমি তো কোনও বিরোধের কথা শুনিনি।'

'মিস্টার মিত্র, আমরা জেনেছি আপনার স্ত্রী এখন দিল্লিতে আছেন। এখানে ওঁর স্থায়ী থাকার জায়গা আছে। সেখানে না থেকে আপনি দিল্লিতে এলে হোটেলে ওঠেন কেন?' ইনস্পেকটার জিজ্ঞাসা করলেন।

'যদিও এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, তবু—। ইনস্পেকটার, আমাদের দেশে ছেলেরা স্ত্রী-র বাপের বাড়িতে গেলে তিনরাত্রের বেশি বাস করে না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে যত স্বাচ্ছন্দ থাক, থাকতে গেলে অস্বস্তি হবেই।' হাসলেন দুর্যোধন মিত্র।

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ইনস্পেকটার 'আমরা জেনেছি আমাদের ফিনান্স মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনাদের ওখানকার এমপি দিল্লিতে বেশ পরিচিত। কিন্তু ছেলের নিরাপত্তার ব্যাপারে এঁদের সাহায্য আপনি নেননি। সাধারণত এরকম হয় না। বিশেষ কারণ আছে কি?'

'অন্যকে বিরক্ত না করে যতটা পারি নিশ্চয়ই চেষ্টা করি—!' উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন মিত্র। ইনস্পেকটার যাওয়ার আগে নিজের কার্ড দিয়ে বলে গেলেন যদি কোনও কিছু জানাবার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁকে যেন দুর্যোধন মিত্র জানান।

রাত সাড়ে ন'টায় দুর্যোধন মিত্র পরিপাটি সেজে নীচে নামলেন। ঘরে বসে না থেকে রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে পার্টিতে পৌঁছাতেই হই হই করে এগিয়ে এল মিস্টার বিজয় কাপুর। ভারতবর্ষের অন্যতম সিমেন্ট কোম্পানির মালিক কাপুরের সাথে চমৎকার ব্যবসার সম্পর্ক দুর্যোধন মিত্রের। কাপুর বললেন, 'মিস্টার মিত্র, আপনি দিল্লিতে এসেছেন অথচ আমি জানিই না। কী আশ্চর্য ব্যাপার, কবে এসেছেন?'

আজই। কেমন আছেন?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছায় খারাপ সময় এখনও আসেনি। যাচ্ছেন কোথায়?'

'তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই।'

'দেন, আমার সঙ্গে চলুন।' হাত ধরলেন কাপুর।

'কোথায়?'

'আমার বন্ধু মিস্টার বনসল একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার জন্যে খুব সিলেকটেড কয়েকজনকে ডেকে পার্টি দিচ্ছেন। আপনিও চলুন।'

'সেকী? ভদ্রলোককে আমি চিনি না। আপনি কী করে আশা করছেন একেবারে অনাহূত হয়ে আমি ওই পার্টিতে যাব।' দুর্যোধন মিত্র মাথা নাড়লেন।

মিস্টার কাপুর মোবাইলে কারও সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদিন থাকবেন দিল্লিতে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ছেলে খুব অসুস্থ। ওর এখানে চিকিৎসা চলছে। ও সামান্য সুস্থ হলেই চলে যেতে হবে। আপনি জানেন, ওখানে কাজের চাপ কত?'

'সে তো জানি। রাজধানী ছেড়ে রাজা বেশিদিন বাইরে থাকতে পারে না।'

কাপুরের কথা শেষ হওয়ামাত্র সুবেশ এক প্রবীণ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'ওয়েল কাপুর।'

'বনসল, ইনি মিস্টার মিত্র। নর্থবেঙ্গলে বিশাল ব্যবসা এঁর। আমার অনেকদিনের পরিচিত। আজ এখানে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আমি অনুরোধ করেছিলাম তোমার পার্টিতে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু উনি অনাহূত হয়ে যেতে চাইছেন না।' কথাগুলো বলে হাসলেন বিজয় কাপুর।

মিস্টার বনসল করমর্দন করলেন দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে 'মিস্টার মিত্র। কাপুর আর আমি আলাদা নই। ওর বলা মানে আমার বলা, তবু আমি ইনভাইট করলে যদি আপনি পায়ের ধুলো দেন তাহলে খুশি হব।'

'থ্যাঙ্কস। আজ থাক।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি নর্থবেঙ্গলের বিজনেশ টাইকুন মিস্টার দুর্যোধন মিত্র নন তো? যদি তাই হন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় আছে।'

'মানে।' অবাক হয়ে গেলেন দুর্যোধন মিত্র।

কাপুর বললেন, 'তোমার অনুমান ঠিক বনসল, উনিই দুর্যোধন মিত্র।'

'ওঃ মাই গড। আপনার স্ত্রী কৃষ্ণা আমার স্ত্রী-র বান্ধবী।'

'আচ্ছা!' দুর্যোধন অস্বস্তিতে পড়লেন।

'ইনফ্যাক্ট কৃষ্ণার আজ পার্টিতে আসার কথা ছিল। কিন্তু দুপুরে উনি আমার স্ত্রীকে ফোন করে জানান যে হঠাৎ খুব মাথা ধরেছে। মাঝে মাঝে ওঁর নাকি মাইগ্রেনের অ্যাটাক হয়। ওটা হলে তো আসা সম্ভব নয়।' বনসল বললেন।

কাপুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস মিত্র এখন কেমন আছেন?'

'আমি কাল ওঁদের বাড়িতে যাব। আজ এত ব্যস্ত ছিলাম—।'

'ওঁর ছেলের ট্রিটমেন্ট চলছে এখানে, সেকারণে খুব ব্যস্ত। কাপুর বনসলকে জানালেন। বনসল জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছে?'

'একটু বেটার।'

'তাহলে চলুন দশমিনিট থেকে নাহয় চলে আসবেন।' বনসল এমন গলায় অনুরোধ করলেন যে না বলা আর সম্ভব হল না দুর্যোধন মিত্রের পক্ষেও।

ওঁরা হোটেলের সুদৃশ্য যে ঘরে ঢুকলেন সেখানে মৃদুস্বরে বাজনা বাজছে, বেশ কিছু নারীপুরুষ পানীয় গ্লাস হাতে নিয়ে কথা বলছেন। বনসলের ইশারায় ওয়েটার স্কচ দিয়ে গেল দুর্যোধন মিত্র এবং কাপুরকে।

কাপুর বললেন, 'এঁরা সবাই বিখ্যাত শিল্পপতি। দুজন এমপি-কেও দেখছি। ওপাশের সোফায় বসে গল্প করছেন শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।'

দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'দিল্লিতে এটাই সুবিধে। পার্টিতে গেলে অনেককেই মিট করা যায়।'

কাপুর হাসলেন, 'মাসে দুবার দিল্লিতে আসুন, তাতে বিজনেস বাড়বে।'

এই সময় বনসল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মহিলা একটু স্বাস্থ্যবতী, মুখটি খুব মিষ্টি। বললেন, 'কৃষ্ণাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আপনাদের বিয়ের সময় আমি বিদেশে ছিলাম বলে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আমার নাম দিব্যা।'

'খুব ভালো লাগল আলাপ করে। প্রথম গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাস নিলেনও দুর্যোধন মিত্র। বনসল ও কাপুর তখন অন্য এক অতিথিকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে গেছেন। দিব্যা বললেন, 'আপনি দিল্লিতে এলে হোটেলে ওঠেন, কৃষ্ণাদের বাড়িতে জাস্ট বেড়াতে যান, কৃষ্ণার মুখে শুনেছি।'

'ঠিক শুনেছেন।'

'আজ কৃষ্ণা কেন এল না বুঝতে পারছি না। গতকালও ওর সঙ্গে একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল। আপনাদের ওখানকার এক এমপিকে নিয়ে এসেছিল।'

'মিস্টার রামচন্দ্র বণিক।' হাসলেন দুর্যোধন মিত্র।

'হ্যাঁ, বেশ ভালো মানুষ। তখনও কৃষ্ণা বেশ গম্ভীর ছিল কিন্তু বলেনি ওর মাইগ্রেনের পেইন শুরু হয়েছে।'

'আমি আপনার কথা ওঁকে বলব।'

মিসেস দিব্যা বনসলকে চলে যেতে হল অতিথিদের আপ্যায়ন করতে। দুর্যোধন মিত্র দেখলেন কাপুর বা বনসল কাছাকাছি নেই। গ্লাস নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন তিনি। রেস্টুরেন্টে ঢুকে সামান্য ডিনার শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে আসতেই দেখলেন টেলিফোনের মেসেজ। লাইট জ্বলছে। বোতাম টিপতেই শুনতে পেলেন, 'দিস ইজ ভার্গব স্যার। পুলিশ লীলার কলকাতার হোয়ার অ্যাবাউটস জানতে চাইছে। ওকে প্রশ্ন করবে সুন্দরের ব্যাপারে। কী করব?'

মেসজে ডিলিট করে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসলেন। না ভার্গবের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, যতক্ষণ তিনি কথা না বলবেন ততক্ষণ ভার্গব পুলিশকে কিছু জানাবে না। কিন্তু লীলার কলকাতার ফোন নাম্বার বা ঠিকানা ভার্গব পেল কি করে? মেয়েটা কি হিলটপের অফিসে যোগাযোগ করেছিল?

দশ মিনিট পরে নিজের মোবাইলে তিনি কৃষ্ণা মিত্রের নাম্বারগুলোয় চাপ দিলেন। শুনলেন, 'দি এয়ারটেল নাম্বার ইউ আর ট্রাইং টু রিচ ইজ সুইচড্ অফ।'

বাধ্য হয়ে ওদের ল্যান্ড লাইন নাম্বারে ফোন করলেন তিনি। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন কৃষ্ণা। মাথায় যন্ত্রণা হলে যে ওষুধ খেতে হয় তাতে ঘুম আসাই স্বাভাবিক। ওঁর ফোনে যদি মিস কল অ্যালার্ম না থাকে তাই—! রিং হচ্ছিল। একটি অবাঙালি মহিলা কণ্ঠ হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

'কৃষ্ণা আছে?'

'মেমসাব বাড়িতে নেই। কে বলছেন?'

লাইন কেটে দিলেন দুর্যোধন মিত্র। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, তিনি দিল্লিতে এলে এই হোটেলে যে ওঠেন তা কৃষ্ণা জানেন। জানে বলেই কি বনসলের পার্টিতে এলেন না। মাথা ধরাটা স্রেফ বাহানা। নইলে এই রাত্রে মোবাইল সুইচ অফ করে কেন বাড়ির বাইরে থাকবেন।

অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল এই ভেবে যে কৃষ্ণা এখানে রামচন্দ্র বণিকের সঙ্গে ঘুরছেন। ওদের মধ্যে এতটা সদ্ভাব কবে থেকে হল?

*

সকাল সাড়ে ন'টায় সুন্দরের কাছে গেলেন দুর্যোধন মিত্র। তাঁকে দেখে নিয়মমতো পরীক্ষা করে সিকিউরিটির একজন বলল, 'স্যার, দুজন লোক পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওদের কাছে স্পেশ্যাল কার্ড ছিল না বলে আমরা ঢুকতে দিইনি।'

'সেকী! ওরা এই অবধি এল কী করে? রিসেপশন বাধা দেয়নি?'

'স্যার, আমরা খবর নিয়েছি। ওরা অন্য পেশেন্টের কাছে যাবে বলে ভিজিটার্স কার্ড দেখিয়ে ওপরে উঠেছিল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, অনেক ধন্যবাদ।'

ভেতরে ঢুকতেই নার্স এগিয়ে এলেন,'গুড মর্নিং, মিস্টার মিত্র।'

'গুড মর্নিং।'

'আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আপনার ছেলের সেন্স ফিরে আসছে, আজ একটা শব্দ কয়েকবার বলেছে ও।'

'কী শব্দ? বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, ইটস এ নেম।' ও কয়েকবার 'লীলা' নামটা উচ্চারণ করেছে।'

চমকে উঠলেন দুর্যোধন মিত্র। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে এত শব্দ এত নাম থাকা সত্ত্বেও তার মনে লীলা নামটা কেন আসবে? ভালো করে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। সুন্দরের দার্জিলিং-এ ছুটে গিয়ে লীলাদের কলকাতায় পাঠানোর ব্যাপারটা একটা তাৎক্ষণিক আবেগের প্রকাশ মাত্র। মেয়েটার সঙ্গে হিলটপে থাকার সময় কথা বলা দূরের কথা, পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। মেয়েটা কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই বোধহয় ওই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোনও রকম প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগই হয়নি।

তাহলে সুন্দর কেন লীলার নামটা ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করছে?

নার্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার, লীলা কে? আপনার পরিচিত?'

না বলতে গিয়েও পারলেন না দুর্যোধন মিত্র। মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, পরিচিত।

'তাঁকে এখানে নিয়ে আসা যাবে?' নার্স জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন?' চমকে উঠলেন দুর্যোধন মিত্র।

'ডাক্তার আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবেন।' নার্স জানালেন।

আধঘণ্টা পরে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দুর্যোধন মিত্র জানলেন, সুন্দরের শরীর চমৎকার সাড়া দিচ্ছে ওষুধে। কিন্তু তার মাথা তেমন চোট না পাওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক হতে পারছে না। মাথা ঠিক হয়ে গেলে অপারেশনের কথা ভাবা হবে।

'ওর মাথার স্ক্যানিং রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি?'

'খুব মাইনর। তার জন্যে ওষুধই যথেষ্ট।' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু কাল থেকে পেশেন্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করছে। হয়তো ওই নামটাই তার মনে পড়ছে। আজ বিকেলের মধ্যেই ওর সেন্স পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই লীলা নামের মেয়েটি কোথায় থাকেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'যতদূর জানি এখন কলকাতায় আছে।'

'তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি দিল্লিতে আসবেন?'

'যতদূর জানি বাবার চিকিৎসার জন্যে ওরা কলকাতায় গিয়েছে।' দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'তা ছাড়া—!'

তিনি বাক্য শেষ করলেন না শুনে ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

একটু অস্বস্তি নিয়েই দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'মেয়েটি আমার হোটেলের একজন সামান্য রিসেপশনিস্ট। আমাদের সঙ্গে ওর দূরত্বটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ছেলে ঘোরের মধ্যে ওর নাম উচ্চারণ করছে এখবর চাউর হলে আমাদের ওখানে আলোচনার বিষয় হবে।'

ডাক্তার একটু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট হয়েছিল। আর সেটা তো একদিনে হয় না। আপনারা সতর্ক করেননি কেন?'

'ডক্টর! ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে তা একদিনে হয়েছে। মেয়েটির কলকাতায় যাওয়ার দিন। তার আগে ওদের আলাপ ছিল না।'

'সেকী?'

'আমিও একই রকম অবাক হচ্ছি।'

'কিন্তু, আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু বলছি, মহিলাকে পেশেন্টের স্বার্থে আমাদের দরকার। ওকে যত তাড়াতাড়ি পারেন এখানে নিয়ে আসুন।'

ঘণ্টাখানেক নিজের সঙ্গে তর্ক করলেন যুর্যোধন মিত্র। লীলাকে দিল্লিতে আসার প্রস্তাব দেওয়া মানে সে ধরে নেবে তাকে মিত্র পরিবার স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক। এটা কখনই সম্ভব নয়। গোলাপের বাগানে একটা ঘেঁটুফুলের চারা পুঁতে দিলে তা থেকে ঘেঁটু ফুলই হবে, গোলাপ জন্মাবে না। কিন্তু ডাক্তারের কথাও ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। সুন্দর যে অবস্থায় এখন আছে তা বেশিদিন চললে তার শরীর সুস্থ হয়তো হবে কিন্তু মনের জড়তা যদি না চলে যায় তাহলে অথর্ব হয়ে থাকতে হবে ওকে। এই সমস্যাটার সমাধান যদি লীলা এলে সম্ভব হয়—!

শেষ পর্যন্ত ভার্গবকে ফোন করলেন দুর্যোধন মিত্র।

লীলার টেলিফোন নাম্বারের বোতাম টিপতেই ওটা বাজল এবং ওর গলা শোনা গেল। ভার্গব বললেন, 'লীলা, দিস ইজ ভার্গব।'

'ইয়েস স্যার।' ফোনটা লীলা কল্পনা করেনি।

'তোমার বাবার অবস্থা কিরকম।'

'ভালো নয় স্যার। ডাক্তাররা প্রেশার দিচ্ছেন আর একটা মেজর অপারেশনের জন্যে। প্রায় চার লক্ষ টাকার ধাক্কা। তার ওপর অন্যান্য খরচ আছে। আমি কী করব বুঝতে পারছি না স্যার।' লীলার গলা খুব করুণ শোনাল।

'এত আপসেট হয়ে পড়ছ কেন? তোমার বাবার আর হসপিট্যালের নামটা আমাকে বলো।' লীলা জানাল।

'আজ একটু পরে আমাদের অফিস হাসপাতালের সঙ্গে কন্টাক্ট করছে। তোমার বাবার অপারেশনের যাবতীয় খরচ অফিস বহন করবে।'

'স্যার।' আনন্দে চিৎকার করে উঠল লীলা।

'ইয়েস। আমাদের কলকাতার অফিসের মিস্টার সেন দেখাশোনা করবেন।'

'কী বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব—!'

'কৃতজ্ঞতা আমাকে কেন জানাচ্ছ? আমার এত ক্ষমতা নেই! ইউ মাস্ট বি গ্রেটফুল টু মিস্টার দুর্যোধন মিত্র। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য তার বদলে তিনি তোমার কাছে একটা সাহায্য চাইছেন। ভার্গব বললেন।

'আমার কাছ থেকে?' অবাক হল লীলা।

'হ্যাঁ। তুমি জানো সুন্দর খুব অসুস্থ। দিল্লিতে তার চিকিৎসার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে। মাঝে মাঝে যখন জ্ঞান আসছে তখন সে কার নাম বলছে, জানো?'

'কার নাম?'

'তোমার। ডাক্তার চাইছেন, এই সময় তুমি যদি ওর বিছানার পাশে থাকো, ওর সঙ্গে কথা বলো, তাহলে দ্রুত উন্নতি হবে সুন্দরের।'

'আমি? আমি কী করে যাব?'

'যাবে। কারণ কলকাতায় তোমার বাবার চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছি আমরা। ওখানে তোমার কিছু করার নেই।' ভার্গব বললেন।

'কিন্তু স্যার—!'

'মিস্টার মিত্র তোমার বাবার জন্যে এতটা করছেন আর তুমি তাঁর ছেলের জন্যে এটুকু করতে পারবে না। ভেবে নাও, তুমি একজন নার্স, পেশেন্টকে সুস্থ করার জন্যে দিল্লিতে যাচ্ছ। পেশেন্ট সুস্থ হলেই ফিরে আসবে। লীলা, প্লিজ, না বলো না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'তাহলে মিস্টার সেন তোমাকে টিকিট পৌঁছে দেবেন। আজই দিল্লিতে পৌঁছে দেখবে ড্রাইভার তোমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তোমাকে হসপিট্যালে পৌঁছে দেবে। তুমি সোজা ডক্টর সানতানির সঙ্গে দেখা করবে। বাই।'

ডক্টর সানতানি প্রবীন মানুষ। তাঁর সামনে লীলা গিয়ে বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনও মানুষ যখন ঘোরের মধ্যে একজন মহিলার নাম উচ্চারণ করে তখন সে তাকে খুব কাছের মানুষ বলে ভাবে। আপনার সঙ্গে সুন্দর মিত্রের সম্পর্ক নিশ্চয়ই খুব গভীর হয়ে ছিল।'

'না স্যার। আমরা মাত্র একদিন কথা বলেছিলাম।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার দিক থেকে ওঁর সম্পর্কে কোনও ইমোশন্যাল অনুভূতি আছে কি?'

সোজা হয়ে বসল লীলা। তারপর বলল, 'ওঁর ব্যবহার, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। হি ইজ, একদম আলাদা মানুষ।'

'ও.কে.! সেক্ষেত্রে যদি আপনাকে একটু অভিনয় করতে হয় তাহলে প্লিজ করবেন। সুন্দর আপনার কাছে সান্ত্বনা, সমবেদনা, প্রেরণা চাইবে। সেটুকু দেবেন।'

লীলার স্পেশ্যাল কার্ড করিয়ে রেখেছিলেন দুর্যোধন মিত্র। অতএব সিকিউরিটির বেড়া ডিঙিয়ে কেবিনে ঢুকতে অসুবিধে হল না। সুন্দরকে দেখে অবাক হয়ে গেল লীলা। গোটামুখে কালো দাঁড়ি, চোখ বন্ধ। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। নার্স বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনাকে এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকতে হবে। পাশের অ্যান্টি রুমে ডিভান রয়েছে। ওখানে বিশ্রাম নিতে পারেন। আপনার খাবার এখানেই এনে দেওয়া হবে।

'কেন?'

'ফর সিকিউরিটি রিজন।'

'মানে?'

'যারা পেশেন্টকে খুন করতে চেয়েছিল তারা এখানেও আসতে পারে ভেবে কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। আপনি পাশের ঘরে গিয়ে চেঞ্জ করে নিন।'

মানুষটা শুয়ে আছে প্রায় মৃতদেহের মতো। রাত তখন দুটো। পাশের ঘরের ডিভানে শুয়েছিল লীলা, গোঙানির আওয়াজ কানে আসতেই উঠে বসল। এ-ঘরে এসে দেখল কোণের চেয়ারে নার্স বসে ঢুলছে। আওয়াজটা বের হচ্ছে সুন্দরের মুখ থেকে। আচমকা থেমে গেল সেটা। আর সে স্পষ্ট শুনতে পেল, 'লীলা-লী-।'

সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল, একটি অর্ধমৃত মানুষের শরীর থেকে তার নাম বেরিয়ে এল! এই অবস্থাতেও সুন্দর তার নাম কী করে উচ্চারণ করছে? সে এগিয়ে গেল, সুন্দরের মুখের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে নীচু স্বরে বলল, 'আমি এই তো আমি', সুন্দরের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে আবার। চেতনা লোপ পেয়ে গেছে।

আরও কয়েকবার ডাকল লীলা। ওপাশ থেকে নার্সের গলা ভেসে এল, 'এখন উনি শুনতে পাবেন না। যান শুনে পড়ুন।'

সন্ধের মুখে দুর্যোধন মিত্র টেলিফোন করলেন স্ত্রীকে। ফোনটা এবার কৃষ্ণাই ধরলেন। গলার স্বর শুনে হাসলেন, 'শেষ পর্যন্ত তোমার সময় হল?'

'হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত ছিলাম। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা কমেছে।'

'মাইগ্রেন? জানলে কী করে?'

'তোমার বান্ধবী বললেন, এত যন্ত্রণা যে শয্যাশায়ী ছিলে। তার নেমন্তন্ন রাখতে পারোনি। এখন কেমন আছ?'

'ভালো।' কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলের খবর কী?'

'চিকিৎসা চলছে।'

'তা তো জানি।'

'সে তো জানবেই।'

'তোমার কথার মধ্যে অন্যরকম সুর পাচ্ছি!'

'সেটা তোমার কান শুনছে।'

'তোমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই।'

'কৃষ্ণা, কথা এমন ধারালো যে বলতে বলতে কখন কাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে কেউ জানে না। না বলাই বোধহয় ভালো।'

'এসব বাজে কথা। তুমি কি এখন আসবে?'

'না। আমি খুব টায়ার্ড।'

'তাহলে আমি যাচ্ছি।'

'এসো। একা আসবে?'

'মানে?'

'শুনলাম দিল্লিতেও তুমি সঙ্গী পেয়ে গেছ।'

'তুমি আমাকে অপমান করতে পারো না।'

'ও.কে.। এসো।' টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন দুর্যোধন মিত্র।

কৃষ্ণা এলেন একঘণ্টা পরে। এখন রাত আটটা। দুর্যোধন দেখলেন কৃষ্ণা সেজে এসেছেন। শাড়ি না, স্কার্ট পরেছেন, গলার অনেকটাই উন্মুক্ত। হোটেলের ঘরে বসে বললেন, 'তুমি কি এটা ঠিক করলে?'

'কোনটা?'

'একটা পাতি রিসেপশনিস্ট মেয়েকে সুন্দরের কেবিনে ঢুকিয়ে দিলে কারণ সে ঘোরের মধ্যে তার নাম আওড়াচ্ছিল! ছিঃ—!'

'মেয়েটি ওখানে একা নেই কৃষ্ণা, নার্সও রয়েছে।'

'সো হোয়াট?' কৃষ্ণা বললেন, 'কেন ওকে আনতে হল? আমাকে অবিশ্বাস করে ওখানে ঢুকতে দাওনি, ওকে কী করে দিলে?'

'ডাক্তারের পরামর্শে।' মাথা নাড়লেন দুর্যোধন মিত্র, 'বলো, কি বলতে এসেছ?'

'তোমার সম্পত্তির মোট পরিমাণ কত।'

'জানি না।'

'হতেই পারে না।'

'কেন জানতে চাইছ?'

'আমি তোমার সঙ্গে কোনও বিরোধ চাই না। তোমার স্থাবর সম্পত্তির ওপর আমার কোনও লোভ নেই। শুধু অস্থাবর সম্পত্তির ঠিক অর্ধেক তুমি আমার নামে ট্রান্সফার করে দাও, আমি তোমাকে মুক্তি দেব।' কৃষ্ণা বললেন।

'যদি মুক্তি না চাই?'

'আমি আর পারছি না।' কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন, 'তোমায় অসহ্য লাগছে।'

'ও। তাহলে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে হবে।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'সুন্দর লীলাদের এয়ারপোর্টে ছেড়ে যখন ফিরছিল তখন একটা সুমোগাড়ি তার গাড়িকে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেয়। যাদের এই পরিকল্পনা ছিল তারা ভেবেছিল ওখান থেকে পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না। কিন্তু যখন জানা গেল সুন্দর মরেনি তখন সেই সুমোগাড়ির ড্রাইভারকে মেরে ফেল হল। ব্যস, প্রমাণ শেষ। কিন্তু যখন জানা গেল তার দু-তিনদিন আগে সেই ড্রাইভারকে একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে যে তাকে অনেক টাকা পাইয়ে দেবে এবং সেটা পেলেই ড্রাইভার অন্য কোথাও চলে যাবে। কে সেই লোক? তারও হদিস পাওয়া গেল। লোকটা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। বিশেষ করে তোমার কাজ। একটা পরিচারিকার শ্লীলতাহানি করার জন্যে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আশ্চর্য! তাকে চাকরি দিল আমার তৈরি রামচন্দ্র বণিক। আমাদের স্বনামধন্য এমপি। কিন্তু তার খোঁজে পুলিশ গিয়ে শুনল সেই লোক হাওয়া হয়ে গিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে সে দিল্লিতে এসেছে।'

দুর্যোধন মিত্র থামলেন।

উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণা। 'তুমি এসব কথা আমাকে বলছ কেন?'

'আমি ভাবছি। বলতে পারো জোরে জোরে ভাবছি।'

'আমি এসব জানি না। তোমাকে একদিন সময় দিলাম। তারপর আমাকে জানাবে।' কৃষ্ণা দরজার দিকে এগোলেন।

'আমার মনে হয় এখন তোমার বাড়ি ফেরা উচিত নয়।'

'মানে?'

দিল্লির পুলিশ হন্যে হয়ে লোকটাকে খুঁজছে। আজ বিকেলেও তাকে হাসপাতালে নাকি দেখা গেছে। তুমি কি তার কাছেই লীলার খবর জেনেছ?'

চোখ বন্ধ করলেন কৃষ্ণা। যেন নিজেকে সংযত করলেন, তারপর বললেন, 'তুমি কী চাইছ?'

'শাস্তি? আমি কোনও সংঘাত চাই না, রেষারেষি না। আমার ছেলে প্রচণ্ড অসুস্থ, আমি চাই সে সুস্থ হয়ে উঠুক। তবে, তাকে যে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

'সুন্দরকে যে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ কি? একটি ড্রাইভারকে খুন করা হয়েছে অথবা আর একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানেই সুন্দরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল এ কথা মানতে আমি রাজি নই।' মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা। 'ওটা দুর্ঘটনা না খুন তা সঠিক বলতে পারত সুন্দর। কিন্তু তার পক্ষে আর কখনই কথা বলা সম্ভব নয়।'

'এই তথ্য পেলে কোথায়?'

'তুমি আমাকে সুন্দরের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করেছ। কিন্তু সম্পর্কে সে আমার সন্তান। তার খবর নিতে আমার ইচ্ছে করে। তুমি তো ওই ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলতে পারো

না। আমি হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জেনেছি, সুন্দরের পক্ষে আর কখনই উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কারণ তার মস্তিষ্ক আর কখনই কাজ করবে না। এই অবস্থায় নিজের শত্রু তৈরি করে প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া কি উচিত হবে? আচ্ছা—।'

কৃষ্ণা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা বাইরে বেরিয়ে এসেই মোবাইলে ফোন করলেন লিফটে নামতে নামতে। নীচে নেমে কানেকশন পেলেন, 'তোমাকে বলেছিলাম লোকটাকে দিল্লি নিয়ে এসে ঠিক করোনি।'

ওপাশ থেকে প্রশ্ন, 'কেন?'

'দুযোর্ধন মিত্র ওর গতিবিধি জানেন। ওকে এখনই দিল্লির বাইরে চলে যেতে বল। ও আজ রাত্রেই নেপালে চলে যাক।' কৃষ্ণা বললেন।

'বেশ।'

'তুমি কবে ফিরে যাবে?'

'পার্লামেন্ট চলছে।'

'ও। এতদিন হয়ে গেল কিন্তু কিছুই করা সম্ভব হল না। মেয়েটা তো এসে গেল।'

'কোনও লাভ হবে না। সুন্দর আর কখনও কথা বলবে না।'

'আমি অস্বস্তিতে আছি। দুযোর্ধন মিত্রকে নার্ভাস বলে মনে হল না।'

'ধৈর্য-ধরুন ম্যাডাম।'

'আর কতদিন?'

'আর আটচল্লিশ ঘন্টা।'

লাইন কেটে দিলেন কৃষ্ণা মিত্র।

ভোর রাত। বাইরে যে সকাল হচ্ছে হাসপাতালের ভেতরের কেবিনে তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। লীলা চেয়ার টেনে সুন্দরের পাশে এসে বসেছিল। ওপাশের কোণে নার্স ঘুমোচ্ছে। সুন্দরের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে লীলার খুব খারাপ লাগছিল। কি পালটে গেল মানুষটা। তার সহকর্মীরা কত গল্প শুনিয়েছে এই লোকটির চরিত্রহীনতার। কিন্তু দার্জিলিং-এ প্রথম আলাপের পর থেকে একবারের জন্যেও তার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়নি সে। একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে তার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জবাব সে যেমন জানতে চায়নি তেমনি সুন্দরও যেচে দিতে উদ্যোগী হয়নি। আজ মানুষটা কী অসহায়!

কপালে আঙুল রাখল লীলা। ঠান্ডা স্পর্শ। একটু বাদেই মাথাটা নড়ে উঠল। ঠোঁট নড়তে লাগল তিরতির করে। লীলা কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল, 'আমি লীলা!'

ঠোঁট স্থির হয়ে গেল। মুখ ভাবলেশহীন। লীলা কয়েকবার ফিসফিসিয়ে ডাকল কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। খুব আস্তে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল লীলা, সুন্দরের চোখে, কপালে ঠোঁটে।

নার্সের নাম মারিয়া গোমেস। বাড়ি ছিল গোয়ায়। সেখানেই নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে চাকরি জীবন শুরু। ধীরে ধীরে উন্নতি। অনেকগুলো ভালো হাসপাতাল ঘুরে শেষ পর্যন্ত দিল্লির এই নামি হাসপাতালে ভালো মাইনের চাকরি পাওয়ায় একমাত্র মেয়ে জুলিয়াকে দামি স্কুলে ভরতি করতে পেরেছেন। মিস্টার গোমেসের সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল তিন বছর আগে যখন জুলিয়ার বয়স চার। লোকটা কিছুতেই তার অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যেস ছাড়তে রাজি হয়নি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একটা অটো নিয়ে করোলবার্গে আসতে বড়জোর আধঘণ্টা লাগে। মারিয়া অটো ছেড়ে গলির মধ্যে ঢুকল যখন তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। সাড়ে আটটায় জুলিয়ার স্কুলবাস আসবে। পার্বতী ওকে তার মধ্যে তৈরি করে দেবে। পার্বতী বিহারের বউ, এখানে স্বামী মরে যাওয়ার পর ভাসছিল। খবর পেয়ে মারিয়া তাকে নিয়ে এসেছিল। অনেক ঘষে মেজে নিজেদের মতো করে নিয়েছে।

বেল বাজাতেই যেভাবে দরজা খুলল পার্বতী এবং কেঁদে উঠল তাতে চোখ কপালে উঠল মারিয়ার। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় পার্বতী কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। অনেক ধমক খাওয়ার পর সে জানতে পারল, জুলিয়াকে খুঁজে পাচ্ছে না।

পায়ের তলায় মাটি নড়ে গেল মারিয়ার। প্রশ্ন করে করে জানতে পারল পড়ার ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে জুলিয়া বাইরের ঘরে বসে টিভি দেখছিল। সেসময় পার্বতী কিচেনে। তখন যেন টিভির আওয়াজের সঙ্গে বেল বাজার আওয়াজ কানে এসেছিল পার্বতীর। প্রথমে সে ভেবেছিল ওটা টিভিতেই বেজেছে। মিনিট পাঁচেক বাদে হাতের কাজ শেষ করে সে বাইরের ঘরে এসে দেখতে পেল, দরজা ভেজানো, জুলিয়া নেই। দ্রুত নীচে নেমে চারদিকে খুঁজেও সে মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু সামনের দোকানের লালা বলল জুলিয়া নাকি একটি লোকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেছে। লোকটির সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল।

মারিয়া পাগল হয়ে গেল। দু-তিনবার তন্নতন্ন করে শুধু পাড়াটা নয়, গোটা আজমল খাঁ রোড দেখে এল। কোথাও জুলিয়া নেই। তার পরই টেলিফোনটা এল।

'মিসেস গোমেস?'

'ইয়েস!' শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম মারিয়ার।

'আমি বুঝতে পারছি বাড়িতে ফিরে মেয়েকে না দেখে আপনি খুব আপসেট!'

'আপনি, আপনি কে?'

'আপনার মেয়ে আমার কাছে আছে। ওকে আপনি ফিরে পেতে চান?'

'নিশ্চয়ই। কেন? কেন ওকে নিয়ে গেছেন? আমি কারও কোনও ক্ষতি করিনি তো!'

'না করেননি! আপনি কি মেয়েকে না পাওয়ার কথা পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না! কিন্তু—!'

'প্লিজ, এই ভুলটা দয়া করে করবেন না।'

'আপনি কেন আমার মেয়েকে নিয়ে গেছেন?'

'খুব সহজ। আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। করে দিলেই আপনি মেয়েকে ফেরত পেয়ে যাবেন। আমরা ওকে বেশিক্ষণ কাঁদাতে চাই না।'

'ও কাঁদছে?'

'খুব স্বাভাবিক। তাই না?'

'কেন আমার মেয়েকে কাঁদাচ্ছেন আপনি, আপনাকে আমি চিনিই না।'

'আমি চিনি।'

'কী কাজ করতে হবে?'

'খুব সিম্পল। হাসপাতালে আপনি একটি অর্ধমৃত পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করেন। মাত্র তিনজন নার্সের ওই কেবিনে যাওয়ার অনুমতি আছে। বাকি দুজনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কোনও পিছুটান নেই। তাই আপনাকেই বেছে নিতে হল। হ্যাঁ, আপনার ডিউটি আবার কখন শুরু হচ্ছে?'

'রাত ন'টায়।'

'তার মধ্যে আপনি জেনে যাবেন আপনাকে কী করতে হবে। রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। অন্য কিডন্যাপারদের মতো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার মেয়েকে আটকে রাখব না। আপনি যখন কথা দিয়েছেন তখন ওকে আজই ফেরত দেব। কিন্তু কথার খেলাপ হলে—।'

'আমি চেষ্টা করব।'

লাইন কেটে গেল। মারিয়া দ্রুত ওই নাম্বারে ডায়াল করে শুনল ওটা এসটিডি বুথ।

জুলিয়া ফিরল মিনিট চল্লিশেক পরে। একা। ঝাঁপিয়ে পড়ল মারিয়া, 'কোথায় গিয়েছিলি? কার সঙ্গে গিয়েছিলি? কেন গিয়েছিলি?

'বারে। আঙ্কল আন্টি এসে বলল ড্যাডের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এখনই আমাকে দেখতে চায়, দেরি হলে আর দেখতে পাবে না—!'

'পার্বতীকে বলে যাসনি কেন?'

'ওরা এত তাড়া দিল—!'

'দেখা হয়েছে?'

'না। গিয়ে শুনলাম ড্যাড মারা গিয়েছে। আই ফেল্ট সো ব্যাড।'

'নো। তোর ড্যাডের কিছুই হয়নি। ওরা খারাপ লোক। তোকে কিডন্যাপ করেছিল।'

'ওমা! কিডন্যাপ করলে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে কেন? কেন এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে? মাঝখান থেকে আমার স্কুলে যাওয়া হল না।' জুলিয়া ভেতরে চলে গেল। মারিয়া বুঝল তার কিছু করার নেই।

সকালে স্নান করে পোশাক বদলে লীলা চুপচাপ বসেছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল যে এভাবে সে কতদিন থাকবে? বাবার অপারেশন হল কিনা, হলে কেমন আছেন, তার কোনও খবরই সে পাচ্ছে না। কিন্তু সুন্দরের দিকে তাকাতেই মন নরম হয়ে যাচ্ছিল। সিকিউরিটির মারফত তার ব্রেকফাস্ট এল। যে বয়স্কা নার্স ডিউটিতে ছিলেন তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'দাঁড়াও।'

তারপর ট্রে তুলে খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। যেতে পারো। এটা করতে হল বলে কিছু মনে কোরো না। আমার ওপর এটা করার নির্দেশ আছে।'

খাওয়া শেষ হতে না হতেই নার্স ডাকলেন, প্লিজ, কাম!'

অ্যান্টি রুম থেকে কেবিনে ছুটে গিয়ে লীলা দেখল সুন্দর আবার অস্থির হয়েছে, তার মাথা দুপাশে বারংবার ঘুরছে। লীলা ওর মুখের কাছে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে? বলো, আমি লীলা। আমি লীলা!'

মাথাটা স্থির হল। লীলা আবার বলল, 'আমি লীলা।'

'লী-লা!' ফিসফিস শব্দ বের হল সুন্দরের দুটো ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

'হ্যাঁ, লীলা!'

'লীলা!' ঠোঁটের কাছে প্রশান্তির ছাপ।

'প্লিজ, তাকাও। সুন্দর, আমি লীলা, লীলা!'

চোখ কুঁচকে গেল, পাতা নড়ল কয়েকবার। ওদিকে তখন নার্স ইন্টারকমে উত্তেজিত গলায় বলছেন, 'ডক্টর প্লিজ কাম কুইক, হি ইজ রেসপনসিং।'

লীলা ততক্ষণে সুন্দরের ডান হাত দু-হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে, 'চোখ খোলো, চোখ খোলো, প্লিজ!'

'লীলা!' শব্দটা বেরুনো মাত্রই আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল সুন্দর। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকিতেও কাজ হল না।

এই সময় ডাক্তার কেবিনে ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। সমস্ত শোনার পর ভদ্রলোক তখনই সুন্দরের ব্রেন স্ক্যান করার ব্যবস্থা করলেন। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর চেম্বারে দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত ভদ্রলোক। আগের রিপোর্টের সঙ্গে প্রচুর পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এবং সেগুলো ভালোর দিকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এরকম ঘটনা লাখে একটাই হয়। এভাবে চললে—!

দুর্যোধন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে হল?'

'আমরা সবাই ওই মেয়েটির কাছে গ্রেটফুল মিস্টার মিত্র। আমি নিশ্চিত ওর জন্যে এই মির‍্যাকল সম্ভব হয়েছে। ওকে এখানে নিয়ে এসে আপনি যে কী ভালো করেছেন তা বলার নয়।'

'ডক্টর।' গম্ভীর গলায় বললেন দুর্যোধন মিত্র।

'ইয়েস!'

'সুন্দরের এই পরিবর্তনের কথা কে কে জানে?'

'যে নার্স ডিউটিতে আছেন, ওই লীলা নামের মেয়েটি আর আমি। কেন?'

'নার্স নিশ্চয়ই বাড়িতে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁকে বলে দিন এই ইমপ্রুভমেন্টের কথা যেন উনি কাউকে না বলেন, বরং বলবেন অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। আপনাকেও তাই বলতে অনুরোধ করছি।'

'কিন্তু কেন?'

'আপনি জানেন ওর জীবন বিপন্ন। যারা ওর মৃত্যু চায় তারা জানে ও বাঁচবে না। উলটোটা হচ্ছে জানলে ওরা মরিয়া হয়ে উঠবে।'

'ও!'

'প্লিজ ডক্টর!'

'ও.কে.!'

দুর্যোধন মিত্র ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে আসতেই মোবাইলে আওয়াজ হল। দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'হ্যালো!'

'মিস্টার মিত্র।'

'ইয়েস।'

'আমি দিল্লি পুলিশের অফিসার, আমাকে আপনি চেনেন।'

'হ্যাঁ বলুন অফিসার।'

'আপনি ওপরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।'

মোবাইল অফ করে কোণের ডিভানে বসলেন দুর্যোধন মিত্র। অফিসার উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। সামনে এসে বললেন, 'গুড মর্নিং। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনার মন নিশ্চয়ই আগের থেকে অনেক ভালো।'

দুর্যোধন কথা না বলে তাকিয়ে থাকলেন।

অফিসার হাসলেন, 'খারাপ খবর বাতাসের আগে ছোটে হয়তো, ভালো খবরও চাপা থাকে না, হয়তো তার গতি কম।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনার ছেলেকে সুস্থ করার জন্যে একজন মহিলাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখানেই মুশকিল হয়েছে। দিল্লির কনটপ্লেসের থানায় ডায়েরি করা হয়েছে যে আপনি ভয় দেখিয়ে জোর করে তাকে এখানে এনে আটকে রেখেছেন।'

'জোর করে? ভয় দেখিয়ে?' অবাক হয়ে গেলেন দুর্যোধন মিত্র।

'তার সঙ্গে ধোকা করা হয়েছে, ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে। ওর বাবার চিকিৎসার খরচ দিয়ে

আপনি ওকে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন।'

'অফিসার, আমি কাউকে ভয় দেখাইনি, ব্ল্যাকমেইল করিনি, আটকে রাখিনি।'

'বেশ। মেয়েটির স্টেটমেন্ট দরকার।'

'আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ততক্ষণ আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাবেন না।'

অফিসার চলে গেলে দুর্যোধন মিত্রের মনে হল কে ডায়েরি করেছে তা অফিসার বললেন না। না জিজ্ঞাসা করলে এঁরা নিজে থেকে জানান না।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এলেন অফিসার, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার মিত্র। আপনার কথাই ঠিক। আমরা মিসেস মিত্রকে জানিয়ে দেব।'

'মিসেস মিত্র?' উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন মিত্র।

'বলতে খারাপ লাগছে, অভিযোগটা তাঁরই ছিল।'

'উনি নিজে কমপ্লেন করেছেন?'

'না। একজন এমপি-র মাধ্যমে—! ছেড়ে দিন। এবার আপনি যেতে পারেন।'

গোটা দিন ধরে কৃষ্ণা মিত্রকে ফোন করে দুর্যোধন মিত্র শুনে গেলেন ওটা সুইচ অফ করে রাখা আছে। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র বণিককে ফোন করলেন তিনি।

'রামবাবু!'

'একি দাদা, হঠাৎ আমাকে বাবু বলছেন কেন?'

'লীলাকে আমি ব্ল্যাকমেইল করে এখানে এনেছি এ কথা পুলিশকে না জানিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে পারতে।' দুর্যোধন মিত্র বললেন।

'পুলিশ কি বলেছে আমি তাদের জানিয়েছি?'

আর কথা বাড়ালেন না দুর্যোধন মিত্র। ফোন রেখে দিয়ে আফশোশ হল, কেন যে টেলিফোন করতে গেলেন। উত্তরটা যে এইরকম হবে তা জানাই ছিল।

গলি থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড়ানো অটোয় উঠে হাসপাতালের ঠিকানা বললেন মারিয়া। এখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। পার্বতীকে বারংবার বলে এসেছেন, যে কেউ বেল বাজাক সে যেন দরজা না খোলে।

হু হু করে অটো ছুটে যাচ্ছিল নির্জন রাজপথ দিয়ে। সাধারণত অটোওয়ালাদের সটকাটগুলো চিনিয়ে দিতে হয় কিন্তু এ দেখা যাচ্ছে সব জানে। তাকে হাসপাতালের সামনে নামিয়ে দিতেই তিনি ভাড়া এগিয়ে দিলেন। লোকটা হিন্দিতে বলল, 'ম্যাডাম, ভাড়া আমি পেয়ে গেছি। উলটে আপনাকে কিছু দেওয়ার আছে।' পকেট থেকে একটা খাম বের করে মারিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়েই সে সজোরে অটো চালিয়ে চলে গেল।

মারিয়া এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে খাম না খুলে সে সোজা ভেতরে চলে এসেছিল। লকার রুমে ঢুকে সে খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করেছিল। চিঠির সঙ্গে একটা ছোট্ট ট্যাবলেট রাখা ছিল। কাউকে উদ্দেশ্য না করে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে আজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করে এমনভাবে স্যালাইনের বোতলে ঢেলে দিতে হবে যা বাইরে থেকে বোঝা না যায়। যদি সেটা করতে অসুবিধে হয় তাহলে গ্লাসের সামান্য জলে গুলে তরলপদার্থ পেশেন্টকে খাইয়ে দিতে হবে। দেওয়ার পরে গ্লাস এমন ভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে

তার গায়ে ওষুধের কোনও চিহ্ন না থাকে। এ সবই তাকে শুধু মেয়ের নিরাপত্তার কারণে করতে হবে না, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে তার বাৎসরিক বেতনের পরিমাণ টাকা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।

চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা। কম্পিউটারে টাইপ করা। যে লিখেছে তার কোনও হদিস নেই। মারিয়ার মেরুদণ্ড আচমকা বরফ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। এই সময় আর একজন নার্স লকার রুমে ঢুকে তাকে দেখে এগিয়ে এল, 'কী হয়েছে মারিয়া?'

মাথা নেড়ে মারিয়া জানাল তার কিছু হয়নি।

'তোমার হাতে ওটা কী?'

'ও কিছু নয়।' দ্রুত চিঠিটাকে ব্যাগ ঢুকিয়ে ফেলল সে।

'কিন্তু তোমাকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

'না-না। ঠিক আছি।' উঠে দাঁড়ালেন মারিয়া।

টয়লেটে গিয়ে মুখে জল দিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে মারিয়া স্থির করল, না। কিছুতেই সে ট্যাবলেটটা সুন্দরকে দেবে না!

কেবিনে ঢুকে মারিয়া দেখল লীলা সুন্দরের মাথার পাশে বসে আছে। বয়স্কা নার্স যিনি দ্বিতীয় শিফটের ডিউটিতে এসেছিলেন, বললেন, 'আজ চারবার চোখ খুলেছে পেশেন্ট। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন আর কোনও ইমপ্রুভমেন্ট দেখলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।'

মারিয়া এগিয়ে গিয়ে লীলার মাথায় হাত রাখল, 'ডিনার করেছ।'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লীলা।

'যাও, ওঘরে গিয়ে রেস্ট নাও। আমি তো এসে গেছি।'

লীলা তবু নড়ল না। নিজের চেয়ারে বসে ওদের দেখছিল মারিয়া। এই ছেলেটাকে মেরে ফেলে কার লাভ হবে? আজ যদি সে ওঁদের কথা না শোনে তাহলে জুলিয়ার জীবন বিপন্ন হবে, এটা ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে। মারিয়া উঠে সোজা টয়লেটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। এক মুহূর্ত ভেবে বাড়িতে ফোন করল। ফোন বাজছে। তারপর পার্বতীর গলা, 'হ্যালো।'

'পার্বতী সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

'জুলিয়ার খাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কখনই দরজা খুলবে না।'

'ঠিক আছে।'

ফোন কেটে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারিয়া। তারপর মন শক্ত করে নাম্বারটা ডায়াল করল। বহুদিন আগে নাম্বারটা পেয়ে মনে হয়েছিল যদি কখনও দরকার হয় তাই সেভ করে রাখি। আজ ওটা কাজে লাগাতে হবে।

ওপাশ থেকে হেঁড়ে গলায় কেউ প্রশ্ন করল, 'হ্যালো?'

রাত বারোটা নাগাদ চোখের পাতা কাঁপল সুন্দরের। ঝুঁকে পড়ল লীলা, 'সুন্দর, সুন্দর আমি লীলা, লীলা।'

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সুন্দর। কিন্তু সেই চোখ কিছু দেখছে না। দু-হাতে লীলা মুখ ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে, 'সুন্দর! আমি লীলা।'

'লীলা!'

'হ্যাঁ, সুন্দর, আমি লীলা।'

'লীলা!' ঠোঁটের কোণে কি হাসি ফুটল?

'আমি তোমার পাশে আছি সুন্দর!'

সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতের আঙুল নড়ল সুন্দরের। সেটা আলতো করে ধরল লীলা, 'তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

টয়লেট থেকে বেরিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৃশ্যটা দেখছিল মারিয়া। হুঁশ ফিরতেই ইন্টারকমে কথা বলল, 'ডক্টর, হিজ সেন্স ইজ কামিং।'

পরের পনেরো মিনিট কেবিনে দুজন ডাক্তার তাঁদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে পরামর্শ করার পর স্থির করলেন একটা ছোট অপারেশন করতে হবে। সে কারণে অফিসকে বলা হল দুর্যোধন মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দেখা গেল দুর্যোধন মিত্রের মোবাইলের সুইচ অফ, হোটেলের অপারেটার জানাল ল্যান্ড লাইনে কেউ রেসপন্স করছে না। অথচ অপারেশন করতে মিস্টার মিত্রের সম্মতি দরকার।

তার কিছু আগে হাসপাতাল থেকে দুফার্লং দূরের পুলিশ স্টেশনের সামনে গাড়িটা থেমেছিল, দুর্যোধন মিত্র গাড়ি থেকে নামতেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন, 'গুড মর্নিং, মিস্টার মিত্র।'

'কী ব্যাপার? এত রাত্রে আমাকে এখানে ডেকে আনলেন কেন?' দুর্যোধন মিত্র বিরক্ত।

'ভেতরে আসুন, বলছি।'

যে ঘরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে ঢুকে চমকে উঠলেন তিনি।

'এঁকে কি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন?'

'অবশ্যই। আমার ওখানে কাজ করত। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'ঠিক। তারপরে ও মিস্টার রামচন্দ্র এমপি-র কাছে চাকরি পায়।'

'অফিসার, ওকে জেরা করুন, ও-ই বলতে পারে কে আমার ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিল। খুনি ওকেই কাজে লাগিয়েছিল।' দুর্যোধন মিত্র উত্তেজিত।

'আপনি বসুন মিস্টার মিত্র।'

দুর্যোধন মিত্র চেয়ারে বসলে অফিসারের ইঙ্গিতে আর একজন অফিসার যাঁদের ঘরে নিয়ে এলেন তাঁদের দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিসেস কৃষ্ণা মিত্র এবং রামচন্দ্র বণিককে ঘরে এনে দুদিকে বসানো হল।

অফিসার বললেন, 'আপনাদের তিনজনকে এসময়ে এখানে আনার জন্যে দুঃখিত। গত দুদিন আমি নর্থবেঙ্গলে ছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে মনে হল আপনাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সেটাই শুরু করি।'

রামচন্দ্র বললেন, 'আপনার মতো এসপি লেভেলের অফিসারের সঙ্গে আমি কথা বলতে বাধ্য নই। আর কথা যদি বলতে হয় সেটা আমার ল-ইয়ার বলবেন।'

'মাননীয় এমপি মশাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমি ওপর তলায় নির্দেশে কাজ করছি। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের কথা বলতে একবারও বলিনি। চা বা কফি?'

তিনজনের কেউ মুখ খুললেন না।

অফিসার বললেন, 'সুন্দরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল না ওটা স্রেফ দুর্ঘটনা তা নিয়ে আমার ধন্দ ছিল। কিন্তু সুন্দরের ভাঙাচোরা গাড়ির গায়ে সুমোর বডির রং পাওয়া যাওয়ার পরও ওটা দুর্ঘটনা না অন্য কিছু, সেই সন্দেহ থেকেই যায়। দুর্ঘটনা হলে বেঁচে যাওয়া ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ সবাইকে জানাত। হতে পারে তার ওপর দোষ পড়বে ভেবে সে চেপে যাচ্ছে। কিন্তু সুমো গাড়ির ব্রেক এবং স্টিয়ারিং একদম ঠিক ছিল। তাহলে দুর্ঘটনা ঘটল কেন? সুন্দরের গাড়ি ছিল গাছের দিকে। সে নিশ্চয়ই নিজে থেকে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়বে না!'

দুই। সুমোর ড্রাইভারকে খুন করা হল। তার মানে লোকটাকে অন্য কেউ কাজে লাগিয়েছিল। কে সে? সুমোর ড্রাইভার ভাড়ার গাড়ি চালাত। তদন্তে জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার আগে এবং পরে সে ওই লোকটির সঙ্গে দেখা করেছে। আমাদের জেরায় ওই লোকটি তা স্বীকার করেছে।' ঘরের আর এক কোণে জড়সড় হয়ে বসা নেপালিটিকে দেখালেন অফিসার, 'কিন্তু ও এখনও আমাদের জানায়নি কেউ ওকে সুমো গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়েছিল কিনা।'

তিন। সুন্দরের মৃত্যুতে কার লাভ হত? প্রথম সন্দেহ, মিসেস কৃষ্ণা মিত্র। মিস্টার মিত্রের পরে সুন্দরই ওই বিপুল সম্পত্তির মালিক হবে। দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে মিসেস মিত্র যা পাবেন তাতে তাঁর মন ভরবে না। সুন্দর না থাকলে পুরোটাই তাঁর দখলে যাবে।'

'এটা মিথ্যে, একদম মিথ্যে অভিযোগ।' কৃষ্ণা মিত্র চিৎকার করলেন।

'হয়তো। কিন্তু কোনও ল-ইয়ারের অনুপস্থিতিতে কথা না বলাই বোধহয় উচিত। হ্যাঁ, এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় কর্মচারীকে মিস্টার মিত্রের কেয়ারটেকার বরখাস্ত করার পরে তিনি রামচন্দ্র বণিক মশাই-এর কাছে চাকরির জন্যে সুপারিশ করেন। তাহলে ধরে নিতে হবে ওই লোকটি সুন্দরহত্যা ষড়যন্ত্রের অন্যতম শরিক।'

চার। এবার শ্রীরামচন্দ্র বণিক। খুব সামান্য অবস্থা থেকে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে যখন পরিচিত হচ্ছিলেন তখন মিস্টার দুর্যোধন মিত্র তাঁকে স্নেহ করতে শুরু করেন। একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহে প্রথমে এমএলএ, পরে এমপি হন মিস্টার বণিক। কিন্তু এতসব হওয়া সত্ত্বেও ওই এলাকায় যে-কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাঁকে মিস্টার মিত্রের কথা শুনতে হত। ফলে তাঁর মনে হীনমন্যতার জন্ম নেয়। মনে মনে মিস্টার মিত্রকে শত্রু বলে ভেবে নেন। আর সেই মানসিকতা থেকে আঘাত হানতে তাঁর পক্ষে সুন্দরকে বেছে নেওয়া খুব স্বাভাবিক।'

পাঁচ। সমস্যার সমাধান এই ভাবে ভাবলে খুব সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কয়েকটা ব্যাপারে। সুন্দর যে রাত্রে দার্জিলিং-এ পৌঁছেছিল তা মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্র অথবা মিস্টার বণিক জানতেন না। হিলটপের কারও জানা ছিল না। সে দার্জিলিং-এ আছে তা মিস্টার মিত্র জানতে পারেন। তিনি পুলিশকে সুন্দরের নিরুদ্দেশের কথা জানিয়েছিলেন। তারাই জানিয়েছিল। সুন্দর যখন তাঁকে ফোন করে তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেন। সুন্দর শোনেনি। সম্ভবত সে তার বাবাকে জানায় যে লীলাদের বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে তবে ফিরবে।

সুন্দর যে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে তা মিস্টার মিত্র ছাড়া আর কারও জানা ছিল না।'

এই সময় ফোন বেজে উঠল অফিসারের। সেটা শুনে মোবাইল এগিয়ে দিলেন তিনি দুর্যোধন মিত্রের দিকে, 'ইমিডিয়েটলি সুন্দরকে অপারেশন করতে চান ডাক্তাররা। ওঁরা আশা করছেন এর ফলে সে বেঁচে যাবে। আপনার ওপিনিয়ন চাইছেন।'

দুর্যোধন মিত্রের হাত কাঁপছিল। মোবাইল নিয়ে হ্যালো বলে ওদিকের বক্তব্য শুনলেন চুপচাপ। তারপর শ্বাস ফেলে বললেন, 'যা ভালো মনে করেন করুন।' ওপাশ থেকে ডাক্তার কিছু বললেন। দুর্যোধন মিত্র বললেন, 'কিন্তু আমি এখন হোটেলে নেই।' জবাবটা শুনে ম্লান হেসে রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন তিনি। অফিসার বললেন, 'ও.কে. ডক্টর, উই আর হিয়ার।'

'আমি যে এই সময় পুলিশ স্টেশনে থাকব তা আপনি হাসপাতালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। যদি আপনাকে ওদের দরকার হয়—!'

মোবাইল বন্ধ করে অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম—! সুন্দর যে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে পাহাড়ে একা গাড়ি চালিয়ে আসছে এই খবর না জানা থাকলে কেউ ওকে খুনের পরিকল্পনা করতে পারে না। এয়ারপোর্ট থেকে দুর্ঘটনাস্থলে আসতে অন্তত আড়াইঘন্টা সময় লাগে। মাঝখানে নীচের সমতলের শহর পার হতে হয়। এই সময়ের মধ্যে খুনিকে সব ব্যবস্থা

করতে হয়েছে। অচেনা ড্রাইভারের ওপর দায়িত্ব দিলে সে হয়তো সুন্দরকে চিনতেই পারত না। অতএব সেরকম একজনকে পাঠানো হয়েছিল আপনাদের শহর থেকে। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে তার কুড়ি মিনিট লেগেছিল। তার আগের সময়টায় খুনি বা তার লোক ওকে কী করতে হবে তা বুঝিয়েছে। লোকটি সুমো গাড়ি নিয়ে কুড়ি মিনিট নীচে নেমে গাড়ি ঘুরিয়ে অপেক্ষা করছিল সুন্দরের জন্যে। সুন্দর নিশ্চয়ই ওপরে ওঠার সময় সুমোটাকে দেখতে পেয়েছিল, কথা হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না। আমি বলতে চাইছি সুন্দরের ওই সময়ে ফিরে আসার খবর যার জানা ছিল একমাত্র তার পক্ষেই খুন করা সম্ভব। মাপ করবেন মিস্টার মিত্র, সন্দেহের কাঠগড়ায় আপনাকে দাঁড় না করানো ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন মিত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ননসেন্স। কি যা তা বলছেন? ওই সুমোর ড্রাইভারকে আমি চিনিই না।'

'এটা প্রমাণ সাপেক্ষ।'

'তা ছাড়া আপনি কি উন্মাদ। আমার একমাত্র সন্তানকে আমি খুন করব?'

'ইতিহাসে এরকম ঘটনা প্রচুর আছে। আপনার মতো ধনী শিল্পপতি, বিশাল হোটেলের মালিক, ভারতবর্ষের এক প্রান্তে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ, আপনার বিশাল সম্মান আপনি কোনও কিছুর বিনিময়ে হারাতে চান না। আপনার ছেলে একটা সাধারণ রিসেপশনিস্টের রূপে পাগল হয়ে তার বাবার চিকিৎসার জন্যে দার্জিলিং ছুটে যাচ্ছে এটা আপনার কাছে বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। তবু, যদিও বা করতেন, সে নিজের টাকায় তাদের প্লেনে করে কলকাতায় পাঠাচ্ছে মানে মেয়েটির সঙ্গে অনেকদূর জড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ওই মেয়েকে যদি সে বিয়ে করে তাহলে আপনার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে আপনি কিছুই করতে পারতেন না।' অফিসার বললেন।

এই সময় রামচন্দ্র বণিক হাত তুললেন।

'আপনি কিছু বলতে চান?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। আমি ওঁদের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ। সুন্দর ছেলেটি আমেরিকায় পড়তে গিয়ে নারীঘটিত ব্যাপারে বারংবার জড়িয়ে ছিল। এই চরিত্রহীন ছেলের ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন মিস্টার মিত্র। ওকে সংশোধন করার শেষ চেষ্টায় আমেরিকা থেকে নিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু এখানে এসে সে কোনও কাজই করত না। শোনা যায়, হিলটপ হোটেলের ঘরে বসে মদ্যপান করত। এসব কারণে ছেলের ওপর ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট ছিলেন উনি।' রামচন্দ্র বললেন।

'মিসেস মিত্র। আপনার কিছু বলার আছে?'

'আমাদের বিয়ের সময় সুন্দর আমেরিকায় ছিল। তাকে আনা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলেছিলেন সে এসে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমি যতদিন, যতবার এই শহরে ছিলাম তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি তিনি। সুন্দরকে হোটেলেই থাকতে হত। ছেলের সম্পর্কে ওর কোনও স্নেহ-মায়া ছিল না। উনি প্রায়ই বলতেন আমার সন্তান হলে সে-ই উত্তরাধিকারত্ব পাবে। কিন্তু কাউকে বঞ্চিত করে আমি সুখী হতে চাইনি।' গলা ভিজে গেল কৃষ্ণা মিত্রের।

ঠিক তখনই একজন অফিসার ঘরে ঢুকে তার তদন্তকারী অফিসারকে নীচু গলায় কিছু বলে একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন। তাতে চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক দুর্যোধন মিত্রের কাছে ফাইলটা নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হাসপাতাল থেকে পাঠিয়েছে, অপারেশনের আগে আপনার সই দরকার। সইটা আমাদের সামনে করা হয়েছে বলে জানাতে হবে।'

দুর্যোধন মিত্র সই করে দিলেন। ফাইলটা অফিসারকে ফিরিয়ে দিলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মিত্র, আপনার কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, আপনি এতক্ষণ যা বললেন সবই আপনার কল্পনাপ্রসূত।'

'ওয়েল। সেটা আদালতে প্রমাণ করবেন। ওয়েল মিসেস মিত্র, মিস্টার বণিক, আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। আপনারা এখন যেতে পারেন আর যাওয়ার সময় এই বেচারাকে সঙ্গে নিয়ে যান, একে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। অফিসার নেপালি লোকটাকে ইশারা করলেন।'

রামচন্দ্র বণিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মিত্র—?'

'ওঁকে আরও প্রশ্ন করার দরকার। উনি আমাদের কাস্টডিতে থাকবেন।'

'নো।' চেঁচিয়ে উঠলেন দুর্যোধন মিত্র, 'আমি আমার ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তার জন্যে অনেক সময় পাবেন মিস্টার মিত্র।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রামচন্দ্র বললেন, 'ওঃ, বুকের ওপর থেকে পাথরটা নেমে গেল।'

'যা বলেছ। হত্যার চেষ্টার জন্যে কত বছর জেল হয়? মিসেস মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইট ডিপেন্ডস। দশ তো হবেই। রামচন্দ্র বললেন, 'এখন থেকে আপনাকে আমাদের শহরে থাকতে হবে। আপনি কি আপনার গাড়িতে যাবেন?'

'আমি? ঠিক আছে, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। আমারটা আমাদের ফলো করুক। এই লোকটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়?'

'ওকে নিউদিল্লি স্টেশনে নামিয়ে দেব। এই, পেছনে উঠে বস।'

রামচন্দ্র গাড়ি চালাচ্ছিল। পাশে মিসেস মিত্র। পেছন থেকে লোকটা বলল, 'সাব্।'

'আবার কি হল?

'আমি এখান থেকে নেপালে চলে যাব।'

'যাও। রক্সৌল হয়ে যেতে পারো।'

'তাহলে এখন টাকাটা দিয়ে দিন।'

'কীসের টাকা?'

'আপনি পাঁচ হাজার দিয়েছেন। আরও পঁয়তাল্লিশ দেওয়ার কথা। মেমসাবও পঞ্চাশ দেবেন বলেছিলেন। ওই টাকা পেলে গ্রামে গিয়ে ক্ষেতি করে জীবন কাটাতে পারব।'

'আমি যা বলেছিলাম তুমি সেই কাজ করোনি।'

'কী করে করব? হাসপাতালে ঢুকতেই পারিনি।'

নিউদিল্লি স্টেশনের সামনে পৌঁছে পকেট থেকে একটা দশ হাজারের বান্ডিল বের করে লোকটার দিকে ছুড়ে দিয়ে রামচন্দ্র বলল, 'নেমে যাও।'

'সাব, আপনি বেইমানি করছেন।'

'কী? এত বড় কথা? তুমি কি চাও তোমার অবস্থা ওই সুমো গাড়ির ড্রাইভারের মতো হোক? যাও, নেমে যাও।' বেশ জোরে ধমক দিল রামচন্দ্র বণিক।

লোকটি চুপচাপ নেমে গেল।

কৃষ্ণা বললেন, 'এখন ক'টা বাজে?'

'আড়াইটে বেজে গেছে।'

'লেটস গো টু সাম প্লেস। এরকম রাত সেলিব্রেট না করলে ভালো লাগবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার শরীর যদি খারাপ হয়?'

'শরীর?'

'শুনেছি মিত্র পরিবারের বংশধর আসছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে হেসে উঠলেন মিসেস কৃষ্ণা মিত্র। রামচন্দ্র গাড়ি চালাতে চালাতে অবাক চোখে তাকাল।

'আই অ্যাম অলরাইট। ওটা বলে দুর্যোধনকে শেষ চেষ্টা করেছিলাম মডিফাই করার।' আবার হাসলেন মহিলা, 'আমি কি পাগল!'

হোটেল সিজার্সের সামনে গাড়ি থামাতেই ঘড়িতে তিনটে বাজল। এখানকার নাইট ক্লাব ভোর চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে। হোটেলের কর্মচারীর হাতে গাড়ির চাবি দিয়ে দু-পা এগোতেই ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে গেলেন মিসেস কৃষ্ণা মিত্র। তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করে পেছন ফিরলেন রামচন্দ্র বণিক।

অফিসার এগিয়ে এলেন, 'এই ভোরে আপনারা নিশ্চয়ই একটু আনন্দ করতে এসেছেন! কিন্তু সরি, আমি সেটা অ্যালাও করতে পারছি না।'

'মানে? আপনি কি বলছেন? চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস কৃষ্ণা মিত্র।

এই সময় আর একটা গাড়ি এসে পেছনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন পুলিশ সাবইনস্পেকটর যাকে টেনে বের করে আনল তাকে দেখে দুজনের চোখ বড় হয়ে গেল।

অফিসার এগিয়ে গিয়ে ইনস্পেকটরকে বললেন, 'ওটা নিয়ে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। এই যে।' একটা ছোট্ট যন্ত্র এগিয়ে দিলেন ইনস্পেকটর।

সেটা নিয়ে দ্বিতীয় গাড়ি থেকে রেকর্ড প্লেয়ার বের করে চালিয়ে দিতেই রামচন্দ্রর গলা শোনা গেল, 'ওঃ, বুকের ওপর থেকে পাথরটা নেমে গেল!'

খানিকটা শোনানোর পর অফিসার বললেন, 'মিস্টার রামচন্দ্র বণিক, মিসেস কৃষ্ণা মিত্র, সুন্দর মিত্রকে হত্যার চেষ্টার জন্যে আপনাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। এই লোকটি নিশ্চয় প্রাণের দায়ে রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়েছে। আমি জানতাম আপনাদের সঙ্গে এমন সব কথা হবে যা ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে। আপনারা একবারও ভেবে দেখলেন না যে ওকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। তবু ছেড়েছিলাম। ছেড়েছিলাম এই রেকর্ডারটা দিয়ে। ইনস্পেকটর, আপনি আপনার কাজ করুন।'

তিনদিন আগে অপারেশন হয়ে গেছে। ডাক্তার খুব আশাবাদী। আজ চোখ খুলল সুন্দর। ডাক্তার ইশারায় লীলাকে কাছে ডাকলেন। লীলা পাশে এসে দাঁড়াতেই সুন্দরের ঠোঁটে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে লীলার হাত ধরল সে। তারপর ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

লীলা জবাব দিতে পারল না। কিন্তু পেছন থেকে দুর্যোধন মিত্রের গলা ভেসে এল, 'হি ইজ অলরাইট মাই সন। অপারেশন সাকসেসফুল। আমি ওঁদের অনুরোধ করেছি ডাক্তাররা পারমিশন দিলেই যেন আমাদের শহরে অতিথি হয়ে আসেন।'

'অতিথি?' সুন্দর তাকাল।

'এখনও পর্যন্ত তো ওঁদের অতিথিই বলতে হবে।'

ডাক্তার বললেন, 'উই আর গ্রেটফুল টু লীলা। ওর জন্যেই সব সম্ভব হল। আমি কি সবাইকে অনুরোধ করতে পারি এই কেবিনের বাইরে যেতে? নার্স, আপনিও চলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে কেবিন খালি হয়ে গেল। কেবিনের ভেতর এখন শুধু লীলা এবং সুন্দর।

সোনার শেকল

দু মাস আগের এক বিকেলে মন নরম হয়েছিল কামাল হোসেনের। ভাগনে মতিনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে একশোবার বলেছি আমার এমনিতেই লোক বেশি, চাকরি দিতে পারব না। এই কথাটা কানে ঢোকে না কেন?'

মতিন মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, 'আপনি ছাড়া ঢাকায় আর কোনও আত্মীয় নেই মামা। মা বলল, আর একবার যা, যদি কিছু হয়।'

'কী হবে? তোমার বিদ্যে তো পাস গ্র্যাজুয়েট। রাস্তায় ঢিল মারলে একটা না একটা পাস গ্র্যাজুয়েটের গায়ে লাগবে।' সিগারেটে লম্বা টান দিয়েছিলেন কামাল হোসেন। তারপর বলেছিলেন, 'আফটার অল তুমি আমার বোনের ছেলে! তোমার বাবা আসলে আমি দ্যাখাই করতাম না। একটা লোক এম.এ. পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস পেয়ে গ্রামে গিয়ে স্কুল মাস্টারি করে আমার বোনের লাইফ নষ্ট করে দিয়েছে। ননসেন্স! কাল সকাল দশটায় বাংলা বাজারে আমার দোকানে এসো। দেখি কী করা যায়।'

'সকাল দশটা!' গলা শুকিয়ে গেল মতিনের।

'তখন ঘুম ভাঙে না নাকি!' খিঁচিয়ে উঠলেন কামাল হোসেন।

'আজ্ঞে, আড়িচা ঘাট খোলে সাতটার সময়, নদী পার হয়ে বাস ধরে আসতে দুই-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়।' মতিন জানাল।

'তুমি আমার কাছে দেশ থেকে আসা যাওয়া কর নাকি!'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'টাকা পাও কোথায়? টিকিটের দাম তো অনেক!'

'আজ্ঞে আমার এক বন্ধু বাসের কনডাক্টর। টাকা নেয় না।'

'ঠিক আছে, এখনই বাংলাবাজারে চলে যাও, আমার দোকানে। ওখানে একটা ঘরে তক্তাপোষ আছে, ঘুমাতে পারবে। মা-বাবাকে ফোন করে দিও।'

কামাল হোসেনের বাড়ি বনানীতে। তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাননি মতিনের বাবা। তার মতে কামাল অসৎ লোক। প্রকাশনার ব্যবসাটা ভালো চলে বটে আসল রোজগার গার্মেন্ট ব্যবসায়। ওই ব্যবসা সে সততার সঙ্গে করে না। কিন্তু মতিনের মা ভাই-এর কোনও দোষ দেখতে পান না। স্বামীর ভয়ে দীর্ঘদিন ভাই-এর সঙ্গে দ্যাখা করতে না পারলেও খবরাখবর রাখেন। তাই বেকার ছেলে যখন হতাশায় ভুগছে তখন স্বামীকে লুকিয়ে ভাই-এর কাছে পাঠিয়েছেন বারংবার।

বনানী থেকে বাংলাবাজারে কতক্ষণে পৌঁছোনো যাবে তা কেউ চট করে বলতে পারবে না। এমনিতে ঢাকার রাস্তায় সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গাড়ির গতি দশ কিলোমিটারের ওপর ওঠে না। তার ওপর রিকশার দঙ্গল বেড়ে যায় নতুন ঢাকা থেকে পুরোনো ঢাকার রাস্তায় পড়লে। মতিন তার কনডাক্টর বন্ধুর কাছে জেনে এসেছিল তার বাস ছাড়বে সন্ধে ছ'টায়। এখনও গিয়ে সেই বাসে ওঠা যায়। কিন্তু মামা যখন থাকতে বলেছেন তখন একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। বাস বদলে বদলে সে যখন বাংলাবাজারে পৌঁছোল তখন রাত একটা বাজে। পকেটে তখন মাত্র দশ টাকা পড়ে আছে।

ঢাকার বই ব্যবসার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হল বাংলাবাজার। এখন অবশ্য নিউমার্কেটে বই-

এর কিছু দোকান হয়েছে কিন্তু বাংলাবাজার থেকেই গোটা দেশের জেলায় জেলায় বই যায়। যাওয়া-আসার অসুবিধা বলে বেশিরভাগ প্রকাশক ছ'টা বাজলেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে 'বিদ্যাসাগর' লেখা সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে পা চালাল মতিন। দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেছে কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। পাশের একটা দরজা খোলা বলে বোঝা যাচ্ছে।

সে সেই দরজার সামনে পৌঁছে দেখল দুজন লোক বই প্যাক করছে। একজন প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দোকান বন্ধ, কাল আসবেন।'

'আমার মামা এখানে আসতে বলেছেন।'

এবার প্রৌঢ় সোজা হয়ে দাঁড়ান, 'আরে মিঞা, কামালভাই পাঁচ ঘণ্টা আগে ফোনে বললেন আপনার কথা। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আর পাঁচ মিনিট পর এলে তো আমাদের পেতেন না। আসুন, ভেতরে আসুন।

মতিন সবিনয়ে বলল, 'আমাকে আপনি করে বলবেন না।'

'হ। কামালভাই কি নিজের মামা? মনে হয় না।' জবাবটা দিয়ে দিল প্রৌঢ়।

কী বলবে মতিন, একটু হাসল।

'পকেটে পয়সা নিশ্চয়ই আছে?'

'হ্যাঁ, দশটা টাকা।'

'বুঝলাম। ওই চেয়ারে বসো।' প্রৌঢ় একটা ড্রয়ার থেকে কিছু টাকা বের করে দ্বিতীয় লোকটিকে দিয়ে বলল, 'বেবি বোর্ডিং থেকে একজনের ভাত মাছ নিয়ে আয়, এখন যদি মাছ না পাওয়া যায় ডালের সঙ্গে যত ভর্তা পাবি নিয়ে নিবি। দ্বিতীয় লোকটি বেরিয়ে গেলে প্রৌঢ় বলল, 'এদিকে এসো।'

তিনটে ঘরে প্রচুর বই। তারপরে একটা ছোট্ট ঘর তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে, ওপাশে বাথরুম।

প্রৌঢ় বলল, 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে নাও। ভাত খেয়ে এখানেই থালা রেখে দেবে। ওই বোতলে পানি আছে, ভালো পানি। আমরা বাইরে থেকে তালা মেরে যাব, খুলব সাড়ে ন'টায়। চুপচাপ ঘুমিয়ে থেকো আর সাড়ে ন'টার মধ্যে রেডি হয়ে নেবে। তোমার মামা যেন ঘুমোতে না দ্যাখে।'

বাটিতে ভাত-ডাল আর আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, ঢ্যাড়শ ভর্তা নিয়ে এল লোকটা। ওরা বাইরের আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেলে গোগ্রাসে খেয়ে নিল মতিন। মুখহাত ধুয়ে জল খাওয়ার পর মনে পড়ল মা'র কথা। তার এখানে থেকে যাওয়ার কথা নয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে মা।

এখানে ঢোকার সময় প্রথম ঘরে সে টেলিফোন দেখেছিল। কিন্তু অন্ধকারে সে কী করে নাম্বার ডায়াল করবে? অতএব আলো জ্বালতেই হল। তাড়াতাড়িতে প্রথমবার রং নাম্বার হল। দ্বিতীয়বারে বাবার গলা পেয়ে সে বলল, সে আজ ঢাকায় কাজে আটকে গেছে।

ঠিক দশটার সময় কামাল হোসেন এলেন। এই অফিসে তাঁর ঘর আলাদা। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। এসেই ডেকে পাঠালেন মতিনকে। আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাস্তা করেছ?'

'জি না।'

'একদিন নাস্তা না করলে কেউ মরে যায় না।'

ক্ষিদে পেলেও চুপ করে থাকল মতিন।

'তোমার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট নেই?' তাকালেন কামাল হোসেন।

'জি, না।'

'আঃ, জি জি কোরো না তো। মোস্ট ইরিটেটিং। শোনো, আমি তোমাকে এখানে চাকরি দিতে পারব না। কিন্তু একটা সাহায্য করতে পারি। মাস দুয়েক পরে নিউইয়র্কে একটা মেলা হবে যেখানে আমরা অংশগ্রহণ করব। গার্মেন্ট ফেয়ার। তিনজন কর্মচারীকে পাঠাচ্ছি স্টলে থেকে বিক্রি করার জন্যে। তুমি যদি চাও তো তাদের একজন হতে পারো। যাতায়াতের ভাড়া ছাড়া, থাকা-খাওয়ার খরচ আমি দেব। তবে তার জন্যে তোমাকে পাসপোর্ট বের করতে হবে। পাসপোর্ট পেলে ভিসার জন্য আবেদন করবে। আমেরিকার ভিসা পাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার, বাকি দুজন আগে গিয়েছে বলে ওদের অসুবিধে হবে না। মেলা চলবে পাঁচদিন। তারপর ফিরে আসবে সবাই।' কামাল হোসেন বললেন।

'আপনি যা বলবেন।' মতিন একটুও আনন্দিত হচ্ছিল না। এটা কোনও চাকরি নয়।

তারপরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে গেল। বাড়ি ফিরে মামার নির্দেশমতো সব কাগজপত্র জোগাড় করে আবার ঢাকায় গিয়ে ফিরে এল সে। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার তিন সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্টের বই এসে গেল তার দেশের বাড়ির ঠিকানায়। মাকে সব কথা খুলে বলেছিল মতিন। মা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই ওখানে তুই কীরকম কাজ করছিস দেখে কামাল তোকে এখানে চাকরি দেবে। মন দিয়ে কাজ করিস।' কিন্তু তখনই বাবাকে কিছু বলা হল না। মায়ের ভয় হল, জানলে বাবা প্রচণ্ড আপত্তি করবেন। ভিসার জন্যে আবেদন করা হল। মেলা কর্তৃপক্ষ তিনজন কর্মচারীকে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বলে ভিসা পেতেও অসুবিধে হল না। তবে যেদিন ভিসার ইন্টারভিউ হল তার আগের দিন কামাল হোসেনের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে গিয়ে গার্মেন্ট সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানতে হয়েছিল। তার কয়েকটা ভিসা অফিসার জানতে চাওয়ায় উত্তর দিতে অসুবিধে হয়নি মতিনের। সাময়িক ভিসা।

কামাল হোসেন বলেছিলেন, যাওয়ার দুদিন আগে এসে ঢাকায় থাকবে। মেলায় যেসব গার্মেন্টস বিক্রি হবে তা অনেকদিন আগেই জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে, মতিনের বিদেশে যাওয়ার উপযুক্ত পোশাক নেই।

শেষ পর্যন্ত মা বাবাকে খবরটা দিলেন। কিন্তু কামাল হোসেনের নামটা বললেন না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিল মতিন, সুযোগটা পেয়ে গেছে।

বাবা একটু গম্ভীর হলেন, 'কতদিনের জন্য যেতে হবে?'

'সাতদিন।'

'দ্যাখো, ওখানে থেকে যেও না। এখন তো সবাই দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাসন ধুয়ে,কুলিগিরি করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তুমি নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করবে না। যাচ্ছ যাও, দেশটা দেখে এসো।' বাবা বলেছিলেন।

মা খুব খুশি হয়েছিল। বেরুবার সময় জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু কান্নাকাটি করেনি। শুধু বলেছিল, 'ওখানে গিয়ে যদি পারিস অন্তত একবার ফোন করিস।'

এই প্রথম বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া। তার ওপর বিদেশ, হঠাৎ মন খারাপ হওয়া শুরু হল। তার গ্রামের বন্ধুরা খুব উৎসাহিত, কেউ কেউ ঈর্ষাকাতর। যারা ঢাকায় যাওয়া-আসা করে তারা জানে, চাইলেই আমেরিকায় যাওয়ার ভিসা পাওয়া যায় না। যাওয়ার আগের বিকেলে ওদের সঙ্গে দ্যাখা করতে গিয়েছিল সে।

আনোয়ার বলল, 'তুই সত্যি আমেরিকায় যাচ্ছিস? বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি মিথ্যে বলব কেন?'

'আমার চাচার ছেলে শওকত দশ বছর ধরে চেষ্টা করেও ভিসা পায়নি। কেন যাচ্ছে, কবে ফিরবে, কে খরচ দেবে এসব প্রশ্নের উত্তরে খুশি হয় না ওরা।' আনোয়ার বলল।

ইমন মাথা নেড়েছিল, 'একেবারে সত্যি কথা। আমেরিকান ভিসা আছে এরকম পাসপোর্টের দাম কত জানিস? ছয়-সাত লক্ষ টাকা। আর তুই গেলি আর পেয়ে গেলি? তুই কোথাকার বাদশা, বল?'

মতিন বলেছিল, 'আমি কিছু জানি না। মামাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মামার কর্মচারী হয়ে ওখানে যাচ্ছি গার্মেন্টস ফেয়ারে কাজ করতে। কয়েকদিনের জন্যে।'

'ও। তাই বল। ফিরে এসে কী করবি?' ইমন জিজ্ঞাসা করেছিল।

'এখনও জানি না।' মাথা নেড়েছিল মতিন।

মামা কি তোকে চাকরি দেবে এখানে?'

'কিছু বলেনি।'

'তা হলে ফিরিস না।'

'তার মানে?' চমকে উঠেছিল মতিন।

ওর মুখের অবস্থা দেখে সবাই হো-হো করে হেসেছিল।

পাশের বাড়ির জাহাঙ্গির চাচার সঙ্গে বাড়িতে ফেরার সময় দ্যাখা হয়ে গেল। তিনি স্কুলের শিক্ষক, জিগ্যেস করলেন, 'মতিন, তুমি শুনলাম আমেরিকায় যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ চাচা।'

'বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ, চাচা।'

'বাঃ! শুনে ভালো লাগল। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, অনেকেই নাকি অবৈধভাবে সে-দেশ যায়। জাহাজে খালাসির চাকরি নিয়ে সে দেশে পৌঁছে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় ওঠে কিন্তু আর দেশে ফিরতে পারে না। তারা ভাবে সেদেশে গেলে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে। একটা ডলার রোজগার করলে তো সত্তর টাকা হয়ে যাবে। বুঝলে মতিন, ওই টাকার জন্যে সারাজীবনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ওদেশে চোরের মতো থাকতে হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার সুযোগ পায় না। তুমি যে বৈধ কাগজ নিয়ে যাচ্ছ তাতে লাভ এই যে বুক ফুলিয়ে দেশে ফিরতে পারবে।'

জাহাঙ্গির চাচার কথার মধ্যেই ছুটিকে দ্যাখা গেল বাড়ি ফিরতে। জাহাঙ্গির চাচা তাকে বললেন, 'শুনেছিস, মতিনের খবর?'

'শুনব না কেন? গ্রামের সবাই তো শুনেছে। কবে যাওয়া হচ্ছে?'

'কালই ঢাকায় যাব। ওখান থেকে ক'দিন পরে—।'

'কোন শহরে যাচ্ছ?'

'নিউইয়র্ক।'

শোনামাত্র জাহাঙ্গির চাচার দিকে তাকাল ছুটি। জাহাঙ্গির চাচা বললেন, 'তোমরা কথা বলো, আমার একটা জরুরি কাজ আছে।'

তিনি চলে গেলে ছুটি বলল, 'তোমার কাছে একটা উপকার চাইব?'

'আমি যদি পারি তাহলে নিশ্চয়ই করব।'

'তোমাকে একটা ঠিকানা দেব। সেখানে গিয়ে একজনের সঙ্গে দ্যাখা করে জিজ্ঞাসা করবে সে কখনও দেশে ফিরবে কি না?'

'আমি তো সেখানকার রাস্তাঘাট চিনব না। তবে কেউ যদি চিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারি। কিন্তু—।'

ছুটির চোখ ছোট হল। মতিন বলল, 'আমি কোথায় থাকব আর তিনি কোথায় আছেন তাই তো জানি না। আমাকে পৌঁছেই কাজ শুরু করতে হবে। মেলার স্টলে থাকতে হবে সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত। মেলা শেষ হলেই চলে আসব। ভিসার দিন শেষ হয়ে যাবে।'

ছুটি বলল, 'তাহলে থাক। এখান থেকে ফোন করতে অনেক টাকা লাগে। তবু করেছিলাম,

কিন্তু সে তখন বাসায় ছিল না। যে ধরেছিল সে নিশ্চয়ই তাকে আমার ফোনের কথা বলেছিল, তিনটি চিঠি দিয়েছি। উত্তর পাইনি। পেলে তোমায় বলতাম নাকি।'

মতিনের খেয়াল হল। 'আমি তো ওকে টেলিফোন করে বলতে পারি মেলায় এসে আমার সঙ্গে দ্যাখা করতে। উনি এলে প্রশ্নটা জিগ্যেস করব।'

হাসি ফুটল ছুটির মুখে, 'বাঃ, এই সহজ কথাটা আমার মনেই আসেনি। দাঁড়াও, আমি ওর নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে এনে দিচ্ছি।'

দু'মিনিটের মধ্যেই এনে দিয়েছিল ছুটি। নামটা পড়ে চিনতে পারল না মতিন। ছুটির দিকে তাকাতে সে বলল, 'তুমি চিনবে না। আমি যখন নানির বাড়িতে দুই বছর আগে গিয়েছিলাম তখন আলাপ হয়েছিল। মীরপুরে আমার নানি থাকে।' মুখে লালচে রং লাগল ছুটির।

সে আপত্তি করা সত্ত্বেও মা টিনের সুটকেসের সঙ্গে একটা ছোট্ট বিছানা শতরঞ্চিতে মুড়ে বেঁধে দিয়েছিল। সেই বিছানার ভেতরে বাবার পুরোনো অলেস্টার ঢুকিয়ে বলেছিল, 'এখনও নতুন আছে। ব্যবহার করে না তো। তুই নিয়ে যা। পরলেই আমাদের কথা মনে পড়বে।' শুনে বাবা হো হো করে হেসেছিলেন।

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত হাসির কী হয়েছে?'

'এখন সেখানে গরমকাল। আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো গরম। ফাল্গুনে কি আমরা গরমজামা গায়ে চড়াই? আর থাকবে তো মাত্র সাতদিন। ওটা নিয়ে যাওয়া আসাই সার হবে।'

'হোক।' মা বলেছিল, 'কখন কী কাজে লাগে কে বলতে পারে।'

বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি যে যাচ্ছ, হাতে টাকাপয়সা কিছু দিয়েছে?'

মাথা নেড়েছিল মতিন, না।

'দ্যাখো! বিদেশে নিয়ে গিয়ে কাজ করিয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে না দেয়। রাস্তাঘাটে দশ-বিশ টাকা সঙ্গে না রাখলে চলে? তুমি যাওয়ার আগে চেয়ে নেবে।' বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন।

মা বলেছিল, 'চাইলে যদি বলে ওখানে যাওয়ার পরে দেব, তা হলে কি বলবে যাব না? তার চেয়ে তুমি ওর হাতে কিছু দিয়ে দাও।'

'নিশ্চয়ই দিতে পারি, কিন্তু তা ওর কাজে লাগবে না।' বাবা বলেছিলেন।

'কেন?' মা বুঝতে পারল না।'

'আমেরিকায় বাংলাদেশের টাকা কেউ নেবে না। ওখানে ডলার চলে। আমি ডলার কোথায় পাব যে দেব?'

মতিনের মনে পড়ল, ঢাকার রাস্তায় সে দোকানের ওপর লেখা দেখেছে, 'টাকার বদলে বিদেশি মুদ্রা দেওয়া হয়।'

কথাটা জানাতে বাবা মাথা নাড়লেন। তারপর আলমারি খুলে গুণে গুণে টাকা দিয়ে বললেন, 'সংসার খরচের টাকা থেকে দিলাম। বুঝে সুঝে খরচ করবে।'

মা বলল, 'যদি তোর হাতে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা এর থেকে বেঁচে যায় তা হলে একটা ছোট্ট বিলেতি সেন্ট আনিস তো। আমার খুব শখ।'

মতিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

ঢাকার মুদ্রা-বিনিময় দোকানের কর্মী বাবার দেওয়া টাকা গোনার পর বলল, 'নয় ডলার কুড়ি সেন্ট পাবেন। পাসপোর্ট দেখি।'

কামাল সাহেবের ম্যানেজার দু'দিন ধরে মতিনকে পাখি পড়ার মতো করে বোঝালেন

গার্মেন্টসের স্টলে বসে কী কী কাজ করতে হবে। তাকে সতর্ক করে দেওয়া হল, সাহেব মেমরা স্টলে এলে সে যেন কথা না বলে। যা বলার তা বাকি দুজন বলবে। ওরা ইতিমধ্যেই কাজটা করে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে।

কামাল সাহেবের একজন লোক তাকে নিয়ে গেল মীরপুরে। সেখানে সস্তায় শাড়ি, প্যান্ট, গেঞ্জি, সার্ট এবং কোট পাওয়া যায়। মাপ নিয়ে দোকানদার বলল, 'আমার দোকানের মাল নিয়ে কেউ যদি বলে মরা সাহেবের গন্ধ আছে তা হলে আমি তার জুতো মুখে নিয়ে হাঁটব।' মতিনের সন্দেহ হলেও মুখে কিছু বলল না, পোশাকগুলো এমন ঝকঝকে চেহারার যে পুরোনো বলে মনেই হয় না।

যাওয়ার দিন কামাল সাহেব তার চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বসো।'

মতিন বসল। কামালভাই বললেন, 'এই যে আজ তুমি আমেরিকা যাবে তা যে আমি ব্যবস্থা করেছি বলেই সম্ভব হচ্ছে তা তোমার মা-বাপ জানে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মতিন।

'তোমার বাপ তো আমাকে এমন অপছন্দ করে যে নামও মুখে নেয় না। অক্ষমের অহংকার! আমি যা করেছি তা তোমার মায়ের কথা ভেবে। যাক গে, ওখানে গিয়ে দলের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু যেদিন মেলা শেষ হয়ে যাবে সেদিন একটু ঘুরতে পার। আমার পরিচিত একটি লোক নাম মুর্শেদ, তোমাকে নিউইয়র্ক শহর ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।' কামাল সাহেব একটু থামলেন, 'তোমার জন্যে যা করলাম তার মূল্য বুঝতে পেরেছ?'

মতিন চুপ করে রইল। সে কী উত্তর দিতে পারে।

'কোটি কোটি টাকার মালিকের ছেলে অনেক চেষ্টা করেও আমেরিকান ভিসা পাচ্ছে না। আর তোমার মতো একটা বেকার ছেলেকে আমি সেখানে যাওয়ার সুযোগ করে দিলাম। আশা করি সারাজীবন কথাটা মনে রাখবে। আর হ্যাঁ, ফিরে এসে দয়া করে আমার কাছে চাকরি চেয়ে ঘ্যানঘ্যান করবে না। যদি আসো, তাহলে জেনো আমার দারোয়ান তোমাকে ঢুকতে দেবে না। যাও।'

মতিনের দুই সঙ্গী তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। দুজনেই বিবাহিত, ছেলে-মেয়ে আছে। একজনের নাম শাজাহান, দ্বিতীয়জনের নাম জিয়াউদ্দিন। অফিসের গাড়িতে তাদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে এল মতিন। ডানহাতে টিনের সুটকেস, বাঁ হাতে শতরঞ্চিতে মোড়া বেডিং। এগুলো নিয়ে গাড়িতে ওঠার পরই শাজাহান চোখ কপালে তুলেছিল, 'আরে, তুমি ওই বেডিং বগলে নিয়ে আমেরিকায় যাবে নাকি?'

'ওখানে শোওয়ার জন্যে—।' বিড়বিড় করেছিল মতিন।

জিয়া বলেছিল, 'সব আছে, কোনও চিন্তা নেই। ওটা রেখে যাও।'

প্রায় বাধ্য হয়ে বেডিং খুলে বাবার গরমের পোশাক বের করেছিল সে। তাই দেখে আর এক প্রস্থ হাসাহাসির পর শাজাহান বলল, 'ওটা হাতে ঝুলিয়ে নাও। রেখে গেলেই ভালো করতে, কাজে তো লাগবে না।'

জিয়া হাসল, 'টিনের সুটকেসে প্লেনে খাওয়ার জন্যে চিড়ে মুড়ি নিয়েছ তো? প্রায় একদিনের রাস্তা, বেশি থাকলে আমাদের দিও।'

মাথা নেড়ে না বলল মতিন। জিজ্ঞাসা করল, 'এয়ারপোর্টে ওসব কি কেনা যায় না?'

দুজনেই হেসে উঠল। বলল, 'আমরা কি ট্রেনে যাচ্ছি যে খাবার নিতে হবে? প্লেনে এত খাবার দেবে যে তুমি খেতে পারবে না।'

গাড়িটা যখন এয়ারপোর্টের গেটের দিকে এগোচ্ছিল তখন একটা লম্বা লাইন দেখতে পেল

মতিন। বেশিরভাগ ছেলের বয়স একুশ-বাইশের বেশি নয়। পরনে শার্ট আর পাজামা। কেউ কেউ জিনস পরে থাকলেও তা যে বেশ সস্তার তা বোঝা যাচ্ছে। ওদের হাতে সস্তার সুটকেস এবং শতরঞ্চির বেডিং। এরা কোথায় যাচ্ছে?

জিয়া বলল, 'সবাই মিডল ইস্টে যাচ্ছে চাকরি করতে। যা মাইনে পাবে তার অর্ধেক দালাল নিয়ে নেবে। দেশে কবে ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। কিন্তু এখানকার বাসার লোকের রোজগার বাড়বে।'

বোর্ডিং কার্ড নিয়ে শাজাহন তাদের একটা ফর্ম দিল, 'ভরে নাও।'

ফর্মের একদিকে বাংলা, অন্যদিকে ইংরেজি। দেখে দেখে যা জানতে চায় তা লেখার পর দুটো জায়গায় আটকে গেল মতিন। এক, কী কাজে যাচ্ছে, দুই যেখানে যাচ্ছে সেখানকার ঠিকানা। শাজাহান ঝটপট লিখে দিল।

ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট দেওয়ার পর অফিসার একবার তাকে দেখে আমেরিকার ভিসাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ছাপ মারলেন বেশ জোরে, কিন্তু তাকে কোনও প্রশ্ন করলেন না। ওরা বিশাল হল ঘরে এসে নানান ধরনের দোকান দেখতে পেল। তারপর লম্বা করিডোরের গায়ে নাম্বার লাগানো পরপর গেট।

একটা গেটের সামনে বিভিন্ন বয়সি মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় ওরা গ্রাম থেকে এসেছে। কারও কারও চুল থেকে তেল গড়িয়ে আসছে কানের পাশ দিয়ে। মতিন লক্ষ্য করল, প্রত্যেকেই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে কাগজপত্র আর ব্যাগ হাতে নিয়ে।

জিয়া বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমরা বিড়ি খেয়ে আসি।'

'এখানে খাওয়া যাবে না?'

'বাপস! সোজা জেলে পাঠিয়ে দেবে। প্লেনেও খাওয়া চলবে না। আসছি।'

ওরা চলে গেলে মতিন চারপাশে তাকাল। সে বাংলাদেশে রয়েছে কিন্তু এখানকার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। গ্রাম থেকে ঢাকায় এলে প্রথম প্রথম যে চমক জাগত সেটাও ম্লান হয়ে গেল এখানে এসে। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। সামনের লাইনের সবশেষে রোগা চেহারার যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে হাসল মতিন। ছেলেটি কোনও সাড়া দিল না।

ছেলেটির পাশে গিয়ে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'মালোসিয়া।' নামটা ছোট করে বলল ছেলেটি।

'মালোসিয়া?'

'হ্যাঁ। চাকরি পেয়েছি।' বেশ গম্ভীর গলায় বলল ছেলেটি।

'কী চাকরি?'

'কারখানায়।'

এইসময় একটি লোক এগিয়ে এল, 'কিছু বলবেন ভাই?'

'না।' সরে গেল মতিন।

পরে জিয়া বলেছিল, রোজ প্রচুর ছেলেকে মালয়েশিয়া, আরব দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশিরভাগ ছেলে যাচ্ছে শ্রমিকের কাজ নিয়ে। কেউ কেউ খারাপ কথা বললেও এর ফলে দেশের বেকার ছেলের সংখ্যা যে কমে যাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জিয়া এবং শাজাহানের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ, সুটকেস সার্চ করিয়ে আর-একটা ঘরে ঢুকল মতিন। জিয়া বলল, এরপরে আমাদের প্লেনে ওঠার জন্যে ডাকবে। এই ঘর থেকে বের হলেই মনে করবে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেলে।'

'কেন? প্লেন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে!' মতিন বলল।

'প্লেনের ভেতর ঢোকার পর সেটা একদম মনে হবে না।' জিয়া বলল। এরপর ওরা প্লেনের

ভেতর ঢুকে গেল। ঢোকার পর মতিন স্তম্ভিত। একটা লম্বা স্বপ্ন স্বপ্ন ঘর। আলো বেরিয়ে আসছে ওপর থেকে। ওরা তিনজন পাশাপাশি চেয়ারে বসল। তার আগে পেছনে অনেক সারি। ক্রমশ ভরতি হয়ে গেল প্লেনটা। মতিন জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আলো দ্যাখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে প্লেন। সুন্দরী মেয়েরা, যারা তদারকি করছে যাত্রীদের, তাদের বেশ সুন্দরী মনে হল মতিনের। তাদের গ্রামের যেসব মেয়ে সুন্দরী তারা এদের মতো স্মার্ট নয়, এয়ারহোস্টেস এসে বাংলায় বলল কোমরের বেল্ট বেঁধে নিতে। ওটাকে কবজা করতে অসুবিধে হচ্ছিল মতিনের। জিয়া তাকে সাহায্য করল। বলল, 'প্লেন যদি ঝাঁকায় তা হলে বেল্ট থাকলে চোট খাবে না। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়লে তো প্লেন ঝাঁকাতেই পারে।'

'সর্বনাশ।' মতিন হাসল।

'তুমি সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে?'

'তার মধ্যে ফিরতে আমি বাধ্য।'

'তা ঠিক। এই সাতদিনের জন্য কত তোমাকে কামাল ভাই দিচ্ছে?'

মাথা নাড়ল মতিন, 'না। কিছুই দেবে না।'

'শালা হারামি!' চাপা গলায় বলল জিয়া। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই প্লেন গর্জে উঠল। বিশাল প্লেন, অনেকক্ষণ মাটির ওপর দিয়ে ছোটার পর আচমকা আকাশে ডানা মেলল প্লেন।

নীচের দিকে তাকানো হল না। মতিন চোখ বন্ধ করল। সে বাংলাদেশ ছেড়ে তখন আকাশে।

মাঝখানে একবার মাটি ছুঁয়ে আবার আকাশে উড়ছিল প্লেন। মতিন অবাক হয়ে মানুষগুলোকে দেখছিল। এত মানুষ পাশাপাশি বসে যাচ্ছে কিন্তু ঝগড়া দূরের কথা কেউ চেঁচিয়েও কথা বলছে না। এয়ারহোস্টেসরা প্রায় নিঃশব্দে খাবার দিয়ে যাচ্ছে এবং যাত্রীরা খাবার নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাচ্ছে না। টয়লেটের সামনে লোক লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে কিন্তু আগে ঢোকার চেষ্টা করছে না। মানুষের এত ভালো আচরণ সে কোনওদিন দ্যাখেনি। কেউ সিগারেট দূরের কথা, পান খেয়ে পিক ফেলছে না। এই মানুষগুলোই কি মাটিতে নামার পর অন্যরকম হয়ে যাবে।

জিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'আরে ভাই, এমনি চুপ করে আছে নাকি? ভয় আছে প্রত্যেকের মনে।'

'কীসের ভয়?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'মাটি থেকে কম-সে-কম পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে। যদি ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায় তাহলে যা হবে তাই ভেবে ভয় পাচ্ছে সবাই। কিন্তু মুখে সেটা বলছে না।'

জিয়ার কথা শোনার পর মতিনের খেয়াল হল। সিট বেল্ট আঁকড়ে বসল সে। তার পরেই হেসে ফেলল। আকাশ থেকে মাটিতে যদি প্লেন আছড়ে পড়ে তা হলে সিট বেল্ট কী করে বাঁচাবে?

এই যে এত মানুষ প্রতিটি সিটে বেল্ট-বন্দি হয়ে বসে আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে প্লেনটা যদি শোঁ-শোঁ করে নীচের দিকে নেমে পড়ে তাহলে কারও কিছু করার নেই। আমেরিকা যাওয়ার সময় বড় বড় সমুদ্র পার হতে হয়, তার একটার বুকে যদি প্লেনটা ঢুকে পড়ে তাহলে দমবন্ধ হয়েই মরে যেতে হবে সবাইকে। আবার মাটিতে আছাড় খেলে বোঝার আগেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। শরীরে শিরশিরানি অনুভব করল মতিন। নৌকো ডুবছে দেখে লাফিয়ে জলে নামা যায়। বাস বা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়লে বাঁচার একটু হলেও সুযোগ থাকে। প্লেনের বেলায় তার বিন্দুমাত্র নেই। আল্লার ওপর ভরসা রাখা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

মতিন বাড়াবাড়ি রকমের ধর্মাচরণ করে না। এইজন্যে ঠাকুমা থাকতে খুব ঝামেলা হত। বাবা-মা চাপ দিতেন না। দৈনন্দিন নামাজ পড়া এবং রোজা মেনে চলা ছাড়া বাড়তি কিছু করেনি

সে। মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে গেলে সেটুকুও করা হয় না। তবে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কখনও রোজার মাসে দিনের বেলায় খেয়েছে বলে মনে পড়ে না।

মতিন চারপাশে তাকাল, দেখে মনে হল কেউ তার মতো ভাবছে না। এয়ারহোস্টেস এসে পানীয় কী লাগবে জিজ্ঞাসা করতে যে যার পছন্দ বলে নিয়ে নিল। পাশে বসা জিয়া জিজ্ঞাসা করল 'হুইস্কি আছে?'

এয়ারহোস্টেস বলল, 'আছে'।

'তাহলে দ্যান, দুইজনকে দুটা।' জিয়া মতিনকে দেখিয়ে দিল।

'পানি না বরফ?'

'পানি।'

'দু-দুটো লাল সোনালি রঙের টলটলে তরল পদার্থ জিয়ার সামনে ট্রে টেনে রেখে দিল এয়ারহোস্টেস। তারপর পেছনের দিকে এগিয়ে গেল। ওপাশ থেকে শাজাহান বললে, 'একী? আমাকে দেবে না?'

জিয়া মাথা নাড়ল, 'ওই যে বাঁ-দিক দিয়ে যে আসছে তার দায়িত্ব তোকে সেবা করার,' বলে হাসতে লাগল।

মতিন খুব অস্বস্তিতে পড়ল, সে কখনও মদ্যপান করেনি। মদ্যপান করা অত্যন্ত অন্যায় বলেই সে জেনেছে। কিন্তু জিয়াভাই তার জন্যে মদ নিল কেন? জিয়া গ্লাসে চুমুক দিল। মুখ ফিরিয়ে ওপাশের ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল মতিন। তাকে যখন এয়ারহোস্টেস জিজ্ঞাসা করেছিল তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'অ্যাপেল জুস।'

মতিন জিয়াকে বলল, 'জিয়াভাই, আমার জন্যে আপেলের জুস বলেন না!'

জিয়া মাথা নাড়ল, 'আর দেবে না।'

'কেন?'

'মাগনায় দিচ্ছে। তোমাকে একবার হুইস্কি দিলে অন্য কিছু দেবে না'।

'কিন্তু আমি তো হুইস্কি খাই না।' বলতে বলতে মতিন দেখল, শাজাহানও হুইস্কির গ্লাস নিয়েছে।

'জানি। তাই তো তোমারটা আমি নিয়ে নিলাম।'

'আপনি একাই দুইটা খাবেন?' চমকে উঠল মতিন।

ফিক ফিক হাসি হাসল জিয়া, 'আরে ব্রাদার! আমি এরকম দশ গ্লাস খেতে পারি। তা ছাড়া আপেল জুস যে শুধু আপেলের রস তা আমার মনে হয় না। এক-দু চামচ ভদকা মিশিয়েও দিতে পারে। ভদকা কি জান?'

'না।' মাথা নাড়ল মতিন।

'এক ধরনের সাদা মদ।' জিয়া নিজের গ্লাস শেষ করল।

মজার ব্যাপার। একটুও গরম নেই, আরামে বসে থাকা যাচ্ছে। তার ওপর বিনা পয়সায় মদ, জুস আর অদ্ভুত সব খাবার দিচ্ছে। এরকম মাখন আর চিজের টুকরো প্যাকেট মতিন কখনও দ্যাখেনি। কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার খাবার। মতিন অনুমান করল তার প্লেনের ভাড়া বাবদ অনেক টাকা দিতে হয়েছে মামা কামাল হোসেনকে। তার ওপর কি খাটতে হবে বলে টাকা চাওয়া যায়?

জিয়া তাকে দেখিয়ে দিল, কীভাবে টিভির সিনেমা দেখতে হয়। ইংরেজি ছাড়া হিন্দিতেও সিনেমা হচ্ছে। বোঝার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা অনেক সহজ। কিন্তু তবু ইংরেজি ছবি দেখতে লাগল মতিন। বিদেশে যাওয়ার পরে তো সবসময় ইংরেজি শুনতে হবে। এখান থেকেই কানে শোনার অভ্যেস হয়ে থাকা উচিত।

*

মাঝে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, জিয়ার ডাকে সোজা হয়ে শুনল, একটু পরেই প্লেন নামবে। সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে বাইরের কিছু দ্যাখা যাচ্ছে না। কিন্তু প্লেনটা যে নীচের দিকে নামছে তা বোঝা যাচ্ছে। তারপর একসময় ঝাঁকুনি খেল সবাই। প্লেন মাটিতে নেমেছে, চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে।

জিয়াদের পেছন পেছন হাত ব্যাগ নিয়ে প্লেন থেকে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকল সে। অনেকটা যাওয়ার পর সিঁড়ি ভেঙে এবং উঠে যে জায়গায় পৌঁছাল সেটা একটা বিশাল হলঘর। এঁকে বেঁকে মানুষের লাইন চলে গিয়েছে বিভিন্ন কাউন্টারের দিকে। প্রায় আশিজন লোকের পেছনে দাঁড়াল ওরা।

জিয়া মতিনকে বলল, 'ওই কাউন্টারে গিয়ে পাসপোর্ট ভিসা দেখাতে হবে। আমরা কেন এসেছি, কতদিন এদেশে থাকব জানতে চাইবে। আমাদের উত্তর পেয়ে খুশি হলে দেশে ঢুকতে দেবে।'

'আমি কী বলব?' কীরকম অসহায় লাগল মতিনের।

'তোমাকে যা শেখানো হয়েছে তাই বলবে। পাসপোর্ট আর যে কাগজটা তোমাকে দ্যাখাতে বলা হয়েছিল সেটা বের করে হাতে রাখো।' শাজাহান বলল।

কত মানুষ। মতিনের মনে হল, হাজার হাজার। সাপের লাইন বানিয়ে এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগের গায়ের রং কালো বা শ্যামলা। সাদাও আছে অবশ্য। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ কি রোজ এভাবে ছুটে আসে আমেরিকায় ঢোকার জন্য?

কথাটা জিজ্ঞাসা করল জিয়াকে। জিয়া বলল, 'দুর। গতবার আমরা এসেছিলাম দিনের বেলায়। তখনও এরকম লাইন ছিল। সারাদিন-রাত একই রকমের ভিড়।'

'সবাইকে ঢুকতে দেয়?'

'পাগল। কাগজপত্র ঠিক না থাকলে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।'

'কিন্তু জিয়া ভাই—?'

'আবার কী হল?'

'তোমাকে যা প্রশ্ন করেছিল, তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

'আন্দাজ করেছিলাম।'

'জবাব দিতে পেরেছিলে?'

'পাগল! ইংরেজি মাথাতেই আসেনি। ইশারায় বুঝিয়েছিলাম।'

'আমি কী করব?' মতিন অসহায় বোধ করল।

'আমরা যা করব, তাই করবে। আমরা যেহেতু আগে দাঁড়িয়েছি তাই প্রথমে আমাদের ডাকবে। তখন ভালো করে লক্ষ্য করবে!' শাহাজান আশ্বস্ত করল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা কাউন্টারের কাছাকাছি পৌঁছাল। প্রথমে জিয়া এগিয়ে গেল। একটা কালো সাহেব কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে তার পাসপোর্ট পরীক্ষা করল। তারপর কিছু প্রশ্ন করলে জিয়া কাগজটা বের করে সামনে ধরল। অফিসার সেটা পড়ে তাকে প্রশ্ন করলে জিয়া মাথা নাড়তে লাগল। তা সত্ত্বেও অফিসার প্রশ্ন করছে দেখে লাইনে দাঁড়ানো বাকি দুজনকে দেখিয়ে দিল। তাকে খানিকটা দূরে দাঁড়াতে ইশারা করল অফিসার। তারপরে শাজাহানকে ডাকল। শাজাহানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। তাকে জিয়ার পাশে দাঁড়াতে বলে মতিনকে ইশারা করল এগিয়ে যেতে।

'আইডি?' অফিসার হাত বাড়াল।

কিছু বুঝতে না পারলেও একটু আগে দেখার অভিজ্ঞতায় পাসপোর্ট এগিয়ে দিল মতিন।

সেটাকে নানান রকম পরীক্ষা করে অফিসার বলল, 'বাংলাদেশ?'

'ইয়ের স্যার।' চট করে বলে কাগজটা এগিয়ে দিল মতিন।

সেটাতে চোখ বুলিয়ে অফিসার জিগ্যেস করল, 'ইউ উইল লিভ হিয়ার?'

'নো।' প্রবল মাথা নাড়ল মতিন।

'হোয়েন ইউ উইল গো ব্যাক বাংলাদেশ?'

'আফটার দি মেলা!'

হাসল অফিসার। তারপর তিনটি পাসপোর্টেই ছাপ মেরে দিল।

ইমিগ্রেশনের বেড়া ডিঙিয়ে জিয়া বলল, 'তুমি ইংরেজিতে কথা বললে?'

খুব গর্ব হচ্ছিল মতিনের। সে কিছু না বলে হাসল।

শাজাহান বলল, 'একেই বলে ছুপা রুস্তম।'

মতিনের খেয়াল হল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'কিন্তু আমাদের ব্যাগগুলো কোথায়? এখানেই পাওয়া যাওয়ার কথা তো!'

পাওয়া গেল। বেল্ট থেকে ব্যাগ, টিনের সুটকেস, তুলে নিল ওরা। মজা লাগছিল মতিনের। সেই কোথায় ঢাকা বিমানবন্দরে এগুলো জমা দিয়েছিল সে, ঠিকঠাক চলে এল হাজার হাজার মাইল দূরের শহরে।'

যাত্রীরা একটা গর্তে ডলার ফেলে ট্রলি বের করে তার ওপর মালপত্র তুলে বের হচ্ছিল। জিয়া মাথা নাড়ল, 'এমন কিছু ভারী না। আমারটা আমি বইব।'

শাজাহান বলল, 'হ্যাঁ। ফালতু পাঁচ ডলার দিয়ে ট্রলি নেওয়ার দরকার নেই।'

পাঁচ ডলার মানে বাংলাদেশের তিনশো পঞ্চাশ টাকা। অত টাকা দিতে হয় একটা ট্রলির জন্য? ঢাকায় তো বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। একথা বলতে জিয়া হাসল, 'এরা তো খুব গরীব। তাই এইভাবে রোজগার করে।'

কাস্টমস লেখা জায়গাটা দিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে এল তখন দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসাররা কিছুই বলল না। কিন্তু দুজন হেসে মতিনের দিকে তাকিয়ে। তাদের নজর ওর বাঁ-হাতে ধরা টিনের সুটকেসের দিকে। জিয়া বলল, 'তোমার টিনের সুটকেস দেখে ওরা মজা পাচ্ছে।'

'কেন?'

'এ জিনিস আমেরিকায় বোধহয় দেখতে পাওয়া যায় না।'

গম্ভীর হল মতিন। কী করবে সে, মায়ের মুখের ওপর কিছু বলা যায় না।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে পেল সে। একটা রেলিং-এর ওপারে অনেক মানুষ অপেক্ষা করে আছে পরিচিত যারা আসছে তাদের জন্যে। মতিন দেখল এদের বেশিরভাগই ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তানের মানুষ।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াতেই প্রচুর দামি দামি গাড়ি দেখতে পেল মতিন। বাইরে যতটা নজর যাচ্ছে তার সঙ্গে ঢাকা বিমানবন্দরের বাইরের রাস্তার কোনও মিল নেই। এই হল নিউ ইয়র্ক, আমেরিকায় সবচেয়ে নামকরা জায়গা। কথাটা মনে আসা মাত্রই সে পুলকিত হল। সে এখন আমেরিকায়।

'সালাম আলাইকুম!' একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

'আলেকুম সালাম।' জিয়া বলল।

'ঢাকা থেকে আসছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'জিয়া ভাই, শাজাহান ভাই—!'

'হ্যাঁ। আমরা। আপনি?'

'আমার নাম মুর্শেদ। গতবছর যখন আপনারা এসেছিলেন আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলাম। আপনি তা হলে মতিন ভাই?' মুর্শেদ জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল মতিন। মুখে কিছু বলল না।

'কালই কামালসাহেব কল দিয়েছিলেন। আপনাদের এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়ার অর্ডার দিলেন।' মুর্শেদ বলল।

'অর্ডার?' শাজাহান অবাক হল।

'ওই আর কী। মালিক যা বলেন কর্মচারীদের কাছে তা অর্ডার ছাড়া আর কী! এখানে দাঁড়ান, আমি পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি।' মুর্শেদ কথা শেষ করেই চলে গেল।

জিয়া বলল, 'এর কথাই কামালভাই বলেছিলেন। মাল তো বেশ চালু।'

'বলল তো কামালভাই-এর কর্মচারী। সাহেব বলল। তাহলে এখানেও কামালভাই-এর ব্যাবসা আছে। আগের বার বুঝতে পারিনি।' শাজাহান বলল।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মুর্শেদ। ডিকিতে মালপত্র রাখার পর জিয়া সামনের সিটে উঠে বসল। পেছনে ওরা। মুর্শেদ ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, 'সকলে বেল্ট বেঁধে ফেলুন নইলে ফাইন দিতে হবে।'

শাজাহান জিজ্ঞাসা করল, 'পেছনে বসলেও বেল্ট বাঁধতে হবে?'

'হ্যাঁ। আগেরবার কোনও গাড়িতে ওঠেননি?'

'না।'

বেশ পরিশ্রম করে বেল্ট বাঁধল মতিন। তারপর কৌতূহলী চোখে চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রাস্তাটা চওড়া হয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিক দিয়ে গাড়ির পর গাড়ি যাচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে গাড়ি আসছে। ঢাকার রাস্তায় যেসব রিকশা দ্যাখা যায় তাদের একটাকেও চোখে পড়ছে না।

জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তো জ্যামাইকাতে থাকব?'

'না। আগেরবার ওখানে ছিলেন, তাই না?' মুর্শেদ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল।

'হ্যাঁ। আকবর ভাই-এর বাসায়।' জিয়া জবাব দিল।

'আকবর ভাই ওই বাড়ি ছেড়ে ব্রংকসে চলে গেছে। আপনারা থাকবেন জ্যাকসন হাইটে।'

মুর্শেদ গাড়ি হাইওয়ে থেকে সরিয়ে ডানদিকের একটা সরু রাস্তায় নামিয়ে আনল। এবার দুদিকে ছবির মতো বাড়ি, দোকান দেখতে পেল মতিন।

তিনজনের শোওয়ার ব্যবস্থা একই ঘরে। মাঝে কিচেন এবং টয়লেট।

মুর্শেদ ওদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিজের ফোন নাম্বার দিল, 'আজ আপনারা রেস্ট নিন। সামনেই বাজার আছে। নিজেরাই রান্না করে খেতে পারেন। ইচ্ছে না থাকলে নীচে নামলেই প্রচুর বাংলা রেস্টুরেন্ট পাবেন। একটু খরচ বেশি পড়বে।'

'মেলার জায়গাটা এখান থেকে কতদূরে?'

'মাত্র তিনটে ব্লক দূরে। হেঁটেই যেতে পারবেন। আপনাদের মালপত্র এসে গেছে। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব ওখানে। বেলা বারোটার মধ্যে স্টল সাজিয়ে ফেলবেন। একটার সময় মেলার উদ্বোধন।

আচ্ছা, চলি।' মুর্শেদ চলে গেল।

জিয়া বলল, 'এটা কী হল? আগেরবার তো আকবর ভাই-এর বাসা থেকে দু'বেলা খাবার দিত। বাজার করে খেতে গেলেও তো ডলার লাগবে।'

শাজাহান ততক্ষণে কিচেনে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে সব আছে। লবন, চিনি, চাল, ডাল, আলু, তেল, গ্যাস, থালা-বাসন, গ্লাস। ফ্রিজে কিছু আছে কি না দেখি।'

তার কিছু পরেই তার গলায় উল্লাস শোনা গেল, 'অ্যাই বাপ। ফ্রিজে ডিম আছে দশ-বারোটা, চিকেন আছে, কিন্তু মাছ নেই।'

অবাক হয়ে শুনছিল মতিন।

জিয়া বলল, 'তা হলে সমস্যা নেই, ভাত আর মুরগির মাংস হোক।'

বাইরে বেরিয়ে এল শাজাহান, 'কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা। আমি একটু পরে হাত লাগাচ্ছি, তোমরা কিনে আনো।'

'ডলারে কিনতে হবে তো!' জিয়া বলল।

'দ্যাখো যদি বাংলাদেশের টাকা নেয়।' জোরে হাসল শাজাহান।

জিয়া তাকাল মতিনের দিকে, 'তোমার কাছে কত ডলার আছে?'

'নয় ডলার কুড়ি সেন্ট!' মতিন উত্তর দিল।

'অ্যাঁ? মাত্র নয় ডলার নিয়ে তুমি আমেরিকা এসেছ?'

মতিন বুঝল, ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। সে মুখ নামাল।

'কামালভাই কিছু দেয়নি?' শাজাহান জিজ্ঞাসা করে।

'না। বলেছেন, মেলা শেষ হলে মুর্শেদভাই ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন।'

জিয়া বলল, 'তাই দেখো। চলো।'

জিয়ার সঙ্গে দোতলা থেকে বেরিয়ে পিচের রাস্তায় নেমে এল মতিন। এখনও বেলা হয়নি। বেশিরভাগ দোকান খুলব খুলব করছে। কিছুটা হাঁটার পর দুটো মাঝবয়সি লোককে বাংলায় কথা বলতে শুনল মতিন। আমেরিকার রাস্তায় মানুষ বাংলায় কথা বলে নাকি? জিয়া লোকটার পাশে দাঁড়াল, 'ভাই বাজারটা কোনখানে?'

'কী কিনবেন? মাছ, মাংস, না সবজি?'

'পেঁয়াজ, রসুন—।'

'ও। ওই পাশের রাস্তায় যান। কোন জেলা?'

'ঢাকা।' জিয়া জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকদুটো প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠল। জিয়া বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসির কী আছে?'

'রাগ করবেন না ভাই।' দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'যাকে জিজ্ঞাসা করি কোন জেলার লোক সেই জবাব দেয়, ঢাকা। যেন ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশে আর কোনও জেলা নেই। মৈমনসিং, ফরিদপুর বাদ দিন, সিলেটের লোকও বলে ঢাকা। রাজধানীর নাম বললে সম্মান বাড়ে বোধহয়।'

জিয়া আর দাঁড়াল না। হাঁটতে লাগল মতিনের সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ওই শালাদের কাজ নাই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফক্কড়ি মারছে। আরে, আমি যদি বলতাম নরসিন্দিতে জন্ম, তাহলে হয়তো জিজ্ঞাসা করত সেটা কোথায়? তার চেয়ে ঢাকা বললে কোনও প্রশ্ন আসবে না। মিথ্যা কথা তো না, আমি বহুবছর ঢাকায় আছি।'

মতিনের মনে হল জিয়ার মনে লোকটার কথা লেগেছে।

ফুটপাথের ওপর বেঞ্চিতে রাখা বড় বড় ঝুড়িতে ওগুলো সাজানো আছে। এত স্বাস্থ্যবান,

নিটোল কালচে নীল লম্বা বেগুন কখনও দ্যাখেনি মতিন। একটার ওজন সাড়ে সাতশো গ্রাম হবে। টমেটোগুলির সাইজ কী বড়! কী নেই ঝুড়িগুলোতে, পেঁয়াজ, আলু, আদা, রসুন থেকে শুরু করে ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সব। ফুলকপির মতো দেখতে হালকা নীল সবজিটার নাম ব্রকোলি, ওপরে লেখা আছে। এই সবজি গ্রামের হাটে বিক্রি হয় না। বাস্কেটে মাল তুলে দোকানের ভেতর গিয়ে দাম দিলে ওরা প্যাকেটে ভরে দেবে। জিয়া শাজাহানের নির্দেশ পালন করছিল। কিন্তু মতিন বলল, 'জিয়া ভাই একটা বেগুন নেন। এত বিশাল, এত মসৃণ বেগুন আমি কখনও দেখিনি।'

'দ্যাখো না, প্রাণভরে দ্যাখো। বাসায় নিয়ে গেলে বেগুনভর্তা কি তুমি বানাবে?' কথাটা বলল বটে তবু জিয়া একটা বড় সাইজের বেগুন তুলে নিল। দোকানে ঢোকার মুখে একটা ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে জিয়া বলল, 'এই দ্যাখো, লাল শাক। কী তাজা। আই বাপ! এক আঁটির দাম দু-ডলার। মানে দেড়শো টাকা। ভাবা যায়? দেশে শাকওয়ালা দশটাকা চাইলেই ঝগড়া বেঁধে যাবে।'

কাউন্টারে লোকটা যোগ করে জানাল, দুই ডলার কুড়ি সেন্ট দিতে হবে। জিয়া মাথা নাড়ল, 'দিয়া দাও।'

পার্সের মধ্যে যত্নে রাখা ডলারের নোট এবং কয়েন বের করে দাম মিটিয়ে দিল মতিন। এখন তার সঞ্চয়ে মাত্র সাত ডলার পড়ে রইল।

বেগুন দেখে উল্লসিত শাজহান। বলল, 'কী সুন্দর দেখতে, কাটতে মায়া হবে! এটায় আমাদের দুদিন চলে যাবে। রাত্রে ভর্তা করব।'

'আমাকে একটা ভাজা দেবেন?' মতিন না বলে পারল না।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বেশ অনিচ্ছায় বলল শাজাহান।

স্নান করার পরেই সমস্যায় পড়ল মতিন। মাথা ঘুরছে, শরীরটা কেমন কেমন। সে শুয়ে পড়ল তাকে বরাদ্দ করা বিছানায়।

জিয়া বলল, 'ওরকম হয়। প্রথমবার প্লেনে উড়ে এসে আমারও হয়েছিল। শাজাহানভাই-এর হয়নি। ঘুমাবার চেষ্টা করো। ভাত খেলে সেরে যাবে।'

চোখ বন্ধ করা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না। শরীরের ভেতরে যেন ঢেউ দুলছে। মতিন ভাবতে চেষ্টা করল। সে এখন আমেরিকায় এক বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছে। বাংলাদেশ থেকে কত দূরে? সাতসমুদ্র তেরো নদী তো বটেই হাজার হাজার মাইল মাটি এবং মরুভূমি পার হতে হবে সেখানে হেঁটে যেতে হলে। মন কেমন করছিল তার।

সারাটা দিন আধোঘুম আধোজাগরণে কেটেছিল মতিনের। মাঝে শাজাহান তাকে জোর করে তুলে খাইয়ে দিয়েছিল খানিকটা। সন্ধের পরে ঘুম থেকে উঠে সে আবিষ্কার করে ঘরে কেউ নেই। সে অন্ধকারে শুয়ে আছে। ঝটপটিয়ে উঠে আলো জ্বালতেই বুঝতে পারল ওরা বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল? দরজাটা বন্ধ। কিন্তু ভেতর থেকে নয়। ঠেলতেই বোঝা গেল নড়বে না। হাতল ঘুরিয়েও খোলা গেল না। নিশ্চয়ই বাইরে থেকে চাবি দিয়ে গিয়েছে। তার ঘুম ওরা ভাঙাতে পারেনি বা ভাঙাতে চায়নি।

টয়লেট থেকে মুখ ধুয়ে এসে মাথায় হাত দিল মতিন, এখন কী করা যায়? আর তখনই দরজায় শব্দ হল। কেউ টোকা মারছে কিন্তু বেশ জোরে। মতিন এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ওদের দুজন নয়। ওরা এলে চাবি খুলেই ঢুকবে। আবার শব্দ হলে সে সাড়া না দিয়ে পারল না, 'কে?'

কেউ কিছু বলল। কিন্তু মতিনের কাছে স্পষ্ট হল না।

এবার বাইরে শব্দ হল। তারপরই দরজাটা খুলে গেল। মতিন দেখল তার কাছাকাছি বয়সের

একটি মেয়ে অবাক চোখে তাকে দেখছে, 'হু আর ইউ?'

'মাই নেম ইজ মতিন। ফ্রম বাংলাদেশ।'

মেয়েটির ঠোঁটে হাসি ফুটল। ওর পরনে জিনস আর টপ। চুল কাঁধ পর্যন্ত। মেয়েটি এবার জিজ্ঞাসা করল পরিষ্কার বাংলায়, 'আপনাকে ভেতের রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কেউ গিয়েছে। তালা দেওয়া থাকলে আমার সন্দেহ হত না। মনে হচ্ছিল ভেতরে লোক আছে অথচ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ঠিক আছে—।'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াতেই মতিন বলল, 'আপনার নাম?'

'টিয়া। পাশের ফ্ল্যাটে থাকি।'

'অনেক দিন আছেন?'

'আড়াই বছর। আপনি আজ এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী জন্যে এসেছেন? বেড়াতে নিশ্চয়ই না।'

'কাজে। গার্মেন্টস মেলা হবে, সেখানে গার্মেন্টস বিক্রি করতে হবে।'

'কোথায়?'

'তা তো জানি না।'

'ঠিক আছে, খোঁজ নিয়ে নেব। চলি। গুড নাইট।' পাশের ফ্ল্যাটটার দরজায় চাবি ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেল টিয়া।

টিয়া কী করে, এখানে একা থাকে কি না, প্রশ্নগুলো মনে আসছিল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেয়েই সুন্দরী কিন্তু টিয়ার দাঁড়ানো, কথা বলার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার আছে, যা চট করে দ্যাখা যায় না। দরজা বন্ধ করল মতিন।

শাজাহান এবং জিয়া এল আরও একঘণ্টা পরে। জিয়ার হাতে একটা প্যাকেট। মতিন দরজা খুলে দিতেই জিয়া বলল, 'আরে! যাওয়ার সময় আমরা বাইরে থেকে বন্ধ করলাম,তালা ছিল না বলে লাগালাম না। কিন্তু তুমি ভেতর থেকে খুললে কী করে?'

মতিনের একটু স্মার্ট হওয়ার ইচ্ছে হল। বলল, 'আমি ম্যাজিক জানি।'

শাজাহান বলল, 'দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলে নিশ্চয়ই, কেউ এসে খুলে দিয়েছে। যাকগে, এখন শরীর কেমন?'

'ভালো। কিন্তু আজ আর ঘুম আসবে না।'

'সর্বনাশ। আজ রাত্রে ঘুমাতে পারলে কাল দিনের বেলায় কাজ করতে পারবে। তবেই এখানকার দিনরাতের সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে।' জিয়া বলল, 'আচ্ছা, আমি দেখছি।'

'আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?'

'ঘুরতে। সেখানে তোমার যাওয়া উচিত হবে না।' জিয়া হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকাল শাজাহান, 'ভাই, ওসব কথা থাক না।'

'হ্যাঁ। থাক। তাছাড়া তোমার পকেটে এখন মাত্র সাতটা ডলার আছে। দেশে ফেরার আগে ওই দিয়ে যা পারো কিনে নিয়ে যেও।' জিয়া রান্নাঘরে ঢুকে তিনটে গ্লাস বের করে আনল। তারপর প্যাকেট থেকে একটা মদের বোতল বের করে বলল, মতিন, এইটে এক গ্লাস খেয়ে নিলে রাত্রে চমৎকার ঘুম হবে। সকালে উঠে দেখবে শরীরে কোন প্রবলমে নেই।'

'ওটা তো মদ। আমি মদ খাই না।'

'আই বাপ। তুমি কি পাগল?'

'মানে?'

'যে কাজটা তুমি কখনও করোনি তা ভবিষ্যতে করবে না?'

হকচকিয়ে গেল মতিন। কথাটা বলতে পারল না।

'এই যে তুমি আমেরিকায় এসেছ, এটাই তো প্রথমবার, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল মতিন।

'আগে কখনও যাইনি বলে আমেরিকায় যাব না, একথা তো বলোনি!' জিয়া হাসল, 'আরে ভাই বিনা পয়সায় লোকে বিষও খায়, তোমাকে তো দামি জিনিস দিচ্ছি। সবকিছুর স্বাদ জেনে রাখা উচিত। একটু খেলে কোনও সমস্যা হবে না, বরং ঘুম হবে ভালো। সকালে উঠে দেখবে কোনও ঝামেলা নেই।'

শাজাহান রান্নাঘরে ঢুকেছিল। এবার একটা প্লেট ভরতি করে ডিমভাজা নিয়ে এল। বলল, 'মিঞা, লেকচার বন্ধ করে মাল ঢালো।'

তিনটে গ্লাসে হুইস্কি আর জল ঢেলে একটা ছোট টেবিলে রাখা হল। প্লেটে একটাই চামচ আর সেটা দিয়েই ডিমভাজার টুকরো কেটে মুখে পুরছে ওরা। দুজনে গ্লাস তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'চিয়ার্স।'

বাধ্য হয়ে গ্লাস তুলল মতিন। দেশে থাকতে সে কখনওই মদ খেত না। কিন্তু আমেরিকানরা তো সবার সামনে মদ খায়। একটা ইংরেজি ছবিতে দেখেছে সে। তা হলে আমেরিকায় এসে মদ খেলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। তার ওপর যখন জিয়াভাই বলল, এটা খেলে কাল সকালে শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে তখন—।

চুমুক দিল সে। গন্ধটা তেমন খারাপ নয় কিন্তু স্বাদ বিশ্রী। জিভ, গলা গরম হয়ে গেল। শাজাহান গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'এই ঘরটা বেশ ভালো, হাতের কাছে সব। আমি যদি হোল লাইফ এই ঘরে থাকতে পারতাম।'

'তোমার বউ-বাচ্চার কী হবে?' জিয়া হাসল।

'আরে ছোড়! আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে ওদের যা হবে তখনও তাই হবে। আমার এক চাচাতো ভাই ওদের দ্যাখাশোনা করবে।' শাজাহান বলল।

'তার কী মাথা ব্যথা?'

'আমার সন্দেহ, ধরতে পারিনি এখনও, ব্যাটা আমার বউ-এর সঙ্গে প্রেম করে। যখনই বাসায় আসে তখনই ভাবির জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে।'

'পেছনে একটা লাথি চালিয়ে দিতে পারো না?'

'পাগল। বাপ-চাচারা জিজ্ঞাসা করবে কেন লাথি মারলি? জবাব দেব কী?'

'ছাড়ো ওসব কথা। এই যে মতিনভাই, কেমন লাগছে? জিয়া জিজ্ঞাসা করল।

'ভালো না।' সত্যি কথাটা বলল মতিন।

'প্রথমবার সবাই বলে। পানিতে পা দিয়েছ, ডুব দিয়ে সাঁতার কাটলে তবে তো আরাম হবে।' হো-হো শব্দে হাসতে লাগল জিয়া।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল জিয়াভাই ঠিক বলেছিল। কাল রাত্রে দুই গ্লাস খেয়েছিল সে। সঙ্গে খানিকটা ডিমভাজা। তারপর আর ভাত খায়নি। খেতে ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু সকালে বুঝতে পারল শরীরে আর কোনও অস্বস্তি নেই। ওষুধটা বেশ ভালো। জিয়া এবং শাজাহান তখনও ঘুমাচ্ছিল। টয়লেট থেকে দাঁত মেজে পরিষ্কার হয়ে হঠাৎ কী মনে হল, দরজা খুলে বাইরে এল মতিন। পাশের দরজাটা বন্ধ। টিয়া নামের মেয়ে ওখানেই থাকে। ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথা কাল সঙ্গীদের বলা হয়নি। কাল রাত্রে মদ খেয়ে ওরা মেয়েদের সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলছিল বলেই বলতে ইচ্ছে করেনি।

সিঁড়িটা ফাঁকা, এখনও ছায়া ছায়া। ভারী দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। এখনও ভালো করে সকাল হয়নি, রাস্তায় লোক বেশ কম। একটু হাঁটতেই দুমদুম আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখল বেশ কিছুটা দূরে মাটির অনেক ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। এরকম দৃশ্য কখনও দ্যাখেনি সে। যদি কোনওভাবে লাইন থেকে সরে যায় তাহলে এতবড় ট্রেনটা অনেক নীচে আছড়ে পড়বে। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই শিউরে উঠল মতিন। ওপাশ থেকে আর একটা ট্রেন এল। কিন্তু গতি কমিয়ে সেটা থেমে গেল চোখের আড়ালে। কাছাকাছি কোনও স্টেশন নিশ্চয়ই আছে। আর সেই স্টেশনকে মাটির অনেক ওপরে থাকতে হবে।

সামনেই একটা ছোট্ট মোড়। মতিন দাঁড়াল। দুজন মানুষ বাংলায় কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। তাজ্জব ব্যাপার! জায়গাটাকে এখন আমেরিকা বলে ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে। এই সময় মতিন টিয়াকে দেখতে পেল। এই সাতসকালে প্যান্ট-শার্ট আর হাতব্যাগ নিয়ে দ্রুত হেঁটে আসছে। কাছাকাছি এসে সে বলল, 'আরে, আপনি!'

'একটু দেখছিলাম।'

'বেশিদূর যাবেন না; পথ হারিয়ে ফেলবেন।'

'এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন?'

'হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে? কেউ কি অসুস্থ?'

শব্দ করে হাসল টিয়া, 'না না। আমি হাসপাতালে কাজ করি। ইন্টারপ্রেটার, যেসব বাংলাদেশি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন তাদের অনেকেই ইংরেজি বলতে পারে না, ডাক্তার নার্স তাদের সমস্যা বুঝতে পারেন না। আমি তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ডাক্তারদের বলি। হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছিল, কাল রাত্রে একজন ভর্তি হয়েছেন কিন্তু তার কী অসুবিধে হচ্ছে বোঝাতে পারছেন না। আমাকে তাই সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।' টিয়া বলল।

'হাসপাতাল কত দূরে?'

'কুইন্সে। ট্রেন ধরলে বেশি সময় লাগে না। আচ্ছা, আসি, আবার দ্যাখা হবে।' মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল আগের মতো দ্রুত পায়ে।

মুগ্ধ হয়ে গেল মতিন। বাংলাদেশের মেয়ে নিউইয়র্কের হাসতাপাতালে যে কাজ করছে তাতে কত মানুষের উপকার হচ্ছে। তার নিজের তো এই কাজটা করার যোগ্যতা নেই। ইংরেজি ভাষা তার আয়ত্তেও নেই। স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে, কিছু বাক্য বলতে পারে কিন্তু সেটা অনুবাদ করে বলতে হয়। স্বচ্ছন্দে বলার অভ্যাস তৈরি হয়নি। টিয়া ওই ব্যাপারে তার থেকে অনেক এগিয়ে আছে।

মুর্শেদ এল ঠিক ন'টার সময়। ততক্ষণে ওরা তিনজন শুধু তৈরি নয়, সেদ্ধ-ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছে। মুর্শেদ ওদের নিয়ে প্রথমে মালখানায় গেল। সেখানে জাহাজে আসা পিচবোর্ডের বাক্সগুলো রাখা ছিল। মুর্শেদ কাগজপত্র দেখিয়ে সেগুলো ছাড়িয়ে একটি ছোট ট্রাকে তোলাল ওদের দিয়ে। তারপর সেই ট্রাকে চেপে ওরা গেল মেলা প্রাঙ্গণে। যাওয়ার পথে মতিন অবাক হয়ে দেখল গাড়ির ভিড় আর আকাশছোঁয়া বাড়ির সারি।

বিশাল হলঘরে প্রচুর স্টল। তার একটা তাদের জন্যে রাখা ছিল। মুর্শেদের সহযোগিতায় খুব দ্রুত বাক্সগুলো থেকে নারী পুরুষদের পোশাক বের করে স্টল সাজানো হল। পেছনের দেওয়ালে কামাল হোসেনের কোম্পানির নাম-ঠিকানা লেখা ফেস্টুন টাঙিয়ে দেওয়া হল। স্টল সাজানো হয়ে গেলে দ্যাখা গেল, ঘড়িতে ঠিক বারোটা বেজেছে।

মুর্শেদ বলল, 'এখন আপনাদের সবাইকে বাইরে যেতে বলবে। ঠিক একটার সময় মেলার

উদ্বোধন হবে দরজার ফিতে কেটে। খিদে পেয়েছে?'

জিয়া বলল, 'চা খেতে পারি। এখানে চা পাওয়া যাবে?

'আসুন।'

'কিন্তু সবাই যদি যাই তাহলে, মানে, এগুলো যদি চুরি যায়?'

মুর্শেদ হাসল, 'যাবে না। চারপাশে ক্যামেরা আছে, গার্ড আছে। তা ছাড়া এত সামান্য জিনিস এদেশের মানুষ মেলায় এসে চুরি করে না। রাস্তাঘাটে ছিনতাই যারা করে তারা মেলায় আসে না।'

একটা ব্লক হেঁটে যে দোকানটায় মুর্শেদ ওদের নিয়ে ঢুকল তার নাম ম্যাকডোনাল্ড। গরমজল আলাদা করে নিতে হল, সঙ্গে কাগজের প্যাকেটে চিনি, দুধ, চা। টেবিলে বসে সেগুলো মিশিয়ে চা বানাতে বেশ মজা লাগল। মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'চায়ের দাম কত?'

'আশি পয়সা।'

'মাত্র? আমাদের ওখানে ভাঁড়ের চা দুটাকা হয়ে গিয়েছে।'

শোনামাত্র জিয়া এবং শাজাহান খুব হাসতে লাগল। মুর্শেদ বলল, 'ভাই, আমরা এখানে ডলারকে টাকা বলি, সেন্টকে পয়সা। দশ সেন্টে দেশের টাকা সাত টাকা। তার মানে দেশের টাকায় এই চায়ের দাম ছাপ্পান্ন টাকা।'

'ওরে ব্বাবা।' মুখ থেকে বেরিয়ে এল মতিনের।

মুর্শেদ হাসল, 'এখানকার মানুষ যে যেমনই রোজগার করে তাতে তার কাছে আশি সেন্ট কিন্তু একটুও বেশি বলে মনে হয় না। এদেশে থাকলে দেশের টাকার কথা ভাবলে মন খারাপ হবে। না ভাবাই ভালো।'

বিকেল পাঁচটার পর একটু একটু করে ভিড় বাড়তে লাগল। জিয়া এবং শাজাহান খদ্দেরদের সামলাচ্ছিল, মতিন ওদের সাহায্য করছিল। সে লক্ষ্য করছিল, ক্রেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই হয় বাংলাদেশের নয় পাকিস্তানের মানুষ। মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। সে ভেবেছিল এই মেলায় আমেরিকান সাদারাই ভিড় জমাবে।

রাত নটায় যখন মেলা বন্ধ হল তখন বেশ ভালো বিক্রি হয়ে গেছে। যেগুলো হয়নি সেগুলো বাক্সবন্দি করে রাখা হল। বিক্রির অর্থ মুর্শেদকে দিল শাজাহান। তার বদলে মুর্শেদ একটা রসিদ লিখে দিল। নিউইয়র্কে কোনও কোনও ব্যাংক রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। কিন্তু সেগুলোতে অ্যাকাউন্ট না থাকায় ঝুঁকি নিতে হবে মুর্শেদকে। কয়েক হাজার ডলার বাসায় নিয়ে যেতে হবে কাল ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্যে। এই সময় মুর্শেদের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। সে খুব বিনীত গলায় জানিয়ে দিল, আজ মেলা কীরকম হয়েছে এবং বিক্রি থেকে কত ডলার পাওয়া গিয়েছে। সে ফোন বন্ধ করে হাসল, 'বড় সাহেবের ফোন, এখন তো ঢাকায় সকাল।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মতিনের। সে বলল, 'মুর্শেদভাই, একটা নাম্বার ধরে দেবেন?'

'দেশে ফোন করলে এখান থেকে না করাই ভালো। বেশি খরচ পড়ে। আমি পরে একটা কার্ড দিয়ে দেব। দু'টাকায় একশো মিনিট কথা বলা যায়।

'না, না। দেশে না। এইখানেই একজনকে।'

'নাম্বার কী?'

হিপ পকেটে রাখা কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজের একটা খুলল মতিন। ছুটির লিখে দেওয়া নাম্বারটায় চোখ বুলিয়ে কাগজ এগিয়ে দিল সে। মুর্শেদ নাম্বার দেখে দেখে বোতাম টিপে কানে রাখল যন্ত্রটা। তারপরে বলল, 'হ্যালো, এখানে একটু কথা বলুন ভাই।' মতিনকে রিসিভারটা দিতেই সে কানে চেপে বলল, 'হ্যালো। সেলামালুকম! আমার নাম মতিন। কালই এদেশে এসেছি। আপনি কি ফয়েজভাই?

এপাশ থেকে একটু সরু গলায় জবাব এল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার বাসা কি মীরপুরে?'

'হ্যাঁ। একসময় ওখানেই থাকতাম। কী ব্যাপার বলুন?'

'আমরা গার্মেন্টসের মেলায় এসেছি। কয়েকদিন থাকব। আপনি যদি দয়া করে এখানে আসনে তাহলে খুব ভালো হয়। সামনা-সামনি কথা বলব।' মতিন বলল।

'মেলাটা কোথায় হচ্ছে?'

'আমি মুর্শেদভাইকে ফোনটা দিচ্ছি, উনি বলে দেবেন।'

'মুর্শেদভাই কে?'

'যে কোম্পানির হয়ে এসেছি সেই কোম্পানির এখানকার ম্যানেজার।'

কথাটা শুনে মুর্শেদ হেসে ফেলল। তারপর ফোনটা নিয়ে ফয়েজকে ভালোভাবে ঠিকানাটা বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে কবে আসবেন? কাল তো ছুটির দিন। কালই আসুন। মেলায় ঢুকে একেবারে বাঁ-দিকে চলে আসবেন। কামাল হোসেন ফেস্টুন ঠিক চোখে পড়বে।'

ফোন বন্ধ করে মুর্শেদ মতিনকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটি কী করে?'

মাথা নাড়ল মতিন, 'আমি জানি না।'

জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে বললে কথা আছে, অচেনা লোককে কী কথা বলবে?' মতিন দ্বিধায় পড়ল। ছুটির কথা এদের বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না।

শাজাহান বলল, 'তুমি লোকটাকে চেনো না অথচ তার ফোন নাম্বার জেনে ফোন করে আসতে বললে। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে বলার দরকার নেই।'

'না না, আমার কোনও ব্যাপার নয়।' মাথা নাড়ল মতিন? তারপর ছুটির বলা কথাগুলো ওদের শোনাল।

মুর্শেদ বলল, 'ফোন করেছিল। অন্য কেউ ধরতে পারে, ওকে বলেনি। কিন্তু তিন-তিনটি চিঠি পেয়েও জবাব দেয়নি কেন? মামলা ভালো লাগছে না। দেখি কাগজটা।'

কাগজটা আবার মতিনের কাছ থেকে নিয়ে ঠিকানা পড়ে বলল, 'এখানে আসতে ওর ঘণ্টাখানেক ট্রেনে লাগবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, লোকটা আসবে না।'

'আসবে না?' অবাক হল মতিন।

'ছুটিকে দেখতে কেমন?'

'ভালো। মানে আমাদের ঘরের মেয়েরা যেমন হয়।'

'ওর বাপের অবস্থা কেমন?'

'সাধারণ।'

'তাহলে তাকে বলে দেওয়া উচিত, সে যেন ফয়েজের জন্যে আর অপেক্ষা না করে। এ ধান্দাবাজ ছেলে, এই দেশ তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে! দ্যাখো, এখানেই হয়তো কাউকে বিয়ে করে সংসার করছে।' মুর্শেদ বলল।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল মতিনের। কিন্তু সে খুব আশা করেছিল ফয়েজ মেলায় আসবে। আসেনি।

রবিবার মেলার শেষদিন। ভিড় বেশি। দেশ থেকে পাঠানো প্রায় সব মালই বিক্রি হয়ে গেছে এই ক'দিনে। তাই আজ ক্রেতাদের ফেরাতে হচ্ছে। বিকেলে মতিনকে অবাক করে টিয়া এল। স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'একি! স্টল যে ফাঁকা।'

জিয়া বলল, 'হ্যাঁ, আপা। সামনের বছর আরও বেশি স্টক আনব।'

টিয়া মতিনকে বলল, 'তা হলে তো আপনি এখন ফ্রি। চলুন, চা খেয়ে আসি।'

সঙ্গে সঙ্গে শাজাহান এবং জিয়ার চোখ বড় হয়ে গেল। ওরা ভাবতেই পারছিল না টিয়ার মতো স্মার্ট সুন্দরীর সঙ্গে মতিনের পরিচয় আছে। ওদের সম্মতি নিয়ে মতিন টিয়ার সঙ্গে বাইরে

বের হল। জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাকডোনাল্ডে যাবেন?'

'না। ওদিকে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে।'

এইসময় দুটো ছেলে বেশ জোরে দৌড়ে আসছিল। তাদের একজন মতিনকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। মাটিতে পড়ে যাওয়া মতিনকে দ্বিতীয়জন তুলে আগের গতিতে চলে গেল। টিয়া চিৎকার করে গলাগালি দিল ওদের। তারপর ব্যস্ত গলায় বলল, 'দেখুন তো, আপনার পকেটে যা ছিল তা ঠিকঠাক আছে কি না!'

ততক্ষণে ধাক্কা সামলেছে মতিন। পকেটে হাত দিতেই সে চমকে উঠল। দ্বিতীয় পকেটে শুধু রুমাল ছিল, এখনও আছে। প্রথম পকেটে পাসপোর্ট এবং পার্সটা ছিল। সেগুলো নেই। সে চোখ তুলে দৃষ্টিসীমার মধ্যে সেই ছেলেগুলোকে দেখতে পেল না।

মতিনের মুখের চেহারা দেখে টিয়া বুঝতে পারল পকেট থেকে কিছু চলে গেছে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ছিল পকেটে?'

'পাসপোর্ট আর টাকার ব্যাগ।' মতিনের গলা ভেঙে গেল।

'সর্বনাশ। পাসপোর্ট পকেটে নিয়ে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ওরা বলেছিল সঙ্গে রাখা উচিত।'

'পাসপোর্ট তো ওদের কাজে লাগবে না। চলুন আগে গিয়ে দেখি!'

টিয়াকে অনুসরণ করল মতিন, 'ওরা কারা?'

'ছিনতাই করে। যা পায় তাই নিয়ে নেশার খরচ চালায়।' টিয়া দ্রুত হাঁটছিল। রাস্তাটার বাঁকে এসে চারদিক খুঁজল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'এখনই থানায় যেতে হবে। আগে মেলায় চলুন।'

মেলায় এসে পাসপোর্ট পকেটমার হওয়ার ঘটনাটা বলতেই সবাই হায় হায় করে উঠল। জিয়া বলল, 'সর্বনাশ। এখন তুমি বাংলাদেশে যাবে কী করে?'

'মানে?' চমকে উঠল মতিন।

মুর্শেদ বলল, 'ফেরার সময় এয়ারপোর্ট তোমার পাসপোর্ট দেখতে চাইবে? পাসপোর্টের মধ্যে ভিসা আছে। ওটা না দেখালে টিকিট থাকা সত্ত্বেও ওরা বোর্ডিং কার্ড দেবে না। খুব সমস্যা হয়ে গেল।'

টিয়া বলল, 'এখনই থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে হবে। ডায়েরি করে বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে জানালে তারা দেশ থেকে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট আনিয়ে দিতে পারে। পাসপোর্ট নাম্বার জানা আছে?'

মাথা নাড়ল মতিন, 'না।'

শাজাহান বলল, 'আমাদের তিনজনের পাসপোর্ট নম্বর আমার কাছে লেখা আছে। চলুন, থানায় যাই।'

জিয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের তো দুদিন পরে প্লেনের টিকিট করা আছে। তার মধ্যে সব কাজ হয়ে যাবে?'

মুর্শেদ মাথা নাড়ল, 'পাগল! থানায় রিপোর্ট করলে মতিনের এদেশে থাকার একটা যুক্তি তৈরি হবে। তারপর বাংলাদেশ দূতাবাস কতদিনে পাসপোর্ট দেশ থেকে আনিয়ে দেয় অথবা দেশ থেকে সত্যতা যাচাই করে এখান থেকেই ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারে। তবে ওদের কাছে অ্যাপ্লাই করার পর মতিনকে যেতে হবে ইউনাইটেড স্টেটস ইমিগ্রেশন দপ্তরে। ওদের সব জানালে ওরা যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে যতদিন পাসপোর্ট না পাচ্ছে ততদিন এখানে থেকে কিছু রোজগারের

জন্যে সাময়িক ওয়ার্ক পারমিট দিতে পারে।'

মুর্শেদের কথাগুলো কানে ঢুকছিল না মতিনের। চোখের সামনের পৃথিবীটা এখন আবছা হয়ে গেছে। চারপাশের মানুষদের অস্তিত্ব তার চেতনায় নেই। তার দেশ, বাংলাদেশের জন্যে তীব্র আবেগে সে খান খান হয়ে যাচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন। এতক্ষণ টিয়া তাঁকে সবকথা বলেছে, মতিন এবং মুর্শেদ পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়েছে।

এবার অফিসার আসন ছেড়ে মতিনকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে বললেন। মুখ গম্ভীর, পুরু ঠোঁট যার নীচেরটা ওপরটাকে শক্ত করে ধরে আছে। মতিন এগোল।

'এই গল্পটা কখন বানালে তোমরা?' খুব নীচু গলায় বললেন অফিসার।

মতিন চেষ্টা করল বাংলায় যা বলবে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল। সে শুধু বলতে পারল, 'নো-নো-নো।'

'কী নো?' চিৎকার করে বললেন অফিসার, 'এসব গল্প বলে কোনও লাভ হবে না। পকেটমার আর কিছু নিল না তোমার পাসপোর্ট নিয়ে গেল। বাঃ।'

টিয়া বলল, 'স্যার, ওর পকেটে পার্স ছিল, সেটাও নিয়েছে।'

'পার্স? কতছিল পার্সে?' অফিসার মতিনকে জিজ্ঞাসা করল।

'সেভেন, সেভেন ডলার্স—!' কোনওরকমে বলল মতিন।

'মাইগড! মাত্র সেভেন ডলার্সের জন্যে তোমরা পুলিশ স্টেশনে এসেছ?'

'স্যার, মাই পাসপোর্ট? আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক হোম।'

'হোম? কোথায় থাকো তুমি? পাকিস্তান? ইন্ডিয়া?'

'নো স্যার। বাংলাদেশ।' এবার স্পষ্ট উচ্চারণ করল মতিন।

'ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাক? বাংলাদেশ? সিওর?'

'ইয়েস স্যার।'

'তা হলে একটা কাগজে ঠিক কী কী কোথায় হয়েছিল লিখে আনো।'

মিনিট ছয়েক বাদে টিয়ার লিখে দেওয়া দরখাস্ত অফিসারের সামনে রাখল মতিন। টিয়া বলল, 'স্যার, মতিন যদি পাসপোর্ট ফেরত না পায় তা হলে খুব বিপদে পড়ে যাবে। দুদিন বাদে ওর দেশে ফেরার কথা। প্লেনের টিকিট কাটা আছে। দেশে যেতে না পারলে এখানে ও কোথায় থাকবে, একটু ভেবে দেখুন।'

'ওকে বলো কোনও একটা ক্রাইম করতে। তা হলে অন্তত এক বছরের জন্যে ওর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তার বেশি ভাবার কোনও ক্ষমতা আমার নেই।'

ডায়েরির নাম্বার দেওয়া স্বীকৃতিপত্র নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখন রাত নেমে গেছে। এতক্ষণ মতিনের সঙ্গী শাজাহান এবং জিয়া বাইরে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের কাছে যাবে না বলে ভেতরে ঢোকেনি। শাজাহান জিজ্ঞাসা করল, কী বলল? পাসপোর্ট পাওয়া যাবে?'

মুর্শেদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী করে বলবে? ওরা কি ম্যাজিক জানে?'

জিয়া মাথা নাড়ল, 'তা হলে কী হবে?'

'কাল সকালে বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতে হবে। আমি বড় সাহেবকে সব জানিয়ে দিচ্ছি। এখনও বাংলাদেশে ভালো করে সকাল হয়নি। একটু পরে ফোন করব।' মুর্শেদ চিন্তিতগলায় বলল, 'কিন্তু মতিনভাই, কাল সকালে আমি আসতে পারব না। বাংলাদেশ দূতাবাস কোথায় বুঝিয়ে দিলে যেতে অসুবিধা হবে না।'

'আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।'

'আরে জরুরি কাজ না থাকলে তো সমস্যা হত না। আপনি পারবেন?' মুর্শেদ টিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে সে বিব্রত হয়ে বলল, 'কাল ভোর থেকে ডিউটি। দুটোর পর যেতে পারি।'

'তখন গেলে কাজ হবে কি না জানি না।'

হাঁটতে হাঁটতেই ওরা বাসায় পৌঁছে গেল। টিয়া আর কথা না বলে ভেতরে ঢুকে গেলে জিয়া অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা ইনি এই বিল্ডিং-এই থাকেন!'

কেউ জবাব দিল না। মুর্শেদ পকেট থেকে দশ ডলারের পাঁচটা নোট বের করে মতিনের হাতে দিল, 'এই দুদিন তো থাকা-খাওয়ার সমস্যা হবে না। তারপরে বড় সাহেব যা বলবেন সেইমতো ব্যবস্থা হবে।' তারপর তিন জনকেই কীভাবে দূতাবাসে যেতে হবে বুঝিয়ে দিল সে। বলল, 'সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে যাবেন।'

মুর্শেদ চলে গেলে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মতিন দেখল টিয়া তাদের ফ্ল্যাটের আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে বলল, 'এইমাত্র পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন এসেছিল। একটা পাসপোর্ট টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। নামধাম ছবির পাতাটা ওর মধ্যে নেই।'

জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে ফোন করেছে?'

'হ্যাঁ। ওঁর অ্যাপ্লিকেশনে আমি এই বাড়ির ঠিকানা আর আমার ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম। ওগুলো না দিলে পুলিশ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করত না।' ফ্ল্যাটের ভেতরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল টিয়া।

নিজেদের ঘরে ঢুকেই জিয়া বলল, 'নামটা ভালো। টিয়া। একলা থাকে না স্বামী-টামী আছে?'

শাজাহান খিঁচিয়ে উঠল, 'আছে কি নেই তাতে তোমার কী মিঞা? একসঙ্গে এসে একজনকে না নিয়ে ফিরব, তার জন্যে কোনও চিন্তা হচ্ছে না তোমার?'

'হচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে আমি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করব না, টয়লেটেও যাব। বাপ-মা মারা যাওয়ার পর একবছর বউকে চুমো খায় না এমন কোনও গর্দভের নাম বলতে পারো?' জিয়া হাসল, 'মতিনভাই! মিছামিছি ভয় পাচ্ছ। আমি তো বলব তোমার কপাল খুলে গেল।'

মতিন অবাক হয়ে তাকাল।

'এই আমেরিকায় এসে থাকার স্বপ্ন হাজার হাজার ছেলে দ্যাখে। ভিসা পায় না বলে আসতে পারে না। তাই চোরাই পথ ধরে। জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ঢোকে, মেক্সিকো থেকে লুকিয়ে বর্ডার পার হয়। কেন করে? না, এখানে এক ডলার রোজগার করলে সেটা দেশের টাকায় সত্তর টাকা হয়ে যাবে। তুমি চুরি করে ঢোকনি। পুলিশের কাছে পাসপোর্ট হারাবার ডায়েরি করেছ, কাল দূতাবাসে গিয়ে রিপোর্ট করবে। অতএব তুমি বৈধভাবে থাকবে এদেশে। আমরা দেশে ফিরে গিয়ে কী করব? দু'হাজার টাকার ইলিশ মাছ জিন্দেগিতে কিনতে পারব না। এই সত্যিটা ভেবে দ্যাখো। তুমি তো বেকার ছেলে। দেশে ফিরে গিয়ে আবার বেকার হবে?'

শাজাহান মন দিয়ে জিয়ার কথাগুলো শুনছিল। এবার মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পরিবারকে ছেড়ে থাকাটাও কম কষ্টের নয়। তা ছাড়া থাকবে কোথায়? খাবে কী? এই ঘর তো দুদিন বাদেই ছেড়ে দিতে হবে?'

'আঃ। নানিদের মতো কথা বোলো না তো। পুরুষ মানুষ, বিয়ে-শাদি না করলে ঠিক পাখির মতো। আকাশে উড়লেই দেখতে পায়, কত গাছের ডাল তার জন্যে খালি আছে। ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে মতিনভাই। তবে একটা ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কখনও কোনও মেয়েমানুষের ফাঁদে পা দিও না। ব্যস, তা হলে আর কোনও সমস্যা হবে না।'

জিয়া এবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

*

ঘুম ভেঙেছিল কাকভোরে। কিন্তু মতিন আজ বের হল না। বের হলে টিয়ার সঙ্গে দ্যাখা হত। কিন্তু কীরকম লজ্জাবোধ হল। তারপর কাল রাত্রে জিয়ার বলা কথাগুলো মনে পড়ল। টিয়ার বাসায় কে কে আছে সে জানে না। টিয়াও বলেনি। কাল টিয়া তার জন্যে অনেক করেছে। সে কথা বলতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটাও সমস্যায় পড়তে পারে।

সকাল আটটায় তৈরি হয়ে দরজায় তালা দিয়ে তিনজনে বের হল। স্টেশনে যাওয়ার সিঁড়ি যেখান থেকে উঠেছে তার বাঁ-দিকে বেশ কয়েকশো দোকান। সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা। একটা দোকানের কাউন্টারের ওপর বোর্ডে লেখা, 'বাংলাদেশে কথা বলুন। দু'ডলারে একশ মিনিট টকটাইম।'

তিনজনে পরামর্শ করে একটা কার্ড কিনে ফেলল। সেলসম্যান বাংলাদেশের ছেলে। ওরা জিজ্ঞাসা করে জানল ওর বাসা খুলনায়। সে দেখিয়ে দিল কী করে কার্ডের নাম্বার ব্যবহার করতে হয়। ওদের মোবাইল ফোন নেই জেনে ছেলেটি নিজেরটা ব্যবহার করতে দিল। প্রথমে জিয়া কথা বলল ওর বড়ভাই-এর সঙ্গে। প্রত্যেকের খবর নিয়ে জানিয়ে দিল কবে দেশে ফিরছে। তারপর শাজাহান তার বাড়ির নাম্বার বলল। ছেলেটি ডায়াল করে দিলে সে কান চেপে শ্বাস বন্ধ করল। ফোনটা বেজে গেল, কেউ ধরল না। দ্বিতীয়বারে বাবার গলা পেল শাজাহান। জানল, বউ তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছে ঝগড়া করে। সে ফোন ফিরিয়ে দিল ছেলেটিকে। এবার মতিনের পালা। সে জিয়ার দিকে তাকাল, 'বাসায় কী বলব?'

'এসব বলার কোনও দরকার নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলো ফিরতে বোধহয় দেরি হবে।' জিয়া উপদেশ দিল।

নাম্বার ডায়াল করার পরে রিং শুরু হল। তারপরেই বাবার গলা 'হ্যালো।'

'আমি মতিন। কোনও অসুবিধে হয়নি আসতে। এখানে ভালো আছি।'

'এত দেরি হল কেন খবরটা জানাতে?'

'ফোন পাইনি।'

'তোমার তো ফেরার সময় হয়ে গেল!'

ঢোঁক গিলল মতিন, 'না, মানে একটু দেরি হবে। আর একটা কাজ শেষ করে যেতে হবে। আমি ফোন করে জানিয়ে দেব। রাখছি।'

দ্রুত লাইন কেটে দিল সে। সেলসম্যান ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, 'ওইভাবে কথা শেষ করলেন কেন?'

'আর মিথ্যে কথা বলতে পারছিলাম না।'

'মিথ্যে কথা বলতে হবে কেন?'

জিয়া বলল, 'প্রাইভেট ব্যাপার ভাই। কত দিতে হবে?'

'তিন ডলার দিন। দু'ডলার কার্ডের জন্যে, এক ডলার এই ফোন ব্যবহার করার জন্যে।' ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলল।

জিয়া মতিনকে বলল, 'দামটা মুর্শেদভাই-এর টাকা থেকে দিয়ে দাও।'

মুর্শেদের দেওয়া ডলার থেকে ট্রেনের টিকিও কেনা হল। এতদিন ট্রেনের আওয়াজই শুনতে পেত মতিন, আজ ট্রেনে উঠে বুঝল এর সঙ্গে দেশের ট্রেনের কোনও তুলনাই চলে না।

মুর্শেদ ঠিকই বলেছিল, ঠিকানা হাতে থাকলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে মনটা শান্ত হল কিছুটা। মতিন দেখল তাদের জাতীয় পতাকা সগর্বে উড়ছে।

দুজন বাংলাদেশি অফিসার সামনের রিসেপশনে বসে আছেন। সব কথা বলার পর তাঁরা

বললেন, 'আমাদের এখানে প্রায়ই এইরকম সমস্যা নিয়ে অনেকে আসেন। পুলিশের কাছে গিয়ে একটা ডায়েরি করিয়া আনা খুব সহজ ব্যাপার। আপনি ওই ঘরে গিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে দ্যাখা করুন। উনি ফলস কেস হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। সেটা বুঝে ওঁর কাছে যান।'

'ফসল কেস কেন হবে? কাল বিকেলে দুটো ছেলে আমার পকেট মেরেছে।' মতিন বেশ জোর দিয়ে বলল।

সেক্রেটারির কাছে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। ভদ্রলোক মধ্য পঞ্চাশের, সুট, টাই এবং মাথায় বিরাট টাক। মতিনের মুখে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে পকেটে পার্স ছিল, সেই পকেটেই পাসপোর্ট রেখেছিলেন?

'হ্যাঁ।

'অন্য পকেটে রাখেননি কেন?'

হকচকিয়ে গেল মতিন। সে অসহায় চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকাল।

সেক্রেটারি বললেন, 'আপনারা সঙ্গে পাসপোর্ট রেখেছেন?'

শাজাহান এবং জিয়া একসঙ্গে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'যে পকেটে পাসপোর্ট আছে সেই পকেটেই কি পার্স রেখেছেন?'

শাজাহান বলল, 'আমি পার্স ব্যবহার করি না স্যার।'

জিয়া বলল, 'আমিও।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সেক্রেটারি। মতিনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত ডলার ছিল পার্সে?'

'সাত ডলার কুড়ি সেন্ট।'

'বাড়িতে কত রেখে গিয়েছিলেন?'

'আমার কাছে আর ডলার ছিল না।'

'মাইগড! মাত্র সাত ডলার নিয়ে আমেরিকায় আছেন?

শাজাহান বলল, 'স্যার, খাওয়া থাকার তো খরচ হচ্ছে না। তা ছাড়া পরশু তো চলে যাওয়ার কথা, তাই ডলারের দরকার হত না।'

'আপনারা কামাল হোসেন সাহেবের কর্মচারী?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনার পাসপোর্টের নাম্বার, কবে ইস্যু হয়েছিল তার ডিটেলস দিয়ে একটি দরখাস্ত লিখুন। তাতে বলুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট আপনাকে ইস্যু করতে। যান।'

'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব স্যার?' শাজাহান বলল।

'আমাকে কিছু দিতে হবে না। ও যতদিন দেশে যেতে না পারছে ততদিন কী খাবে, কোথায় থাকবে তাই নিয়ে ভাবুন।' সেক্রেটারি ফাইলে মন দিলেন।

ভাগ্যিস পাসপোর্ট নাম্বার, তারিখ, শাজাহানের কাছে লেখা ছিল। সেইটে দেখে ওরা বাংলায় একটা দরখাস্ত লিখল। সেটা হাতে পেয়ে সেক্রেটারি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই পাসপোর্ট জেনুইন কিনা জানতে দেশে পাঠাচ্ছি। ওরা যত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেবে তত আপনার পক্ষে মঙ্গল হবে। আপনারা দুজন তো দেশে ফিরে যাচ্ছেন। গিয়ে মালিককে বলুন তদ্বির করতে, যাতে দেশ থেকে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আসে। আর হ্যাঁ, আমি এর জেরক্সের ওপর অফিসিয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স লিখে দিচ্ছি। ওটা নিয়ে আজই ইউ এস ইমিগ্রেশনের কাছে যান। ওরা যদি স্যাটিসফায়েড হয়, তা হলে আপনাকে টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দেবে। আপনারা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

আধঘণ্টা পরে আবার ডাক এল। সেক্রেটারি একটা খাম এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কতদূর পড়েছেন?'

'বি.এ. পাশ করেছি। ইতিহাসে অনার্স।'

ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, 'তিন-চারদিন পরে আমাকে ফোন করবেন। বাই দ্য বাই, আপনি ওয়ার্ক পারমিট যদি না পান তা হলে শিকাগোতে চলে যান।'

'শিকাগো।'

'হ্যাঁ। গ্রে হাউন্ডে চলে যেতে পারেন, যদি ভাড়া জোগাড় করতে পারেন। আমেরিকায় বিভিন্ন স্টেটে নিয়মকানুনের তফাত আছে। ওখানে থাকলে অনেক সুবিধা হবে।' মাথা দোলালেন সেক্রেটারি।

এখন দুপুর। শাজাহান বলল, 'এখন বাসায় ফিরে যাওয়াই ভালো।'

মতিন অবাক হল, 'সে কি? ইউ এস ইমিগ্রেশনে যাব না?'

'আমার মনে হচ্ছে সেখানে ভিড় বেশি হবে। তা ছাড়া ওই অফিসটা কোথায় খুঁজে বের করতেই বিকেল হয়ে যাবে। তার চেয়ে চলো, এখন বাসায় গিয়ে ভাত খাই।'

শাজাহানের কথা শুনে খিঁচিয়ে উঠল জিয়া, 'শালা এই জন্যে বলে ভেতো বাঙালি। এখন বাসায় না গিয়ে একটু ঘুরেটুরে দেখি।'

'তোমার খিদা পায়নি?' শাজাহান প্রশ্ন করে।

জিয়া চারপাশে তাকাল, খানিকটা দূরে একটা চারচাকার গাড়িকে দোকান বানিয়ে খাবার বিক্রি করছে একটা লোক। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে গ্যাস জ্বালিয়ে গরম খাবার দিচ্ছে। সে সঙ্গীদের নিয়ে দোকানের সামনে হাজির হল। সামনের দেওয়ালে কী কী পাওয়া যাবে তা লেখা থাকে। জিয়া বলল, 'গরম কুত্তার দাম একশো টাকা।'

শাজাহান বলল, 'মানে?'

জিয়া আঙুল তুলে দেখাল 'হট ডগ, এক ডলার ত্রিশ সেন্ট।'

শাজাহান সন্দিগ্ধ হল, 'কুকুরের মাংস নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের ভেতরে দাঁড়ানো লোকটি হো-হো শব্দে হেসে উঠল, মনে হচ্ছে নতুন আমদানি। কবে আসা হল?'

ওরা তিনজনেই অবাক। জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বাঙালি?'

'চিটাগাং। না ভাই, হটডগে গরম কুত্তা নেই। এইটে বিফ দিয়ে তৈরি। দেব নাকি তিনটে? লোকটি হাসল।

জিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

খেতে খারাপ লাগল না। জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'পানি পাওয়া যাবে?'

'সিওর।' একটা বোতল এগিয়ে দিল লোকটি।

শাজাহান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কতদিন এই ব্যাবসা করছেন?

'তিন বছর হয়ে গেল। জামাইকায় থাকি। ঘর ভাড়াই পড়ে বারোশো ডলার। এখানেই বিয়ে করেছি। বাংলাদেশের মেয়ে। কী করব। একা থাকা তো যায় না।'

'দেশে কেউ নেই?' মতিন প্রশ্নটা করল।

'সবাই আছে রে ভাই। বাপ মা ভাই বোন, বউ বাচ্চা—।'

জিয়া হেসে ফেলল, 'দেশের বউ জানে যে আপনি এখানেও বিয়ে করেছেন?'

'জানবে না কেন? কিছু করার নেই তার। আমি যে তার কাছে মরা মানুষ।'

'তার মানে?' শাজাহান জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তো আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। পাসপোর্ট নেই। জাহাজ থেকে লাফ মেরেছিলাম। সাঁতার কেটে মাঝরাতে ডাঙায় উঠেছিলাম। এখন হলে পারতাম না।'

'কেন?' মতিন প্রশ্ন করল।

'এখন পাড় থেকে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার সাগরের ভিতরে জাহাজ দাঁড় করায়। ওখানে লাফিয়ে অতটা পানি সাঁতার দেওয়ার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে। তারপর রাত্তিরবেলায় লাফাতে হয়। কোনও আলো দেখতে পাওয়া যাবে না। ভুল দিকে সাঁতার কাটলে তো আর সকাল হবে না। তারপর এদিকের সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব খুব। এখন তো পাসপোর্ট ছাড়া খুব কম মানুষ আসতে পারে।' লোকটি বলল, 'সাড়ে চার ডলার হয়েছে আপনাদের।

জিয়া মতিনকে বলল, 'ওটা ওই ডলার থেকে দিয়ে দাও।'

'হিসাব চাইবে কিন্তু—'

'চাইলে যা সত্যি তা বলবে।'

শাজাহান এতক্ষণ শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বাংলাদেশ দূতাবাসে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?'

'পাগল! ওরা বুঝত আমি জাহাজ-লাফানো লোক, কোনও হেল্প করত না। হয়তো ভালো মানুষের মতো পুলিশ ডাকত।' মতিনের দেওয়া ডলারের নোট ভাঙিয়ে ব্যালান্স ফেরত দিয়ে দিল লোকটা।

জিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আপনি আছেন কী করে এদেশে?'

'আছি!' লোকটা হাসল।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানতেন, পাসপোর্ট ছাড়া এদেশে ঢুকলে আর বের হওয়া যাবে না। দেশে ফিরতে পারবেন না। তা হলে এলেন কেন?'

লোকটি মতিনের মুখের দিকে তাকাল, 'কিছু মনে করবেন না ভাই; আপনি কি এখনও বাপের হোটেলে খান?'

প্রশ্নটা ভালো লাগল না, তবুও মতিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'আপনি ভাই বুঝবেন না। দেশে বউ-বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও কোনও মাসে পাঁচ-ছ'হাজারের বেশি কামাই করতে পারিনি। কত ধার করব? কে দেবে ধার? এক দোস্ত পরামর্শ দিল। তাই চলে এলাম এখানে। এখন এই দোকান চালিয়ে যা রোজগার করি তাতে আমার সংসারের সব খরচ মিটিয়েও দেশে প্রতিমাসে সাত-আটশো ডলার পাঠাই। ওরা সেটা ভাঙিয়ে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হাজার টাকা পেয়ে যায়। খুব আরামে আছে ওরা। বড় মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। আমি ওখানে থাকলে ওরা এই আরাম কখনও পেত না।' লোকটি বলল।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা জানতে পারি।'

'হারুণ। এখানে হারুণভাই বললে অনেকেই চিনতে পারবে।'

দূর থেকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখল ওরা। হঠাৎ মতিন বুঝতে পারল, তার মনে পাসপোর্ট হারাবার শোক এবং ভয় অনেকটা কমে গিয়েছে। আজ নয় কাল সে পাসপোর্ট ফিরে পাবে, কিন্তু হারুণভাই তো জিন্দেগিতে দেশে ফিরতে পারবে না।

সন্ধের পরে মুর্শেদ এল। বলল, 'সাহেব খুব রেগে গিয়েছিলেন পাসপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে শুনে। উনি বোধহয় আত্মীয় হন?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মতিন।

'তাই বললেন। আপনার বাবা নাকি ভাববেন উনি প্ল্যান করে আপনাকে আমেরিকায় আটকে রাখতে চান। দুজনের সম্পর্ক বোধহয় ভালো না।

মতিন জবাব দিল 'না।'

'আমি বললাম, আপনার কোনও দোষ নেই। তখন জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্গে কে ছিল।'

'আমি ওই মেয়েটির কথা বলতেই রেগে গেলেন খুব! বললেন, বাঃ, এর মধ্যেই সে মেয়ে জুটিয়ে নিয়েছে! যাক গে, বোঝাবার পরে একটু শান্ত হলেন তিনি। যখন শুনলেন আপনারা আজ

বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়েছেন পাসপোর্টের জন্যে, তখন বললেন শাজাহান ভাইদের হাতে একটা কপি দিয়ে দিতে। উনিও ওখানে তাগাদা দেবেন। কী বলল দূতাবাস?'

শাজাহান বৃত্তান্ত জানাল। কাগজটা দেখে খুশি হল মুর্শেদ। বলল, 'এর জেরক্স করে নিতে হবে এক ডজন। খুব দরকারি কাগজ।'

'কাল ইউ এস ইমিগ্রেশনে যেতে হবে—।'

'ঠিকানা বুঝিয়ে দিলে যেতে পারবে না?' মুর্শেদ হাসল।

'আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।' মতিন বলল।

'ঠিক আছে। সকাল সাতটায় ট্রেন ধরে সোজা ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনে চলে আসবে। প্ল্যাটফর্মে নামতেই আমাকে দেখতে পাবে।'

'কত নম্বর ট্রেনে উঠব?'

'স্টেশনে গিয়ে জিগ্যেস করলেই জেনে যাবে। আর হ্যাঁ, শোনো, তোমার ভাগ্য বেশ ভালো। সাহেব তোমাকে আরও সাতদিন এই ফ্ল্যাটে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'

'জিয়া মাথা নাড়ল, খুব ভালো হল। এই ফ্ল্যাট কার?'

'সাহেবের এক বন্ধুর। ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। ওর স্ত্রীকে খুব সাহায্য করেছেন সাহেব। তাই তিনি সাহেবকে কিছুদিনের জন্যে ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন।' ঘড়ি দেখল মুর্শেদ, 'কী ব্যাপার? আজ আপনারা শুকনো?'

জিয়া হাসল। হাত ঘুরিয়ে বলল, 'পানি শুকিয়ে গেছে।'

'ও। আসেন আমার সঙ্গে। মতিনভাই, কাল সাতটার ট্রেন ধরবে মনে করে।' মুর্শেদ জিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে শাজাহান বলল, 'জিয়ার এই স্বভাবটা খুব খারাপ। নিজের পয়সায় একবার কিনেছিস, আর কিনবি না, ঠিক আছে। কিন্তু পরের পয়সায় খেতে লজ্জা করছে না? ডাকল আর চলে গেলি। যাই ভাত রাঁধি।'

'শাজাহান ভাই—।'

'বলো।' পেছন ফিরল শাজাহান।

'কাল আমি কি একাই যাব?'

'তুমি চাইলে আমরা যেতে পারি। কিন্তু আমাদের যাওয়া আসার খরচ দিলে তোমার ডলার কমে যাবে। পরে খুব দরকার হবে ডলারের।' রান্নাঘারে ঢুকে গেল শাজাহান। পকেট থেকে ফোনের কার্ড বের করল মতিন। এখন কি দেশে ভোর হচ্ছে? কথা বলার উপায় নেই। তার জন্যে একটা ফোনের দরকার হয়। শ্বাস ফেলল সে।

দুই পায়ে শিরশিরানি, তীব্র অস্বস্তি নিয়ে ঠিক সকাল সাতটায় টিকিট কাউন্টারে দিকে এগোচ্ছিল মতিন। ঠিকঠাক পৌঁছোবে কি না, না পৌঁছাতে পারলে এই জায়গা চিনে ফিরতে পারবে কিনা ভাবতেই আরও নার্ভাস হয়ে পড়ছিল।

'হাইম্যন! গিভ মি টেন বাক।' কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র একটা লম্বা কালো হাত তার রাস্তা আটকাল। হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এসেছিল।

মতিন চোখ তুলে দেখল তার চেয়ে অনেক লম্বা, লিকলিকে রোগা একটা কালো ছেলে হাত পেতে আছে। বোঝাই যাচ্ছে ভিক্ষে চাইছে ছেলেটা। টেন বাক মানে কত? দশ ডলার। সাতশো টাকার ভিক্ষে চাইছে ব্যাটা!

হঠাৎ সব নার্ভাসনেস চলে গেল, রেগে গেল মতিন। মামার বাড়ি নাকি। সে চিৎকার করল : 'ভ্যাট!'

সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে 'ওকে ওকে' বলে ছেলেটা সামনে থেকে সরে গেল। সেই রাগের ঘোরেই মতিন টিকিট কাটল, প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করল কোন ট্রেন ইউনিয়ন টার্নপাইকে যাবে। তারপরে সেই ট্রেন এলে উঠে পড়ল।

আর তখনই বেলুন থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার মতো রাগটা উধাও হয়ে গেল। আবার নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। এই সকালে ট্রেনের কামরা ভরতি। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে তার ট্রেনের গতি বুঝে কেবলই মনে হচ্ছিল যদি ইউনিয়ন টার্নপাইক পেরিয়ে যায়।

খানিকবাদে সে কামরার গায়ে লেখা পরপর স্টেশনের নাম দেখতে পেয়ে কাছে গেল। ওই যে ইউনিয়ন টার্নপাইক। সে যেখান থেকে ট্রেনে উঠেছে তারপর চারটে স্টেশন ছাড়ালে ওখানে পৌঁছাবে। পরের স্টেশনে ট্রেন থামামাত্র নামটা মিলিয়ে গিয়ে স্বস্তি এল। ট্রেন ছুটছিল মাটির ওপর দিয়ে। এবার মাটির নীচে নামল।

ইউনিয়ন টার্নপাইকের প্ল্যাটফর্মে নেমে চারপাশে তাকাল মতিন। কোথাও মুর্শেদ নেই। অথচ লোকটা তাকে বলেছিল, প্রথমেই তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করার পর সে ঠিক করল আরও দশ মিনিটের মধ্যে না এলে সে ফিরে যাবে। প্ল্যাটফর্মের এদিকে সে নেমেছিল, উলটোদিকে যে ট্রেনগুলো ফিরে যাচ্ছে তার একটায় উঠলে জ্যাকশন হাইটে পৌঁছে যাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে তার কী লাভ হবে? এদেশে বৈধভাবে থাকতে হলে তাকে ইউ এস ইমিগ্রেশনে যেতেই হবে।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় মুর্শেদকে দ্যাখা গেল হন্তদন্ত হয়ে আসতে। সেই সময় আর একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল, মতিনকে ইশারা করল তাতে উঠে পড়তে। ট্রেন চলতে শুরু করলে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিসেসের মেজাজ খারাপ, কিছুতেই বেরুতে দেবে না। কোনওমতে ম্যানেজ করে এলাম। বুদ্ধিমানদের বিয়ে করা উচিত নয়।'

মতিন কোনও কথা বলল না। মুর্শেদ তার থেকে বয়েসে অনেক বড়।

ইউ এস ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছে ওরা হতভম্ব হয়ে গেল। বিশাল লাইন। এই সকালবেলাতেই ঠিক কত লোক দাঁড়িয়ে আছে গোনা যাচ্ছে না। ওরা শুনল, অফিস খুলবে সকাল নটায়। মুর্শেদ বলল, 'কোনও উপায় নেই। তোমাকে দাঁড়াতে হবেই। দাঁড়িয়ে যাও।'

'আপনি?'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার কোনও উপকার হবে না। অফিস খুলতে এখনও অনেক দেরি। তোমার যদি ডাক পড়ে, তা লাঞ্চের আগে পড়বে বলে মনে হয় না। আমি বরং ঘুরে আসি। ঘণ্টা দুই-আড়াই-এর মধ্যে ফিরে আসব। তুমি লাইন ছেড়ে কোথাও যাবে না। খুব খারাপ জায়গা কিন্তু।

মুর্শেদ আবার স্টেশনের দিকে চলে গেল। মতিনের মনে হল লোকটা ওর বউ-এর কাছে ফিরে যাচ্ছে।

বেলা যত বাড়ছে, লাইন তত লম্বা হচ্ছে। মতিনের বেশ মজা লাগছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে লাইনের মানুষগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। ঠিক তার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে নেপালি বলে মনে হচ্ছে। নাক চ্যাপ্টা, চোখ চেরা, ফরসা মুখ তো জাপানি বা চিনাদেরও। সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন দেশের মানুষ?'

'ভিয়েতনাম।' মহিলা জবাব দিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

মাথা নাড়ল মতিন। তার মানে বাংলাদেশের পূর্বদিকে যত দেশ আছে তাদের মানুষদের চেহারা প্রায় একরকম! কিন্তু সে শুনেছিল আমেরিকানরা নাকি ভিয়েতনামে গিয়ে যুদ্ধ করেছে।

ভিয়েতনামিরা নাকি আমেরিকার দাদাগিরি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছে। সে দেশের লোক আমেরিকায় এসে এই লাইনে দাঁড়িয়েছে কেন?

সাদা কালো শ্যামলা হলদেটে মানুষের পর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের সবার বোধহয় তার মতো এদেশে থাকার ব্যাপারে সমস্যা হয়েছে। মতিনের মনে হল, সমস্যাটা তার একার নয়। মনে হওয়ায় স্বস্তি এল।

একটা মাঝবয়েসি লোক। মুখে ক'দিনের না কামানো দাড়ি, পোশাক ময়লা। ভিয়েতনামি মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে তিনি মাথা নেড়ে না বললেন। এবার লোকটি মতিনের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউ ওয়ান্ট টু গো ইন ফোর্থ পজিশন? নাম্বার ফোর? হিয়ার, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট টিল আফটারনুন। দেয়ার উইদইন হাফ আওয়ার।'

একটু একটু বোঝার পর মতিনের কাছে অর্থ স্পষ্ট হল। এত পেছনে পড়ে না থেকে লোকটা তাকে লাইনের চার নম্বর জায়গায় যেতে বলছে। কিন্তু কেন?

লোকটার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'জাস্ট ফর্টি ডলার।'

'নো।' ফট্ করে বেরিয়ে এল শব্দটা। শোনামাত্র লোকটা পেছনের দিকে চলে গেল। বাংলাদেশে কোথাও খুব ভিড় হলে লাইনের প্রথম দিকের জায়গা বিক্রি হয়। কোনও ভালো স্কুলে যেদিন ভরতির ফর্ম দেওয়া হবে তার আগের সন্ধে থেকে লাইন পড়ে যায়। অনেক গরিব মানুষ সেই লাইনে জায়গা রেখে সকালে যারা আসে তাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমেরিকাতেও একই ব্যাবসা চলছে? কী কাণ্ড!

অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাইনের লোকেদের টোকেন দেওয়া হয়েছিল। মতিনের নাম্বার বিরাশি। নব্বইয়ের বেশি লোকের সমস্যা ওরা শুনবে না। ফলে বাকি মানুষরা হতাশ হয়ে চলে গেল। মতিন যখন সাতজনের জায়গায় পৌঁছাল তখন লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে। কিন্তু মুর্শেদের দ্যাখা নেই।

বিকেল তিনটের সময় সে একটা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল। কাউন্টারের ভেতরে একজন সাদা মেমসাহেব আর শ্যামলা রঙের লোক বসে আছে।

মেমসাহেবের ইংরেজি কিছুটা বুঝতে পারল মতিন, 'হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম?'

আজ সকালে লেখা অ্যাপ্লিকেশনটা এগিয়ে দিল সে। সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের চিঠি এবং পুলিশের ডায়েরি?

কাগজ পড়ে মেমসাহেব পাশের লোকটির সঙ্গে নীচু গলায় কথা বললে তিনি কাগজে চোখ রাখলেন, 'ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ?'

'ইয়েস স্যার।' মতিন উচ্চারণ বুঝতে পেরে জবাব দিল।

'আপনি প্ল্যান করে পাসপোর্ট নষ্ট করে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন। তারপর ডায়েরি করে বাংলাদেশ দূতাবাসকে বোকা বানিয়ে এখানে এসেছেন ওয়ার্ক পারমিটের জন্যে। অন্যায় স্বীকার করুন। না হলে পুলিশ ডাকতে হবে।' স্পষ্ট বাংলায় কথা বললেন ভদ্রলোক।

'না স্যার। এটা একদম সত্যি নয়। আমার আগামীকাল ফিরে যাওয়ার কথা।'

'কেন এসেছিলেন এখানে?'

'গার্মেন্টস মেলায় এসেছিলাম।'

'কে পাঠিয়েছিল?'

'আমার মামা, কামাল হোসেন।'

'কোন কামাল হোসেন? যিনি গার্মেন্টস টাইকুন?'

'জি হ্যাঁ।'

'টেলিফোন নাম্বার কী?'

মনে ছিল, নাম্বারটা ঠিকঠাক বলতে পারল মতিন। সেটা লিখে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর ঘড়ি দেখলেন। চাপা গলায় মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে টেলিফোন নাম্বার টিপলেন। মতিন অনুমান করল, মামাকে ফোন করছেন ভদ্রলোক। কিন্তু এখন তো ভোর হয়নি বাংলাদেশে। এই সময় ফোন পেলে মামা খুব বিরক্ত হবে। সাড়া পাওয়ার পর ভদ্রলোক চাপা গলায় ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। নিজের নামটা ওর মুখে উচ্চারিত হতে শুনল সে। কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দিয়ে আবার মেমসাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন ভদ্রলোক। তারপর মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তিন নাম্বার কাউন্টারে যান। নেক্সট!'

পাঁচটা বাজতে দশমিনিট আগে কাগজটা হাতে পেল মতিন।

ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট দুই মাসের মধ্যে পেতে হবে। ততদিন এদেশে থাকার অনুমতি এবং কাজ করার জন্যে টেম্পোরারি পারমিট দেওয়া হচ্ছে।

খামটাকে পকেটে পুরে বাইরে বেরিয়ে এসে কোথাও মুর্শেদকে দেখতে পেল না মতিন। তার একটুও ভালো লাগছিল না। দু-মাস এখানে একা থাকতে কে চেয়েছে? তাকে কে কাজ দেবে? কী কাজ করতে পারে সে এখানে? ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সে কোথায় থাকবে? এসবের বদলে যদি ওরা ওকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিত তাহলে সে খুব খুশি হত।

মতিন হাঁটতে লাগল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। ঘণ্টা তিনেক আগে খুব খিদে পেয়েছিল, এখন আর পাচ্ছে না। সে সোজা স্টেশনে ঢুকে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। এখন একটুও নার্ভাস না হয়ে ট্রেনে উঠল।

জ্যাকসন হাইটে ট্রেন থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে সে যখন অনেক লোকের সঙ্গে ওপরে উঠছে তখন টিয়াকে দেখতে পেল। টিয়ার পাশে একটি যুবক হাঁটছে। কথা বলতে বলতে ওপরে উঠছে ওরা। মতিন পেছনে থাকায় টিয়া তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ওপরে উঠে মতিন দেখতে পেল যুবক হাত নেড়ে টিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যুবক কে? টিয়ার সঙ্গে কী সম্পর্ক? টিয়া ওর সঙ্গে বেশ হেসে কথা বলছিল। এখন টিয়া রাস্তা পার হবে বলে সিগন্যাল পরিবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাস্তা পার হয়ে আচমকা পেছনে তাকাতেই টিয়া মতিনকে দেখতে পেল। দেখেই দাঁড়িয়ে গেল সে। মতিন কাছে আসতেই টিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'একি! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে কেউ নেই?

'না। ইউ এস ইমিগ্রেশন গিয়েছিলাম।' মতিন জবাব দিল।

'দুদিন এত কাজের চাপ ছিল যে আপনার খবর নিতে পারিনি। শেষপর্যন্ত কী হল?' টিয়া সাগ্রহে তাকাল।

'সব ঠিকঠাক হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস দেশে খবর পাঠিয়েছে। ইউ এস ইমিগ্রেশন টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছে দুই মাসের জন্যে।'

'বাঃ। এ তো দারুণ খবর। আপনার আপাতত কোনও চিন্তা থাকছে না। কিন্তু আপনাকে একটুও খুশি দেখাচ্ছে না। কী ব্যাপার বলুন তো?' টিয়া জিজ্ঞাসা করল।

'এসবের বদলে আমি যদি কাল দেশে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হত।'

মাথা নেড়ে হাসল টিয়া, 'আরে, আপনি প্রথমবার আমেরিকায় এসে মেলায় কাটালেন আর পাসপোর্টের ঝামেলা সামলালেন। দেশ দূরের কথা, এই শহরটাকেই একবার ঘুরে দেখলেন না।'

বলেই তার খেয়াল হল, 'আজ কখন বেরিয়েছেন আপনি?'

'সকাল সাতটায়।'

'সারাদিনে কিছু খেয়েছেন।'

হাসল মতিন 'সুযোগ পাইনি।'

'কী কাণ্ড! চলুন। এখানে একটা ভালো দোকান আছে। আমারও খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া যাক।' টিয়া হাঁটতে লাগল।

'না না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বাসায় গিয়ে খেয়ে নেব।'

'বাসায়। ও। তা বাসায় আপনার সঙ্গীরা যে বসে আছে তা কী করে মনে করছেন? দরজায় তালা ঝুলতে পারে। চাবি আছে সঙ্গে?'

'না।' মাথা নাড়ল মতিন।

'আসুন।'

পরোটা আর মাংস খেতে খুব ভালো লাগছিল মতিনের। সে বলেই ফেলল, 'খুব মজা লাগছে। এদেশে এই খাবার পাওয়া যায় ভাবতে পারিনি।'

'এদেশে বাংলাদেশের সব কিছু পাওয়া যায়। টিয়া বলল, 'আর নেবেন? পেট নিশ্চয়ই ভরেনি।'

'না, না। আর নেব না। অনেকক্ষণ খাইনি, এখন বেশি খাওয়া ঠিক না। এই দোকানটা কি ইন্ডিয়ানদের? সে ব্যস্ত কর্মচারীদের দিকে তাকাল।

'নাঃ। এটা পাকিস্তানিদের।'

'কী? আপনি এই দোকানে ঢুকলেন কেন? ছি ছি!'

'কেন? কী হয়েছে?'

'এই পাকিস্তানিরা আমাদের দেশে কী ভয়ংকর অত্যাচার করেছে তা ভুলে গেলেন? এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের দেশের কত মানুষ শহিদ হয়েছেন। ওদের তাড়িয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এসব ভুলে গেলেন?'

চোখ বন্ধ করে শুনছিল টিয়া। এবার হেসে ফেলল, 'আপনার মাথা ঠিক নেই। এই মানুষগুলো কি আমাদের দেশে গিয়ে অত্যাচার করেছে?

'এরা হয়তো করেনি, পাকিস্তানিরা করেছে।'

'বেশ। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে দুশো বছর। প্রচুর অত্যাচার করেছিল তারা। চট্টগ্রামে সূর্যসেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বলে তাঁর ফাঁসি দিয়েছে ওরা। তাহলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিম যখন চট্টগ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলে, তখন হাজার হাজার মানুষ দেখতে যায় কেন? তা হলে তো আমাদের ইংরেজি সাহিত্য পড়া উচিত নয়। যা এখন অতীত হয়ে গেছে তাকে কি চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা যায়? তা হলে কোনও ভিয়েতনামের মানুষ এদেশে আসত না। চলুন।'

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার সময় টিয়া এক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'আবার আসবেন।'

রাস্তায় বেরিয়ে মতিন বলল, 'লোকটাকে দেখে বাঙালি বলে মনে হয় না।'

'ঠিকই। উনি পাকিস্তানের মানুষ। করাচিতে থাকতেন। দশ বছর ঢাকায় ছিলেন বলে ভালো বাংলা বলতে পারেন।' টিয়া হাসল।

এখন রাস্তায় বেশ ভিড়। বাংলা শব্দ শোনা যাচ্ছে চারপাশে। এই জনতার প্রায় সবাই বাংলাদেশের মানুষ। আমেরিকার এই এলাকাকে যেন ওরা বাংলাদেশ করে ফেলেছে। হাঁটতে হাঁটতে টিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কাল আপনার সঙ্গীরা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল মতিন।

'আপনি কোথায় থাকবেন?'

'আমি সাতদিন ওই ফ্ল্যাটেই থাকতে পারব, তার মধ্যে থাকার জায়গা খুঁজতে হবে। আচ্ছা, আমি কী ধরনের কাজ পেতে পারি? দেশে আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছিলাম, কিন্তু তার সার্টিফিকেট তো সঙ্গে নেই।' মতিন বলল।

'থাকলেও সেটা কোন কাজে লাগত বলে মনে হয় না। কিছু মনে করবেন না, আপনার ইংরেজিও ভালো না। একটু ভেবে বলব।' টিয়া বলল।

'সেলসম্যানের কাজ—?'

'আপনাকে দিতে চাইবে না। রেস্টুরেন্ট বা স্টোরে যেসব বাংলাদেশি, এশিয়ান কাজ করে তাদের অধিকাংশেরই এদেশে থাকার বৈধ কাগজপত্র নেই। তাই মালিকরা ওদের এক্সপ্লয়েট করে। যা ডলার দেওয়া উচিত তার অর্ধেকও দেয় না। আপনার কাছে বৈধ কাগজ আছে। তাই আপনাকে চাকরি দিতে উৎসাহী হবে না। অবশ্য আপনি যদি মিথ্যে কথা বলেন, কাগজপত্র নেই বলে জানান তা হলে চাকরি পেতে পারেন।' টিয়া দাঁড়াল, 'আমি একটু কেনাকাটা করে যাব। পরে দ্যাখা হবে।'

টিয়া এগিয়ে যেতে মতিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ও যা বলে গেল, তাতে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ল। মুর্শেদের সঙ্গে কথা না বলে উপায় নেই। হঠাৎ তার মনে হল টিয়া তাকে অনেক কথা বলেছে কিন্তু নিজের কোনও কথা বলেনি। ওই ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে আর কে থাকে, সেই প্রসঙ্গ তোলেনি। একটু আগে স্টেশনে যে ছেলেটিকে ওর সাথে দ্যাখা গিয়েছে সে কে? কী সম্পর্ক টিয়ার সঙ্গে? এতক্ষণ কথা বলল, খাওয়া হল কিন্তু ছেলেটির কথা বলল না। মতিনেরও মনে হয়েছে, কৌতূহল দ্যাখানো ভালো নয়। কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মনে তো প্রশ্ন আসেই।

ফ্ল্যাটটির সামনে এসে অবাক হল মতিন। বাইরে তালা নেই। দরজায় শব্দ করতেই জিয়া এসে খুলল, 'আরে! আমরা ভাবছিলাম তুমি নিউইয়র্কের রাস্তায় হারিয়ে গেছ।'

মুর্শেদ ছিল চেয়ারে বসে। বলল, 'স্যরি ভাই, যেতে পারিনি। বেশি বয়সে বিয়ে করে কী ফেঁসে গেছি! তারপর ভাবলাম, তোমাকে সুযোগ দেওয়া দরকার। যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছ সেই রাস্তায় নিশ্চয়ই ফিরতে পারবে। কাজ হল?'

পকেট থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল মতিন। ভেতর থেকে কাগজ বের করে পড়ার পর উল্লসিত হল মুর্শেদ, 'সাবাস। দু-মাস তোমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না।' তারপর অন্য দুজনকে চিঠির বিষয়বস্তু জার্নাল মুর্শেদ।

শাজাহান বলল, 'একদম চিন্তা কোরো না। সাহেব তাঁর ভাগনের পাসপোর্টের ডুপ্লিকেট দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। খুব ভালো খবর।'

জিয়া উৎফুল্ল হল, 'বাঃ। মুর্শেদভাই আমাদের আনন্দ করার একটা উপলক্ষ্য হল। মতিনভাই, রেডি হয়ে নাও। পোশাক বদলাও। আজ আমাদের এদেশে শেষ রাত। মুর্শেদভাই আমাদের একটা নাইট ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছে।'

শাজাহান বলল, 'মতিন আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার সমস্যা হবে না তো?'

মুর্শেদ হাসল, 'সাহেব না জানলে কোনও সমস্যা নেই।'

জিয়া বলল, 'আরে' ও কি এখনও বাচ্চা আছে? কবে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে।'

মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনারা যান। আমি খুব ক্লান্ত। সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন ঘুম পাচ্ছে।'

মুর্শেদ বলল, 'এটা খুব স্বাভাবিক।'

খানিকবাদে ওরা বেরিয়ে গেল সেজেগুজে। মতিনকে যেন দরজা খুলতে উঠতে না হয়, তাই বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেল।

*

ভালো করে স্নান করে মতিন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখন এই সন্ধে পার হওয়ার পরেও রাস্তায় কত লোক। এই লোকগুলোর একজনকেও সে চেনে না। আগামীকাল শাজাহান-জিয়া ফিরে যাবে বাংলাদেশে! তখন মুর্শেদ ছাড়া কাউকে সে পাবে না। আর মুর্শেদ যে তাকে সময় দেবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার কাছে এখন যে কয়েকটা ডলার পড়ে আছে তাতে ক'দিন রান্না করে খাওয়া যাবে তা সে নিজেই জানে না। মন খুব মিইয়ে যাচ্ছিল মতিনের।

হঠাৎ সে টিয়াকে দেখতে পেল। দু-হাতে বড় বড় প্যাকেট নিয়ে উলটো ফুটপাথে অপেক্ষা করছে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে। সারাদিন কাজ করেও মেয়েটা বাসার জন্যে বাজার করে নিয়ে আসছে। এত প্রাণ পায় কী করে টিয়া? তার মনে হচ্ছিল, বাংলাদেশের একটা মেয়ে যদি নিউইয়র্কে এসে একা লড়াই করেও হাসিমুখে বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে সে পারবে না কেন?

এইসময় ওপরের দিকে মুখ তুলল টিয়া। সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ল মতিন। টিয়া হাসল। আলোর সংকেত বদল হতেই রাস্তা পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

জানলা বন্ধ করল। নিজের বিছানার কাছে সে এসে দাঁড়াতেই দরজায় নক্ হল। সে কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেল, 'আমি।'

তৎক্ষণাৎ বুঝতে অসুবিধে হল না, কণ্ঠস্বর টিয়ার। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করেও পারল না। তখন মনে পড়ল, শাজাহান বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছে। তালাটা কড়ায় লাগালে সামান্য ফাঁক হত, ওটা দরজার গায়ে সাঁটা হুড়কোতে লাগানোয় সেই সুযোগ বন্ধ।

'আপনি কি একা?' টিয়ার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে বাইরে তালা লাগানো কেন?'

কী জবাব দেবে মতিন?

'আচ্ছা, চলি।' টিয়া চলে গেল।

বন্ধ দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে রইল মতিন।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

জিয়াভাই এবং শাজাহানভাই হাত নাড়তে নাড়তে সিকিউরিটির ঘেরাটোপে ঢুকে গেল। বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠল মতিনের। ওই দুজনের সঙ্গে তারও তো আজ ঢাকার ফেরার কথা ছিল। গার্মেন্টসের মেলায় ব্যবসা করতে কামাল হোসেন তাদের পাঠিয়েছিল নিউইয়র্কে। কাজ শেষ করে ওরা ফিরে যাচ্ছে দেশে, সে যেতে পারল না। তার পাসপোর্টটা যে ওভাবে পকেটমার তুলে নেবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। আর পাসপোর্ট ছাড়া তো প্লেনে উঠতেই দেবে না। কামাল হোসেন তার মামা। বিশাল ব্যবসা। কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খুব খারাপ। মুখ দ্যাখাদেখি বন্ধ। এই যে সে ভাগ্যচক্রে নিউইয়র্কে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, কামাল হোসেন ঠিকই বলেছেন, বাবা ভেবে নেবেন এটা তাঁর মামার চক্রান্ত। মুর্শেদভাই বলল, 'চলে, না যাই।'

এই মুর্শেদভাই লোকটা একটু অন্যরকম, কামাল হোসেনের আমেরিকার ব্যবসার ম্যানেজার। কিন্তু সবসময় মনে হয় উনি টেনশনে আছেন। পাসপোর্ট হারাবার পর উনি পরামর্শ দিয়েছিলেন বলেই তার হাতে এদেশে অন্তত দু-মাস থাকার বৈধ-কাগজ রয়েছে। কিন্তু লোকটা এমন মুখ করে থাকে যে ওকে জিজ্ঞাসাই করা যাচ্ছে না, যতদিন দেশ থেকে নতুন পাসপোর্ট না আসছে ততদিন

সে কী করে থাকবে? সাতদিনের জন্যে যে ফ্ল্যাটে ছিল সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর? পকেটে যা আছে তাতে ক'দিন খেতে পারবে?

মুর্শেদের পাশে হাঁটছিল মতিন। বিশাল হল ঘর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের ভিড় এখানে। আসবার সময় দেখেছে ঢাকায় বিমানবন্দরে টিকিট হাতে না থাকলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে সেই নিয়ম নেই। শাজাহান ভাইদের সঙ্গে তারাও স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকেছিল। ওরা লাইন দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে মালপত্র এয়ার হাউসের হাতে জমা করে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হল। বিশাল মেলার মতো হলঘর ঘুরে ওরা যখন সিকিউরিটি জোনের দিকে এগিয়ে গেল তখনও ওরা সঙ্গে ছিল। দেশের নিয়ম যদি এখানে চালু থাকত তা হলে রাস্তা থেকেই বিদায় জানাতে হত।

গরম জল কিনে চা চিনি দুধ মিশিয়ে একটা টেবিলে মুর্শেদ বসল। মতিনের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মাত্র দুটো রুম। একটায় আমরা থাকি অন্যটায় বাচ্চারা। তা ছাড়া, কিছু মনে করো না, আমার স্ত্রী একটু রাগী প্রকৃতির।

'ও।' চায়ের কাপ তুলল মতিন।

'আমাদের বয়সের ডিফারেন্স বেশ বেশি।' কেমন উদাস উদাস গলায় বলল মুর্শেদ।

মতিন দেখল তাদের টেবিলের অন্য প্রান্তের চেয়ারে এসে বসলেন এক মহিলা। গায়ের রং তামাটে। কিন্তু প্রচুর সেজেছেন। পরনে বিচিত্র রঙের লম্বা ঝুলের স্কার্ট। ঠোঁটে পুরু রং, চোখ এঁকেছেন সময় নিয়ে। চোখাচোখি হতে হাসলেন। ইনি কোন দেশের মানুষ? মুর্শেদ লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'তাকিও না। ইংরেজি জানে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে এখানে আছে কী করে?'

'নিউইয়র্ক এমন একটা শহর যেখানে কোনও ভাষা না জানলেও চলে যায়।'

'ইনি কোন দেশের?'

'সাউথ আমেরিকার কোনও দেশ হবে।'

'এই জায়গাটা অদ্ভুত।' মতিন বলল, 'বোধহয় পৃথিবীর সব দেশের লোক এখানে আছে।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে কাগজের কাপগুলো তুলে গারবেজে ফেলতে গেল মুর্শেদ, সেইসময় মহিলা সরু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাকিস্তানি?'

'নোঃ। আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ।' উঠে দাঁড়াল মতিন।

টেবিল থেকে সরে আসতেই মুর্শেদ ফিরে এল।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমাকে কি পাকিস্তানিদের মতো দেখতে?'

'না তো। কেন?'

'ওই মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন আমি পাকিস্তানি কি না?'

'ও বোধহয় বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার নাম শোনেনি, পাকিস্তানের নাম জানে?

'আশ্চর্য! পাকিস্তানের সৈন্যদের আমাদের দেশের মানুষ তাড়িয়েছে, তাদের চামচা রাজাকারদের আমি ঘৃণা করি, আর আমাকেই কিনা—!'

'শোনো মতিন। এটা নিউইয়র্ক। এখানে সবকথা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে। চলো।' মুর্শেদ এগোল।

ট্রেন থেকে নামল না মুর্শেদ। একশোটা ডলার তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি তো রাস্তা চেনো, চলে যাও। চেষ্টা কর যাতে একটা কাজ জোটাতে পার। জ্যাকসন হাইটে প্রচুর দোকান। পেতে অসুবিধে হবে না। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মতিনকে দিল সে, 'এটাও রেখে দাও।'

'আপনি যাবেন না?'

'আমি ফোনটাকে সুইচ্-অফ করে রেখেছি নইলে পাঁচ মিনিট অন্তর গর্জন করত। কিছু মনে কোরো না,' মুর্শেদ বলল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে সিঁড়ি ভেঙে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ওপরে উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হল না। ওপরে ওঠার পর পরিচিত জায়গা দেখতে পেল মতিন। সে এমন ভাবে হাঁটতে লাগল যেন তার বাবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে।

দুপাশে নানান ধরনের দোকান। রাত হয়ে যাওয়া জ্যাকসন হাইটের ফুটপাথে মানুষের ভিড় এখনও কমেনি, হাঁটতে হাঁটতে একটি নারীকে সে বলতে শুনল, 'নো, আই ডোন্ট লাভ ইউ।' চমকে দেখার চেষ্টা করল মতিন, কে এমন কথা বলছে? সে হতভম্ব হয়ে গেল? তার পেছনে একটি যুবক ছাড়া কেউ নেই। যুবকটি বেশ রোগা, মাঝারি, লম্বা, কানে দুল এবং ঘাড়ের পেছনের চুল গার্ডারে মোড়া। গলার স্বর একবারে মেয়েদের মতো। সে দাঁড়িয়ে পড়তেই যুবক পাশে এসে গেল। সরু গলায় বলল, 'হাই! আর ইউ লোনলি? একটা চোখ ছোট করল সে।

বোকার মতো সত্যি কথা বলে ফেলল মতিন। 'হ্যাঁ. ইয়েস।'

'লেটস গো। জ্যাস্ট টু ব্লক ওয়াকিং। ইউ উইল বি হ্যাপি মাই ডিয়ার। নট-মাচ, হান্ড্রেড বাক্।' ছেলেটি মতিনের হাত ধরতে চাইল।

ঝট করে হাত সরিয়ে নিল। বলে কী ছেলেটা তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল সে। পেছন পেছন আসছিল ছেলেটা তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল হতাশ হয়ে।

হাঁটার সময় কোনদিকে হাঁটছে তা খেয়াল করেনি মতিন। ছেলেটার কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে যেতে শুধুই জোরে হেঁটে গেছে। যখন বুঝল ধারে কাছে ছেলেটা নেই, সে নির্জন ফুটপাথে একা দাঁড়িয়ে আছে তখন স্থির হল, হাঁপাচ্ছিল সে। সেটা কমে গেলে হঠাৎ মতিনের মনে হল ছেলেটা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আর ইউ লোনলি? কী আশ্চর্য! এই বিশাল দেশের বিরাট শহরে সে তো একাই, একদম একা।

রাত বাড়ছিল। মতিন বুঝতে পারছিল সে বাড়িতে ফেরার পথ গুলিয়ে ফেলেছে। এই ক'দিনে সে যে পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে তা খুঁজে বের করতে হাঁটতে লাগল সে। কিন্তু ক্রমশ মনে হতে লাগল আরও দূরে চলে যাচ্ছে। সে যে ঘরে ছিল তার জানলা থেকে পথের উলটোদিকে তাকালে বড় মল ছিল। মলের বাইরে লম্বা বেঞ্চিতে ঝুড়ি ভরতি সবই দ্যাখা যেত। টিয়াকে ওখান থেকেই রাস্তা পার হতে দেখেছিল।

টিয়ার দ্যাখা যদি পাওয়া যেত। সে যে ঘরে থাকে তার পাশের ঘরেই টিয়ার বাস, এমন কিন্তু আলাপ নয় যে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন সে টিয়ার কথা ভাবছে কেন? তাকে তো বাড়ির পথ খুঁজতে হবে।

দুজন শাড়িপরা মহিলাকে দেখে মতিন ভাবল ওদের জিজ্ঞাসা করা যাক। কিন্তু ঠিকানাটাই মুখস্থ করে রাখেনি। কী জিজ্ঞাসা করবে ওদের? পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বললেন, 'দেখি, কাল আবার আসব। যদি ইলিশ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শেদের দেওয়া কার্ডটার কথা মনে পড়তেই সে চট করে বের করে দেখে নিল, একটা টেলিফোন নাম্বার রয়েছে। একটু দ্রুত হেটে মহিলাদের পাশে গিয়ে সে করুণগলায় বলল, 'আপা, একটা উপকার করবেন, প্লিজ।'

এবার দ্বিতীয় মহিলা হাত নাড়লেন, 'না, টাকা দিতে পারব না।'

'আমি টাকা চাইছি না। যে বাসায় উঠেছিলাম তার পথ হারিয়ে ফেলেছি। এই কার্ডের নাম্বারে ফোন করে যদি বলে দেন—।'

প্রথম মহিলা হাসলেন, 'কবে এসেছেন?'

'এক সপ্তাহ হয়নি।'

'কোথায় থাকতেন, কোন জেলায়?'

'ঢাকায়।'

দ্বিতীয় মহিলা বললেন, 'বাংলাদেশ থেকে যে-ই আসে বলে ঢাকা থেকে আসছি। ঢপ দেওয়ার জায়গা পায় না। আপনি এখানে বাসা থেকে একা বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ ঠিকানা সঙ্গে রাখেননি, চিনতেও পারছেন না? অদ্ভুত!'

প্রথম মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে মোবাইল নেই?'

'না।' মাথা নাড়ল মতিন।

কার্ডটা নিয়ে প্রথম মহিলা নাম্বারটা দেখলেন, 'কী নাম আপনার?'

'মতিন।'

'ইনি কে হন?'

'আমার মামার ব্যবসার ম্যানেজার।'

'আপনার মামার নাম কী?'

'কামাল হোসেন।'

দ্বিতীয় মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন কামাল হোসেন?'

'উনি ঢাকায় ব্যবসা করেন।'

'তিনি নিশ্চয়ই গার্মেন্টস মার্চেন্ট কামাল হোসেন নন?'

'আপা, তিনিই আমার মামা।'

'দ্বিতীয় মহিলা কিছু বলার আগেই প্রথম মহিলা তাঁর মোবাইলের বোতাম টিপলেন, 'আপনি কি মুর্শেদ ভাই? ওঃ, এখানে কথা বলুন। ফোনটা মতিনের হাতে দিয়ে প্রথম মহিলা বললেন, 'একজন মহিলা—!'

মতিন বেশ নার্ভাস গলায় হ্যালো বলল।

'আপনি কে? কী চাই?'

'আজ্ঞে, আমি মতিন। ঢাকা থেকে এসেছি। মুর্শেদভাই আছেন?'

'একটু আগে যে মেয়েটা কথা বলল সে কে?'

'আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম ফোনটা ধরে দিতে!'

'মুর্শেদ ওকে চেনে?'

'না-না!'

'মুর্শেদকে কী দরকার?'

'আমি কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে এসেছি। এখন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মুর্শেদভাই-এর কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিতাম।'

'মিথ্যে কথা! তারা সব আজ দেশে ফিরে গেছে।'

'আমি যেতে পারিনি' আমি কামাল হোসেন সাহেবের ভাগিনা।'

'ও মা! এতক্ষণ বলেননি কেন? আপনাকে বললে বুঝবেন না। ওই মেয়েটাকে দিন। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আলাপ হল কী করে?' গলার স্বর এখন খুব নরম।

'এই রাস্তায়। ওঁকে ফোন করতে রিকোয়েস্ট করেছিলাম।' মোবাইল ফোন প্রথম ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে সে ইশারা করল কথা বলতে।

ঠিকানার হদিশ পেয়ে প্রথম ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'আপনি বেশিদূরে আসেননি। এই পথ ধরে সোজা চলে যান, প্রথম মোড় ছেড়ে দেবেন, দ্বিতীয় মোড়ে গিয়ে ডানদিকে হাঁটলেই একটা

বড় মল দেখতে পাবেন, বাইরে সবজি রাখা আছে, সেখানেই আপনার বাসা। ওখানে গেলে চিনতে পারবেন?

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।' হাত জোড় করে বলল মতিন।

দুই মহিলা হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

বাড়িটাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। ওপরে উঠে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল মতিন। তারপর জামা-প্যান্ট পরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। কেবলই মনে হচ্ছিল তার কাছে যদি মুর্শেদের কার্ডটা না থাকত? এখন থেকে যখনই বের হবে এই বাড়ির ঠিকানা কাগজে লিখে নিয়ে বের হবে। তবে সেটা তো মাত্র সাতদিনের জন্যে। তারপর? এই ঘর তো ছেড়ে দিতে হবে।

মতিন মাথা নাড়ল। তারমধ্যে নিশ্চয়ই মামা ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। মুর্শেদ বলেছিল বউ-এর কারণে সে ফোন সুইচ অফ করে রেখেছে। বাপরে বাপ! কী ভয়ংকর মহিলা। কিন্তু ফোনটা বউ-এর কাছে দিয়ে লোকটা কোথায় গেল। অবশ্য মামার নাম শোনার পর মহিলার গলার স্বর একদম বদলে গিয়েছিল। বন্ধুরা বলত, মেয়েরা অভিনেত্রী হয়েই নাকি জন্মায়।

সে চারপাশে তাকাল। আজ দুপুর পর্যন্ত শাজাহান আর জিয়াভাই এখানে ছিল। তখন একটুও একা মনে হত না নিজেকে। এখন ওরা প্লেনের সিটে বসে আছে। আর সে—! খিদে পাচ্ছে বলে বোধ করল মতিন। উঠে ফ্রিজ খুলে দেখল দুপুরের উচ্ছে-ভাত আর আলুভর্তা রেখে গিয়েছে শাজাহান ভাই। সে ওগুলো বের করে মাইক্রোওভেনে গরম করে নিয়ে খেতে বসে গেল। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভর্তা আর ভাত মুখে তুলতে বেশ আরাম হল। কাল থেকে তাকে রান্না করতে হবে।

দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল মতিনের। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখল ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। সে শুয়েছিল লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে। ভোরের দিকে শীত শীত করায় বিছানার চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকেছিল। এখন বিছানা থেকে নেমে চেঁচিয়ে বলল, 'এক মিনিট, খুলছি!' শব্দটা থেমে গেল।

এত দ্রুত মুখ ধোয়া এবং শার্ট-প্যান্ট পরে নেওয়ার কথা আগে ভাবেনি মতিন। কিন্তু নিউইর্য়কে তো অচেনা মানুষের সামনে লুঙ্গি পরে দাঁড়ানো যায় না। আর চেনা মানুষ টিয়া যদি দরজার ওপারে থাকে তা হলে তো কথাই নেই।

দরজা খুলতেই মুর্শেদ এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার? নেশা করে ঘুমাচ্ছিলে নাকি? বেল বাজালাম সাড়া পেলাম না। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি আর ভাবছি পুলিশকে ডাকব কি না!'

'একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!' লজ্জিত গলায় বলল মতিন

'এই যে, এসো।' পেছন ফিরে ডাকল মুর্শেদ। মতিন দেখল সালোয়ার কামিজ পরা একজন মহিলা হাসিমুখে এগিয়ে আসছে সিঁড়ির মুখ থেকে।

মুর্শেদ বলল, 'তোমার ভাবি।'

তাড়াতাড়ি দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মতিন বলল, 'আসলাম আলেকুম।'

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'আলেকুম আসলাম।'

মতিন বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকে মুর্শেদের বউ বলল, 'আপনি তো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। কাল শুনলাম রাস্তা হারিয়ে ঘুরে মরছেন, এখন দেখছি ঘুমের মধ্যে মরে থাকছেন। এরকম মানুষের পক্ষে নিউইয়র্কে সামলে থাকা সমস্যার হবে।'

'কোনও সমস্যা নেই। কয়েকদিন পরেই তো সে চলে যাচ্ছে।' মুর্শেদ বলল।

'ভাই চুপ করো। আমাদের দেশের লোকদের ষোলো মাসে বছর হয়। পাসপোর্ট পেলে তো

যাওয়ার প্রশ্ন। তবে আপনার সুবিধা আছে, কামাল হোসেন সাহেব আপনার মামা। তাই দশমাসেও বছর হতে পারে।'

তিনজনে বসার পর মুর্শেদের বউ বলল, 'চা করার ব্যবস্থা আছে?'

'হ্যাঁ। আপনারা বসুন, আমি এক্ষুনি করে আনছি—!'

'আপনি বসুন। ইনি খুব ভালো চা করেন, যাও না, চা করে নিয়ে এসো।'

মুর্শেদ আড়চোখে বউকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

মতিন বলল, 'চলুন, মুর্শেদভাই, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি!'

'আরে! আপনি তো কয়েকদিন আছেন এখানে। ও আপনার চেয়ে এই ঘরের সব কিছু বেশি জানে। বসুন।' বেশ জোরে বলল মুর্শেদের বউ।

মতিন বলল, 'আপনারা কি কোন কাজে বেরিয়েছেন?'

'কাজ? হ্যাঁ। কাল আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ওকে বললাম, চলো দেখে আসি ঘর খুঁজে পেয়েছে কিনা।' হাসল মুর্শেদের বউ।

'কাল আপনি খুব উপকার করেছেন ভাবি।'

'অ্যাই? আপনি ভাবি বলবেন না। আমার একটা নাম আছে,' তারপর গলা তুলে মুর্শেদের বউ হুকুম করলেন, 'আমার নামটা ওকে বলে দাও তো?'

রান্নাঘর থেকে মুর্শেদের গলা ভেসে এল, 'সুলতানা।'

হাসল সুলতানা, 'নামের পর আবার আপা বলবেন না' আপনি আমাকে সুলতানা বলেই ডাকবেন মতিন।'

কথাগুলো মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল মতিনের। মুর্শেদের বউ, যার নাম সুতলানা, তার থেকে অন্তত ছয়-সাত বছরের বড়। হ্যাঁ, মুর্শেদ তাকে ঠিকই বলেছিল, ওদের মধ্যে অন্তত পনেরো বছরের পার্থক্য। ছয়-সাত বছরের বড় মহিলাকে ভাবি বা আপা না বলে নাম ধরে ডাকার শিক্ষা বা অভ্যেস মতিনের নেই। কথাগুলো সুলতানা নীচু গলায় বলেনি। রান্নাঘরে থাকলেও মুর্শেদের কানে অবশ্যই গিয়েছে। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ শুনতে পেল না মতিন। তার মনে হল, বউ যা ইচ্ছে তাই বলে, মুর্শেদ বাধা দেয় না।

'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

'দশ বছর। আগে থাকতাম ডালাসে। চার বছর। বিয়ের পর স্বামী নিয়ে গিয়ে রান্নার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে তো নানান রকমের শাকসবজি, মাছ খুব টাটকা পাওয়া যায় অথচ তিনি রান্না জানতেন না বলে খেতে পেতেন না। আমাকে তিনবেলা রাঁধতে হত।' হাসল সুলতানা।

'তিনবেলা?'

'সকালের নাস্তা, দুপুর আর রাত্রের খাবার।'

'চার বছর পরে কার অ্যাকসিডেন্ট হল, সাতদিন হাসপাতালে থাকার পর মারা গেলেন তিনি। আমাকে কখনও কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাননি। ওর মৃত্যুর পর দুই দেওর এসে ঘর-বাড়ি দখল করল। আমাকে থাকতে দিল দয়া করে। কিন্তু আইন মানলে আমারই সব পাওয়া উচিত। কিন্তু আমাকে পরামর্শ দেওয়ার, পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। দেশে খবর গিয়েছিল। বাবা অনেক চেষ্টা করেও ভিসা পাননি, পেলেই বা কী হত? আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা তো তাঁর ছিল না।' হাসল সুলতানা।

কষ্টের কথা, দুঃখের কথা বলার পর হাসি কী করে আসে? মতিন ভাবল, এটা নিছক অভ্যেস অথবা ঠিক হাসি নয়। কিন্তু মুর্শেদ তো বেঁচে আছে। অথচ উনি বললেন বিয়ের চার বছর পরে স্বামী মরে গেছে দুর্ঘটনায়, তাহলে কি মুর্শেদ দ্বিতীয় স্বামী?

সুলতানা বলল, 'কী ভাবছেন বুঝতে পেরেছি। আমাকে ঘাড় থেকে নামাতে দেওররা এত

ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তারা ঠিক আপনার মুর্শেদ ভাই-এর খবর পেয়ে গেল। ওর স্ত্রী ওকে তালাক দিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে কানাডায় চলে গিয়েছে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু তখন আমার গ্রীনকার্ড হয়নি। এই দেশে থাকলে হলে ওটা দরকার হয়। দেখলাম লোকটা খুব একটা খারাপ নয়। বিয়ে হয়ে গেল।'

এইসময় চা নিয়ে এল মুর্শেদ। টেবিলে রেখে বলল, 'সব গল্প শেষ?'

সুলতানা বলল, 'প্রথম আলাপ হল, আমাকে ওর জানা উচিত।'

চা খেতে খেতে মুর্শেদ বলল, 'এখনই চাকরি খোঁজার দরকার নেই। সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন খবরটা শুনে। আজ বললেন, যাতে পাসপোর্টের অনুমতি ওখান থেকে এখানকার দূতাবাসে পাঠানো যায়, তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারেন চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে এখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসই টেম্পোরারি পাসপোর্ট ইস্যু করে দেবে। সেটা পেলে ইউ এস ইমিগ্রেশন থেকে কাগজটা দেখিয়ে ছাপ মারিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না। কালকের টিকিটটা ক্যানসেল করে ওপেন রেখেছি। ওই টিকিটেই ফিরে যেতে পারবে।'

সুলতানা জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে মতিন এখন কী করবে?'

'এখনই কাজ খোঁজার দরকার নেই। শহরটাকে ঘুরে দ্যাখো।' মুর্শেদ বলল।

খানিকক্ষণ কথা বলার পর মুর্শেদ বলল, 'আমাকে একবার জ্যামাইকায় যেতে হবে। একটা পার্টি টাকা দেবে বলেছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

'আমি গিয়ে কী করব? তোমার কাজের সঙ্গে আমি নেই। আমি বাসায় যাব।'

'তা হলে ওঠ। মতিন, যাচ্ছি।' মুর্শেদ উঠে দাঁড়াল।

'আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি যাচ্ছ তোমার কাজে, আমাকে উঠতে বলছ কেন?' সুলতানা প্রতিবাদ করল, বলার সময় তার হাত ঘুরল।

মুর্শেদ হাসল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুলতানা হাসল, 'আগে পুরুষ মানুষ যা বলত তা মুখ বুজে মেনে নিতাম। অপছন্দ হলেও মানতে বাধ্য হতাম। এখন তা করি না। তোমার কথা বল।'

'আমার আর কী কথা আছে!' মতিন সোজা হয়ে বসল।

'আরে, দেশে কী কর, কে কে আছে—!'

'মা-বাবা আছেন? পড়াশুনা শেষ করেও চাকরি পাচ্ছি না।'

'ওমা! যার মামা অত বড় ব্যবসায়ী, অত লোক তার আন্ডারে কাজ করে, সে চাকরি পাচ্ছে না, কেউ বিশ্বাস করবে? নাকি মামার দেওয়া চাকরি নিতে চাও না?' সুলতানা প্রশ্ন করল।

'না। তা নয়। চাওয়া হয়নি, এই আর কী!'

'সেই মামাই তো আমেরিকায় পাঠাল?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দেশে ফিরে চাকরি পেলে কত মাইনে পাবে?' সুলতানা সোজা হল, 'পনেরো-বিশ-ত্রিশ হাজার। তার বেশি নিশ্চয়ই নয়। শুনেছি, দেশে এখন এক কেজি ইলিশের দাম নাকি হাজার টাকা। ওই মাইনেতে পোষাবে?'

'কী আর করা যাবে?'

'একটু বুদ্ধি খেলাও। দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চান্স পায়না আমেরিকায় আসার। ভিসা দেয় না, তুমি এসে গেছ, সুযোগটা কাজে লাগাও। এখানে তুমি দিনে চল্লিশ ডলার রোজগার কর তাহলে ছুটির দিন বাদ দিলে মাসে এক হাজার। সেটা দেশের টাকায় সত্তর হাজারের ওপরে। বল, টাকাটা কি দেশে গেলে পাবে, সুলতানা উত্তেজিত।

'কিন্তু পাসপোর্ট পেলেই তো আমাকে চলে যেতে হবে।'

'পাসপোর্ট নিয়েও তুমি থেকে যেতে পার।'

'কী করে?'

'না গেলেই হল। এদেশে কেউ কারও খবর রাখে না।'

সঙ্গে সঙ্গে ভয় এল মনে। নাঃ, এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভালো। সে বলল, 'ভেবে দেখি! আচ্ছা, আপনারা কোথায় থাকেন?'

'বেশি দূরে না। কুইন্সে।' সুলতানা বলল, 'ভেবে আমাকে জানিও। আমার এক বান্ধবীর হাসব্যান্ড গ্যাস স্টেশনে চাকরি করে। ওকে বলতে পারি। আর হ্যাঁ, তুমি আমার মোবাইল নাম্বারটা রাখো, তোমার মোবাইল নেই?'

'না।'

'যাচ্চলে! চল, বের হবে।' জোর দিয়ে বলল সুলতানা।

'কোথায়?' অবাক হল মতিন।

ঘড়ি দেখল সুলতানা, 'খুলে গেছে, চল, একটু হাঁটাহাঁটি করি।'

ঘরে তালা দিয়ে বেরুনোর সময় টিয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকাল মতিন। দরজা বন্ধ। টিয়া নিশ্চয়ই কাজে বেরিয়ে গেছে।

জ্যাকসন হাইটের এই না সকাল না দুপুর সময়টায় রাস্তায় মানুষের ভিড় জমেনি। দুপুরের পর তো মেলা বসে যায়। মতিন লক্ষ্য করল সুলতানা বেশ লম্বা। এই মহিলা বিয়ের প্রথম কয়েক বছর গৃহবন্দি হয়েছিল, দেখলে বোঝাই যায় না। হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল সুলতানা। মোবাইলের বোতাম টিপে কথা বলল, 'কোথায় তুমি?' উত্তর শুনে বলল, 'আমার বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে। আসার আগে ফোন কোরো।' তারপর ফোন রেখে বলল, 'নিউইয়র্ক শহরটা খুব বড়। ট্রেনে এখান থেকে ম্যানহাটন যেতেই এক ঘণ্টা লেগে যায়।'

মতিন সহজ হল? বলল, 'ঢাকাতেও তাই। দুপুরের পর গুলনান থেকে বাংলা আকাদেমি যেতে অনেক সময় তার বেশি সময় লাগে। রাত্রে লাগে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।'

'তার মানে?' চোখ কপালে তুলল সুলতানা।

'আপনি নিশ্চয়ই অনেকদিন দেশে যাননি?'

'এখানে আসার পর আর যাইনি।'

'তখন শুনেছিলাম একবার দেশে ফিরে গেলে আর এদেশে আসা যাবে না। নতুন করে ভিসা নিতে হবে। যা পাওয়া নাকি সম্ভব নয়।' সুলতানা বলল।

'এখন?'

'এখন আমার গ্রীনকার্ড হয়ে গেছে। যতবার ইচ্ছে যেতে পারি, কিন্তু কার কাছে যাব? আব্বা, আম্মা নেই। এক বোন ছিল, সে এখন টরেন্টোয়।'

'তাই আপনি জানেন না। ঢাকার রাস্তায় এখন এত গাড়ি আর রিকশা চলে যে সবসময় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে। কখনই ঠিক সময় কোথাও যাওয়া যায় না।

সুলতানা হাসল, 'তা হলে তো তোমার এখানেই থেকে যাওয়া উচিত। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

সুলতানা কাচের দরজা ঠেলে পাশের দোকানে ঢুকে গেল। ফুটপাথ থেকে মতিন দেখতে পেল দোকানের মালিক খুব হেসে হেসে সুলতানার সঙ্গে কথা বলছেন। সে চারপাশে তাকাল। এই জায়গাটাকে প্রায় বাংলাদেশ বলেই মনে হচ্ছে। মাঝেমাঝেই বাংলা শব্দ কানে আসছে। দোকানগুলো হয় ভারতীয়দের নয় পাকিস্তানির অথবা বাংলাদেশের মানুষদের। এখানে ইংরেজি না জানলেও কোনও অসুবিধে নেই।

এইসময় চারটে ছেলেকে সে দেখতে পেল। জিনস, গেঞ্জি, হাতে উল্কি এবং কানে দুল।

তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা দাঁড়িয়ে গেল। একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'ট্যুরিস্ট?'

মাথা নাড়ল মতিন, 'নো।'

'বাংলাদেশ?'

'ইয়েস।'

সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় প্রশ্ন হল, 'থাকার ইচ্ছা আছে নাকি? থাকলে বল, সেলাম। কুইক, কুইক, জলদি বল।' ছেলেটা মস্তক নাড়ল।

ওদের মধ্যে যে বড় সে ছেলেটাকে ধমকালো, 'ফালতু ঝামেলা। চল।' বলে সুলতানা যে দোকানে ঢুকেছে তার দরজায় টোকা মারল। মতিন দেখলে তাকে যে ছেলেটি প্রশ্ন করছিল সে ইশারায় কাছে ডাকছে। কয়েক পা যেতেই ছেলেটা বলল, 'আমাদের পেছনে দাঁড়াও। চুপচাপ।'

দোকানের মালিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কাচের দরজা ঠেলে, 'কী ব্যাপার?'

বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে কখনও হুজ্জতি করেছি ভাই?'

'আমি কি একথা বলেছি?' ভদ্রলোক গম্ভীর।

'তাহলে পুলিশ আমাকে ডেকে ওয়ার্নিং দিল কেন?'

'কেন দিল আমি জানি না।' মাথা নাড়লেন মালিক।

'আপনি রফিকের দলকে টাকা দিয়েছেন?'

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? কোথায় প্রত্যেক মাসে এসে টাকা নিয়ে যাও, আমি এ নিয়ে কিছু বলেছি?' রেগে গেলেন ভদ্রলোক।

'দেখুন ভাই, আমরা এমনি এমনি টাকা নিই না। কোনও ঝামেলা হলে পুলিশ আসার আগেই আমরা ম্যানেজ করি। এশিয়ানদের পাড়া বলে তো পুলিশ এখানে আসতেই চায় না। রাত্রে এই রাস্তার সব দোকানগুলোকে আমরাই গার্ড দিই। কি দিই না। অথচ আপনি বলেছেন আমরা হুজ্জতি করে তোলা আদায় করি। খুব খারাপ ব্যাপার। আমরা আপনার উপকার করছি আর আপনি দোষ দিচ্ছেন। দলের কারও মাথা গরম হয়ে গেলে সে যদি পাথর ছোঁড়ে তাহলে এই কাচ ভাঙবে, কত লোকসান হবে আপনার, বলুন তো? এবার কথা বলার সময় একটু ভাববেন। দিন।'

'দিন মানে? এখনও দুদিন বাকি আছে?'

'অ্যাডভান্স দিন, দিতে তো হবেই।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে পার্স বের করে একটা একশো ডলারের নোট এগিয়ে দিতেই ছেলেটা খপ করে নিয়ে বলল, আরও পঁচিশ দিন।'

'তার মানে? একশো দেওয়ার কথা হয়েছিল!'

'ঠিক। গুণে দেখুন। চার থেকে পাঁচ হয়েছি। লোকের রোজগার বাড়ে, পঁচিশ করে ভাগ হত, এটা ভাগ করলে কুড়ি করে পাব। পঁচিশ দিলে লস হয় না। যা বাজার, সবই তো জানেন। তার ওপর পুলিশের ব্যাপারটা—।

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে পঁচিশ ডলার দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মতিন দেখল তিনি আগের মতন সুলতানার সঙ্গে হেসে কথা বলছেন।

ছেলেগুলো চলে গেল। দ্রুত দোকানের সামনে থেকে সরে এল সে। ওরা ওকে দেখিয়ে পঁচিশ ডলার বেশি আদায় করল। ঢাকায় যারা তোলা তোলে তাদের প্রায়ই পুলিশ ধরে, খুব পেটায় বলে শুনেছে। ছাড়া পেলে আবার একই কাজ করে তারা। সেই দলের কয়েকজন নিউইয়র্কে চলে এসেছে নাকি?

একটু পরে সুলতানা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পায়নি?'

পাচ্ছিল। এক কাপ চা কি রাত্রের খিদে দূর করতে পারে।

'চল। ম্যাকডোনাল্ডে যাই। আমার ওখানে খেতে খুব ভালো লাগে।'

ম্যাকডোনাল্ড শব্দটি প্রথম শুনল মতিন। সেটা কীরকম জায়গা? নিশ্চয়ই খাবার পাওয়া যায় কিন্তু তার দাম কি খুব বেশি? মতিনের মনে হল তার কাছে যে ডলার আছে তা দিয়ে সে স্বচ্ছন্দে খাবারের দাম দিতে পারে। সুলতানাকেই তার খাওয়ানো উচিত। মহিলা তাকে সময় দিচ্ছেন এটাই তো অনেক।

হাঁটতে হাঁটতে ছেলেগুলোর কথা বলল মতিন। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল সুলতানা, 'একদম কথা বলবে না ওদের সঙ্গে। বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো হনুমান ওরা। কোনও পিছুটান নেই যাদের তাদের হারাবার ভয়ডর থাকে না। জেলে থাকলেও যা বাইরেও তা। কী করে যে এদেশে থেকে গেছে তা আল্লাই জানেন।'

'ওরা তোলা তোলে?'

'সব দোকানদার যদি এককাট্টা হত তাহলে তোলার বদলে পটল তুলত।' মুখ বেঁকাল সুলতানা, 'ওদের দেখলেই দূর থেকে এড়িয়ে যাবে।'

'এম' লেখা রেস্টুরেন্টটাই ম্যাকডোনাল্ড। সুন্দর রঙিন টেবিলে মতিনকে বসিয়ে তার জিম্মায় ব্যাগ রেখে সুলতানা চলে গেল কাউন্টারে। মতিন ভাবল, নিশ্চয়ই অর্ডার দিতে গেছে। ওয়েটার যখন বিল নিয়ে আসবে তখন সে জোর করে পেমেন্ট করবে। দূর থেকে সে দেখতে পেল কাউন্টারের ওপরের বোর্ডটাকে। তাতে নানানরকমের খাবার আর তাদের দাম লেখা। বেশিরভাগ দামই দেড় থেকে আট ডলারের মধ্যে। তাকে বলা হয়েছে এখানে একটা ডলারকে সত্তর টাকা ভাববে না। একটা টাকাই ভাববে? সেরকম ভাবলে তো দেড় টাকা আট টাকা এখানকার খাবারের দাম।

সুলতানা ফিরে এল একটা ট্রে-র ওপর দুরকমের খাবার আর কফির গ্লাস নিয়ে। উলটোদিকে বসে বলল, 'এখানকার আলুভাজা খেতে খুব মজা।'

সরু লম্বা লম্বা হলদেটে আলুভাজা এই প্রথম দেখল সে। জিজ্ঞাসা করল মতিন, 'এখানে এগুলোর নাম কী?'

'ফুড ফ্রাই। এটা হল চিকেন বার্গার। এদেশে যাকে হ্যাম বার্গার বলে তাতে কিন্তু হ্যাম থাকে না, খাও।'

সত্যি খেতে বেশ মজা লাগল। খাওয়া শেষ হলে মতিন কাউন্টারের দিকে তাকাচ্ছিল। কাউকে বিল নিয়ে আসতে দ্যাখা যাচ্ছে না। আশেপাশের টেবিলে বসে যারা খাচ্ছিল তারা খাওয়া শেষ করে ট্রে-টাকে একটা বড় কাঠের বাক্সের পেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল। সুলতানাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কিন্তু দেখতে পেল ব্যাগ খুলে কিছু বের করছে মহিলা। একটা ছোট্ট সুন্দর মোবাইল ফোন বের করে মতিনের হাতে দিল সুলতানা, 'এখন থেকে এটা তুমি ব্যবহার করবে। বিকেলের পর অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, ফোন চালু হলে সেভ করে নেবে।'

'আপনি এইটে এখন কিনলেন?' তাজ্জব হয়ে গেল মতিন।

'এদেশে ফোন ছাড়া একমিনিটও থাকা যায় না।'

'কত দাম নিল?'

'তাতে তোমার দরকার কী!'

'সেকি? না, না, এটা ঠিক নয়।'

'কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তা তোমার থেকে আমি ভালো বুঝি।'

'কিন্তু—।'

'বেশ, তুমি যখন এদেশ থেকে যাবে তখন আমাকে ফেরত দিয়ে যেও।'

ভালো করে যন্ত্রটাকে দেখল মতিন, 'খুব সুন্দর!'

সুলতানা বলল, 'প্রথম নাম্বারটা হবে আমার। তবে পরে যখন আরও নাম্বার এসে যাবে তখন আমি পিছিয়ে যাব।'

'কেন?'

'আমার নামের প্রথম অক্ষর হল 'এস'। তার আগের অক্ষরগুলো তো সামনে চলে যাবে। তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

'খুব সুন্দর। কিন্তু আপনি আমার জন্যে এত ডলার খরচ করলেন বলে খারাপ লাগছে।'

সুলতানা হেসে উঠল, 'ধরে নাও, ইনভেস্ট করলাম।'

'এখানে কারও সঙ্গে খোলা মনে কথা বলতে পারি না। তোমার মুর্শেদভাই তো আমার সঙ্গে ভাসুর শ্বশুরের মতো মুখ করে থাকেন। এখন থেকে তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারব। ওটা পকেটে রেখে দাও।' বলেই যেন খেয়াল হল সুলতানার, 'তুমি এখানে এসে বাসায় কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ। শাজাহানভাই বলেছে ফিরে গিয়ে মা-বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে।'

'ঠিক আছে। তবু তুমি ফোনটা চালু হলে নাম্বারটা ওদের দিয়ে দিও। এই বাক্সটা রাখো, এখানে তোমার ফোনের নাম্বার লেখা আছে।'

বাক্সের মধ্যে যন্ত্রটাকে ঢুকিয়ে পকেটে রাখল মতিন।

'আর কিছু খাবে?'

'না। আচ্ছা, বিল দিতে আসবে না?'

'বিল? এখানে খাবার দেওয়ার সময় কাউন্টারেই পেমেন্ট নিয়ে নেয়।'

খুব হতাশ হল মতিন, তার উচিত ছিল সুলতানার সঙ্গে কাউন্টারে যাওয়া। দ্বিতীয়বার এই ভুল করবে না।

'তোমার গার্ল ফ্রেন্ডের নাম কী?' সুলতানা ঠোঁক মোচড়াল।

'গার্ল ফ্রেণ্ড?' খুব অবাক হল মতিন, 'কেউ তো নেই।'

'ধ্যাৎ! মিথ্যে কথা। এরকম হ্যান্ডসাম ছেলেকে কোনও মেয়ে ভালো না বেসে আছে তা আমি বিশ্বাস করি না।' সুলতানা জোর দিয়ে বলল।

'বিশ্বাস করুন, কারও সঙ্গে ওই সম্পর্ক আমার হয়নি।'

'কাউকে গার্ল ফ্রেন্ড বানাবার ইচ্ছে হয়নি?'

'না। ভেবেছিলাম, চাকরি না পাওয়ার আগে ওসব করব না।'

সুলতানা একটু ভাবল, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, এখানে একা থাকবে, আমেরিকায় মেয়েমানুষের অভাব নেই। দেশের মেয়েদের মতো তারা লজ্জা, সংকোচের মধ্যে বাস করে না। যা করতে চায় সরাসরি করে। কিন্তু ইন্ডিয়া আর আমাদের দেশের মেয়েদের মন এখানকার খানিকটা আর ওখানকার খানিকটা নিয়ে গোলমালে থাকে। এই মেয়েদের এড়িয়ে চলবে তুমি।'

মতিন হাসল, 'আমি তো আর ক'দিন আছি—!'

'যদি অনেকদিন থাকতে হয় তখন আমার কথা ভুলো না! চলো।'

'ওরা ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে এল। মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখন বাসায় ফিরবেন?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকব।'

'তা কেন? ট্রেনে উঠে ম্যানহাটন চলে যাও। স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখে এসো। তা ছাড়া কত রকমের মানুষ রাস্তায় হাঁটছে, তাদের দ্যাখো।'

'আপনার ফোন প্রাণ পেলে ওসব করব।'

'তা হলে আজ আমি যাই।' কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফেরাল সুলতানা, 'মতিন, এরপর থেকে আমাকে আর আপনি বলবে না। তুমি বলো।'

মতিন দেখল সুলতানা ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

*

দুপুরে খাওয়ার চিন্তা নেই, ম্যাকডোনাল্ডের খাবারে পেট ভরে থাকায় বিকেল অবধি ঘুমিয়ে কাটাল মতিন। ঘুম থেকে উঠে চা বানাতে গিয়ে বোতলটাকে চোখে পড়ল চিনির কৌটো সরাবার সময়। জিয়াভাই রেখে গেছে। বোতলের নীচে ইঞ্চিটাক সোনালি তরল পদার্থ পড়ে আছে। ওদের কথাবার্তায় বুঝেছে যে ঢাকায় নাকি এই ধরনের মদ খাওয়ার সুযোগ ওরা পায় না। তা হলে এমন মূল্যবান বস্তু ওরা ফেলে চলে গেল কেন? আর খাওয়ার মতো ক্ষমতা কি ছিল না?

জানলা খুলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তাটা দেখল মতিন। বেশ ভিড় এখন। অলস ভঙ্গিতে অনেকেই দাঁড়িয়ে গল্প করছে ফুটপাথে। তার মতো এদেরও কি কোনও কাজকর্ম নেই? হঠাৎ ছেলেটার ওপর নজর গেল তার। এই ছেলেটাই আজ সকালে তাকে প্রশ্ন করছিল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে, ওর সঙ্গীদের দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল। মতিন দেখল ছেলেটা চমকে বাঁ-দিকে তাকিয়েই ডানদিকে দৌড়োতে লাগল ভিড়ের ফাঁক গলে। তারপরই চার-পাঁচ জনকে দ্যাখা গেল ছেলেটাকে ধাওয়া করতে। দৌড়বার সময় যেসব গালাগাল দিচ্ছে ওরা তা একেবারেই বাংলা ছাড়া কিছু নয়। ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা। ছেলেটা ধরা পড়ল কিনা কে জানে। ধরা পড়লে নিশ্চয়ই বেদম মার খাবে, দ্বিতীয় দলের শারীরিক ভাষা সেরকমই ছিল। কী অন্যায় করেছে ছেলেটা? মতিনের মনে পড়ল, ওরা দোকানের মালিককে যে রফিকের দলের কথা বলেছিল তারাই ধাওয়া করছে না তো। ছেলেটার সঙ্গীরা কোথায়? একবার রাস্তায় নেমে দেখলে হয়। ঠিক তখনই সাইরেনের আওয়াজ কানে এল। দু-দুটো পুলিশের গাড়ি ছুটে গেল ওদিকে। ফুটপাথের মানুষজন একটু আগের ঘটনায় বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, পুলিশের গাড়ি দ্যাখামাত্র পরিবেশ বেশ শান্ত হয়ে গেল।

জানলা থেকে সরে আসার মুহূর্তে টিয়াকে দেখতে পেল মতিন। ওপাশের ফুটপাথে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওর পরনে প্যান্ট আর জ্যাকেট, সম্ভবত কাজ থেকে আসছে। টিয়া মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল। হাত নাড়ল মতিন, টিয়াও দ্যাখাদেখি হাত নাড়তেই ট্রাফ্রিকের আলো পালটালো। রাস্তার এদিকে চলে আসায় তাকে আর দেখতে পেল না মতিন।

আধঘণ্টা বাদে মতিনের মনে হল একবার ফুটপাথ ধরে হেঁটে এলে হয়! জামাপ্যান্ট পরে বরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই রিং শুনতে পেল, মোবাইল বাজছে। সে খুব অবাক হল। তার মোবাইল বাজছে? দেশের বন্ধুরা বলে অ্যাক্টিভেটেড হতে অনেক সময় লাগে। সে টেবিলের ওপর থেকে যন্ত্রটা তুলে একটা নাম্বার দেখতে পেল। বোতাম টিপতেই সুলতানার গলা শুনতে পেল, 'এই যে, কী করা হচ্ছে?'

'ওঃ! আপনি!'

'তার মানে? আমি ছাড়া আর কেউ কি তোমার নাম্বার জানে?'

'না-না—। মানে—!'

'এই প্রথম ফোন তো?'

'হ্যাঁ।'

'সেভ করে রাখো। পরে কথা বলব।' লাইন কেটে দিল সুলতানা।

হঠাৎই মন ভালো হয়ে গেল মতিনের। মোবাইল ফোন রেখে দিল।

সন্ধেবেলার জ্যাকসন হাইটের রাস্তা জমজমাট। এত মানুষ কিন্তু কেউ তার পরিচিত নয়। সে মানুষের ভিড়ে মিশে আছে কিন্তু পাশের লোকটাও তার অচেনা। তবু এখানে এত মানুষের সঙ্গে হাঁটতে ভালো লাগছে। হঠাৎ একটা দোকানের কাচে বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে পেল মতিন, 'হেল্প ওয়ান্টেড।' ওরা সাহায্য চাইছে। এত বড় দোকান কিসের সাহায্য চাইতে পারে। হঠাৎ মনে হল

ওরা কাজের লোক চাইছে না তো। সে দোকানটা পেরিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সেভেন্টি ফোর স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল। মাঝে-মাঝেই একগাদা লোক যখন বেরিয়ে আসছে একসঙ্গে তখন বুঝতে পারা যাচ্ছে ট্রেন এল। লোকগুলো চলে গেলে কয়েক মিনিটের জন্যে আবার চুপচাপ।

মতিন দাঁড়িয়েছিল ফুটপাথে। সে তাকাচ্ছিল কিন্তু কিছুই দেখছিল না। আর কয়েকদিনের মধ্যে সে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেয়ে গেলে দেশে ফিরে যেতে পারবে। সুলতানাভাবি যদিও তাকে থেকে যেতে বলছে, এখানে কোনও একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ পাইয়ে দেবে, গ্যাস স্টেশনটা কী জিনিস সে বুঝতে পারছে না। এখানে চাকরি করলে দেশ থেকে অনেক বেশি রোজগার করতে পারবে। কিন্তু কাজের বাইরে তার সময় কাটবে কী করে? সে বোবা হয়ে থাকবে নাকি?

'হাই।' পাশ থেকে গলার স্বর ভেসে আসতে তাকাল মতিন। বেশ দেখতে ভালো কিন্তু খুব উগ্র সাজ করা একটা সাদা মেয়ে, যাকে দেশে সবাই মেমসাহেব বলবে, দাঁড়িয়ে হাসছে। হাতে সিগারেট।

মতিন বোকাবোকা হাসি হাসল।

'ডু ইউ হ্যাভ লাইট?'

লাইট? লাইট মানে আলো। ও কি আগুন চাইছে? দেশলাই? লাইটার। সে দ্রুত মাথা নাড়ল, 'নো। সরি।'

'দ্যাটস ওকে। ইউ লিভ হিয়ার?'

মাথা নাড়ল মতিন। অনুবাদ করেও স্বস্তি পেল না বলতে।

'অ্যালোন?'

একা থাকি কি না জিজ্ঞাসা করছে। মতলবটা কী? সে মাথা নেড়ে না বলল।

'ইউ ফলো মি। জাস্ট টু ব্লক। ওকে?' মেয়েটি হাসল, 'আই নেভার চিট মাই ক্লায়েন্ট। জাস্ট থ্রি হান্ড্রেট ডলার। ফলো মি!'

মেয়েটি হাঁটতে লাগল উলটোদিকে। ততক্ষণে মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছে গিয়েছে মতিনের। সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে ঘরের পথ ধরল। তারপরেই মনে হল মেয়েটা যদি তাকে অনুসরণ করে তাহলে ঘরে পৌঁছে যাবে। সে আরও জোরে হেঁটে সেই দোকানটার সামনে পৌঁছে যেতেই কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'ইয়েস! ইউ আর ফ্রম?' একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এল।

'বাংলাদেশ।'

'গুড। কবে এসেছেন ভাই?' পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন প্রৌঢ়।

'কয়েকদিন হল।'

'কাজ খুঁজছেন? আপনার কি এদেশে থাকার ভিসা আছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মতিন। পাসপোর্টটা সঙ্গে না থাক, এখানে থাকার সরকারি অনুমতিপত্র তো সঙ্গে আছে।

'সরি। তাহলে আপনাকে কাজ দিতে পারব না। আপনি অন্য জায়গায় দেখুন।'

অবাক হয়ে গেল মতিন, 'কেন?'

দুপাশে মাথা দোলাল প্রৌঢ়, 'আমি আপনাকে কৈফিয়ত দেব না। যান।'

মতিন বাধ্য হল বেরিয়ে আসতে। কয়েক পা হাঁটতেই তার মনে পড়ল টিয়ার কথাগুলো। টিয়া বলেছিল কাগজপত্র না থাকলে এখানে সহজে চাকরি পাওয়া যায়। কারণ সেক্ষেত্রে মালিক যা খুশি তাই পারিশ্রমিক দিতে পারে। তোমার ইচ্ছে হলে করো না হলে কেটে পড়। এদেশে থাকার যাদের বৈধ অধিকার নেই, সারাক্ষণ ধরা পড়ার ভয়ে থাকে অথচ পেট চালাতে হবে তারা অনেক অল্প মাইনেতেই কাজে ঢুকে যায়। যার বৈধ-কাগজ আছে তাকে নিতে হলে মালিককে অনেক বেশি

মাইনে দিতে হবে। কোন মালিক সেটা চাইবে!

রাত বাড়ছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল মতিন। হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল একজন, 'হাই!'

মুখ ফিরিয়েই ছেলেটিকে চিনতে পারল। সেই তোলাবাজদের একজন যাকে বিকেলবেলায় তাড়া করেছিল অন্যদলের লোকজন, মতিন হাসল।

পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল ছেলেটা। মতিন মাথা নাড়ল। ছেলেটি কাঁধ নাচিয়ে নিজে একা ধরালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কোনও ফ্রেন্ড নাই?'

'না।' মতিন রাস্তা দেখল।

'এখানে কোথায় বাসা?'

সতর্ক হল মতিন। বলল, 'বড়ভাই-এর চেনা-লোকের কাছে থাকি।'

'তখন তোমাকে দেখিয়ে এক্সট্রা রোজগার হয়ে গেল।' ধোঁয়া ছাড়ল ছেলেটি।

'একটু আগের ওরা কেন ধাওয়া দিয়েছিল?'

'শালারা আমাদের শত্রু। এলাকা দখল করতে চায়। আজ পুলিশ সব ক'জনকে ধরেছে। কয়েক হপ্তা মার খাবে। আমার নাম লিটন। তোমার নাম?'

'মতিন।'

'চল, এক জায়গায় যাই।'

'কোথায়?'

'কাছেই? বকুল আপার আড্ডা বলি আমরা।'

'কী হয় সেখানে?'

'আরে ভাই! এত প্রশ্ন কর কেন? খাওয়া-দাওয়া, গল্প। আজ বকুল আপার আড্ডা ফাঁকা আছে। দলের সবাই ম্যানহাটনে গিয়েছে।' বলে খুক খুক করে হাসল সে।

'হাসছ কেন?'

'তুমি কখনও ম্যানহাটনে গিয়েছ?'

'না।'

'ওঃ। ওখানে কি-হোল আছে। নেকেড মেয়েরা ড্যান্স করে। তাই দেখতে ওরা গিয়েছে। আমার ভালো লাগে না। এক ডলার গর্তে ফেললে এইটুকু জানলা ফাঁক হয়। আধ মিনিট দেখতে না দেখতেই ওটা বন্ধ হয়ে যায়। দেখতে হলে আবার পয়সা ফেল।' ছেলেটা যার নাম লিটন, ঠোঁট ওলটালো, 'শালারা কল বানিয়েছে।'

'তুমি যা বুঝেছ, ওরা তা বোঝেনি কেন?'

'ওদের চুলকায়। রোজগার হলেই খরচ করতে হবে। চলো।'

'আজ থাক। আর একদিন যাব। শরীরটা ঠিক নেই।' মতিন বলল।

'গেলে খুব মজা পাবে। আমি রোজ বিকেল পাঁচটায় ওই সিনেমা হলের সামনে থাকি।' লিটন চলে গেল।

বাড়িতে ফিরে এল মতিন। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরের তালা খুলতে গিয়ে অভ্যেসে ওপাশের দরজার দিকে তাকাতেই দেখল সেটা আধখোলা। যতবার এর আগে সে তাকিয়েছে, বন্ধ দেখেছে দরজাটা। মতিন দাঁড়াল। ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বেশ রাশভারি চেহারার বয়স্ক মানুষ। গম্ভীর মুখে যখন হেঁটে নেমে গেলেন তখন তাঁর হাতে স্টেথো দেখতে পেল মতিন। ডাক্তার। ডাক্তার এসেছিল কেন?

পায়ে পায়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। ভেতরে আলো জ্বলছে। উঁকি মারতেই বড় ঘরটা নজরে এল। সুন্দর সাজানো। দরজায় শব্দ করল মতিন। দ্বিতীয়বারে সাড়া এল ভেতরের ঘর থেকে। তারপরে টিয়া বেরিয়ে এল। পরনে সাদা জিনস আর রঙিন গেঞ্জি। তাকে দেখে টিয়ার চোখে বিস্ময়

ফুটে উঠল, 'আপনি?'

'না-মানে-কিছু হয়েছে?'

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে টিয়া জানাল, হ্যাঁ, হয়েছে। তারপর ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ছেলের খুব জ্বর।'

অবাক না হওয়ার চেষ্টা করল মতিন। জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার কী বললেন?'

'ওষুধ দিয়ে গেলেন। বললেন, কালকের মধ্যে জ্বর না কমলে হাসপাতালে ভরতি করতে হবে। এখানে কোন ডাক্তারকে ডাকলেই বাড়িতে পাওয়া যায় না। গালিবকে তো চেম্বারে নিয়ে যাওয়া যাবে না। অনেকদিনের পরিচিত বলে উনি এলেন।' টিয়া বলল।

'ওষুধ কি নিয়ে আসতে হবে?'

টিয়া হেসে ফেলল, 'আপনি ওষুধের দোকান চিনবেন না। আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি ছেলেকে একা ফেলে রেখে ওষুধ কিনতে যাচ্ছিলাম। আপ্পা ঠিক সময়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি একটু বসবেন? আমার বেশি সময় লাগবে না।' অনুরোধ করার সময় টিয়াকে অন্যরকম দেখাল।

'নিশ্চয়ই। দোকানটা কোথায় বলে দিলে আমিই যেতে পারতাম।'

'না। আপনি দরজা বন্ধ করে বসুন। ও এখন ঘুমোচ্ছে। যদি জেগে ওঠে তাহলে কথা বলবেন। মানুষের গলার স্বর শুনলে ও চুপ করে থাকে।'

ঘরের ভেতর ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল টিয়া। সম্ভবত টাকা এবং প্রেসক্রিপশন নিয়ে এল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নীচু গলায় বলে গেল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

টিয়া চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ওই ঘরের একটা সোফায় বসল মতিন। দেখে মনেই হয়নি টিয়া বিবাহিতা। ওর হাঁটাচলা, ব্যবহার ঠিক অবিবাহিতা মেয়ের মতন। শুধু বিবাহিতা নয়, টিয়া ছেলের মা। ওর স্বামী কোথায়? নিউইয়র্কের বাইরে থাকেন নিশ্চয়ই। টিয়া বাচ্চাকে নিয়ে এই শহরে একাই থাকে? সেটা কী করে সম্ভব? ওকে তো রোজ ভোরে কাজে যেতে হয়, ফেরে শেষ-বিকেলে। ছেলে নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটে অতক্ষণ একা থাকে না! অবশ্য ছেলের বয়স কত তা সে জানে না। ঠিক তখনই কানে এল একটা শব্দ। তার মানে মতিনের বোধগম্য হল না। কিন্তু শব্দটা টিয়ার ছেলের গলা থেকেই বেরিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কষ্ট হলে বাচ্চারা যেরকম আওয়াজ জ্বরের ঘোরে করে থাকে সেরকম নয়।

জুতো খুলে চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরের দরজায় চলে এল মতিন। এটা শোওয়ার ঘর। কিন্তু বিছানা শূন্য। তারপরেই নজরে এল। ঘরের একপাশে ছোট্ট খাটে বাচ্চাটা শুয়ে আছে। তার গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। আশ্চর্য ব্যাপার খাটের চারপাশে অন্তত দেড়ফুট উঁচু রেলিং দেওয়া আছে। মতিন ঝুঁকে ছেলেটিকে দেখছিল। তখনই ছেলেটি দ্বিতীয়বার আওয়াজ করল। গোঙানির মতো ছিটকে উঠল শব্দটা। মনে পড়ে যাওয়াতে মতিন কথা বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে? এখনই তোমার মা ওষুধ এনে তোমাকে খাইয়ে দেবে। দেখবে আর কোনও কষ্ট থাকবে না। একটু সহ্য কর। তুমি তো খুব ভালো ছেলে। তাই না?'

ছেলেটা মুখ ফেরাল। ফোলা ফোলা মুখ। চোখ খুলল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করল। মতিন বলল, 'তোমার নাম তো গালিব। কী সুন্দর নাম!'

ছেলেটা আবার চোখ খুলল। মতিন হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শ করেই বুঝতে পারল জ্বর বেশ বেশি। এই ছেলের বয়স ছয়, অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে কিন্তু শরীরটা এত্ত ছোট কেন। সে ওর যে হাতটা কম্বলের বাইরে চলে এসেছিল সেটা স্পর্শ করতেই দেখল তার আঙুলটাকে

মুঠোয় নিয়েছে বেচারা। কচি অথচ উত্তপ্ত মুঠোর স্পর্শ থেকে নিজের আঙুল সরিয়ে না নিয়ে খাটের পাশে মেঝের ওপর বসে পড়ল সে। তারপর ছেলেটা মুখ হাঁ করলেই সে কথা বলে যাচ্ছিল আর কানে যাওয়া মাত্র মুখ বন্ধ হচ্ছিল, ওর কী ধরনের জ্বর হয়েছে মতিন জানে না। তার মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে তার নিজের খুব জ্বর আসে। তখন ডাক্তার মাকে বলেন মাথা ধুইয়ে দিতে এবং শরীর থেকে লেপ সরিয়ে ফেলতে। বলেছিলেন, 'শরীরের ভেতর তো যথেষ্ট উত্তাপ তৈরি হয়েছে, আবার লেপ ঢাকা দিয়ে বাইরে থেকে উত্তপ্ত করছেন কেন?' লেপ সরিয়ে নেওয়ার পর দ্যাখা গেল দ্রুত জ্বর কমে আসছে।

বেল বাজল। মতিন আঙুল ছাড়াতে গিয়ে দেখল জোর না করলে সেটা করা সম্ভব নয়। ততক্ষণে দ্বিতীয়বার বেল বেজেছে। মতিন বাধ্য হল নিজেকে মুক্ত করতে। দরজা খুললে টিয়া ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'বিন্দুমাত্র নয়। গালিবের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।' মতিন হাসল

'তার মানে?' অবাক হয়ে তাকাল টিয়া।

'ও আমার আঙুল ধরার পর ছাড়তে চাইছিল না।'

'স্ট্রেঞ্জ!' টিয়ার ঠোঁটে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

ওষুধ জলে গুলে অনেক কথা বলে ছেলেকে খাইয়ে দিল টিয়া। চুপচাপ দৃশ্যটা দেখল মতিন। তারপর নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা জানাল।

টিয়া অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি? ডাক্তার তো একথা বললেন না!'

'ওর যদি শীত না লাগে, তাহলে করলে উপকার হবে।'

একটু ভাবল টিয়া, তারপর ছেলের শরীর থেকে লেপ তুলে নিয়ে একটা পাতলা চাদর ছড়িয়ে দিল। ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে মতিন। ছেলেটির নিম্নাঙ্গ স্বাভাবিক তো নয়ই। দুটো পা ঠিকঠাক তৈরি হয়নি। খানিকক্ষণ ছেলের কপালে হাত বোলাল টিয়া মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে। সেই কথাগুলোর তেমন কোনও মানে নেই। মতিন দেখল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল গালিব।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা পেছনে হেলিয়ে বেশ জোরে শ্বাস ফেলল টিয়া। তারপর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

'মোটেই না। আমি তো ঘরে চুপ করে বসে থাকতাম।'

'একটু কফি করি?'

দেশে থাকতে কফি খাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়নি. চা খেতেই অভ্যস্ত সে। কিন্তু এখন মনে হল বোধহয় কফি বানানো চায়ের চেয়ে সহজ। সে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

বাইরের ঘরের সোফায় সে যখন বসে তখন টিয়া কিচেনে। এই ফ্ল্যাটকে কী বলে? একটা শোওয়ার আর একটা বসার ঘর। পাশেই সে যেখানে আছে সেখানে দ্বিতীয় ঘর নেই? এই ঘর বেশ সাজানো। গালিবের বাবা কোথায়? ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল মায়েরা বাবাদের চেয়ে সন্তানের ঝামেলা বেশি সামলায়। কিন্তু এই প্রতিবন্ধী ছেলেকে একলা রেখে সারাদিন টিয়া বাইরে থাকে কী করে? তাহলে ওর স্বামী নিশ্চয়ই সে সময় বাড়িতে থাকেন। তাই বা কী করে হবে, ভদ্রলোককে কাজকর্ম করতে বাইরে যেতে হয়।

ট্রেতে দুটো কফির কাপ আর প্লেটে বিস্কুট নিয়ে টেবিলে রেখে উলটোদিকে বসল টিয়া, 'দেখুন, ভালোলাগে কি না। আমি তো চা-কফি খাই না। কেউ এলে কফির কথা মনে আসে।'

চুমুক দিয়ে মতিন বলল, 'না-না, ভালো হয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর প্রশ্নটা না করে পারল না মতিন, 'ওর কবে থেকে জ্বর এসেছে?'

'আজ থেকেই।'

'ওর বাবা জানেন?'

'না।'

অবাক হয়ে তাকাল মতিন। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল টিয়া। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমরা এখন একসঙ্গে থাকি না।'

মতিন কথা বলল না। তার মন খারাপ হয়ে গেল।

'আমি জানি ও বাবাকে খুব মিস করে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। ছাড়ছাড়ির সময় সে ছেলের দায়িত্ব নিতে চায়নি।' টিয়া বলল।

'আপনাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। গালিব নাবালক বলে আমি ওর অভিভাবকত্বের জন্যে কোর্টে অ্যাপিল করেছিলাম। সে কনটেস্ট করেনি।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'কাছেই। কুইন্সে।'

'ছেলের সঙ্গে দ্যাখা করেন না?'

'করেন। প্রত্যেক শুক্রবারের বিকেলে।'

'এখানে আসেন?'

'না।' টিয়া উঠে দাঁড়াল, 'আপনি রাত্রে কোথায় খাবেন?'

মতিন বুঝতে পারল টিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছে না। কিন্তু যে ছেলের পায়ের ওই অবস্থা তাকে এখানে না এলে কী করে ভদ্রলোক দেখতে পাবেন? প্রশ্নটা মনে হলেও সে মুখ বন্ধ রাখল।

'এই যে মশাই, শুনতে পাচ্ছেন?' টিয়া আবার বলল।

'হ্যাঁ। ওহো। ঘরে চাল-আলু রেখে গেছেন শাজাহানভাইরা, তাই ফুটিয়ে নেব।' উঠে দাঁড়াল মতিন।

'ওই কাজটা না হয় কাল করবেন। মুরগির মাংস করা আছে, ভাত রেডি করতে কয়েক মিনিট। এখানেই খেয়ে নেবেন। বসুন।' টিয়া হাত নাড়ল।

'অসুবিধে হবে না তো!'

হেসে ফেলল টিয়া। বলল, 'সেই গল্পটা পড়েননি?'

'কোন গল্প?'

'ওই যে ওয়াসিংটনে একই অফিসে কাজ করত একটি বাঙালি ছেলে আর সাদা মেয়ে। কাজ করতে করতে যখন ওদের ভাব হয়ে গেল তখন এক শনিবারের ডিনারে বাড়িতে ছেলেটিকে ডাকল মেয়েটি। গুছিয়ে নিজের মতো রান্না করল। ছেলেটি এল সন্ধেবেলায়। ফুল নিয়ে। মেয়েটি খুশি হল। বসার পরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী নেবে? চা-কফি—।'

ছেলেটি বলেছিল, 'তোমার যা ইচ্ছে!'

মেয়েটি বলেছিল, 'বারে! খাবে তুমি, তোমার ইচ্ছেটাই বল।'

ছেলেটি ভাবল নিজের ইচ্ছে বললে মেয়েটি যদি অসুবিধায় পড়ে তাই সে আবার একই কথা বলল, 'তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।'

ছেলেটি যখন কিছুতেই বলছে না তখন মেয়েটি ভেতরের ঘরে গিয়ে চা বানাল, কফি তৈরি করল। তারপর একটা ট্রে-তে সেই দুটো কাপ বসিয়ে গ্লাসে হুইস্কি, রাম, ব্লান্ডি, ওয়াইন আলাদা করে ঢেলে নিয়ে এসে রাখল ছেলেটির সামনে। বলল, 'আমার ইচ্ছে তুমি এর সবকটাই খেয়ে নাও।'

ছেলেটি ভাবল, মেয়েটির ইচ্ছে পূর্ণ করা উচিত। সে একে একে সবক'টাই গলায় ঢালল। তারপরই তার বমি পেয়ে গেল। বেসিনে কিছুটা উগরে দেওয়ার পরেও শরীর এত খারাপ করতে

লাগল যে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পড়ামাত্র সে ঘুমে তলিয়ে গেল।

মেয়েটির খারাপ লাগছিল কিন্তু রাগ কমছিল না। তার মনে হচ্ছিল, একটা মানুষের নিজস্ব কোনও ইচ্ছে থাকবে না? অন্য লোক যা বলবে তাই মেনে নেবে? এরকম ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়? তারপর ভাবল, ওর ঘুম ভাঙলে সে দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু মেয়েটি সোফায় বসেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। উঠে দেখল ছেলেটি বেরিয়ে গেছে। তারপর থেকে ওদের সম্পর্ক তৈরি দূরের কথা, বাক্যালাপও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।' একটানা গল্পটা বলে গেল টিয়া।

মতিন বলল, 'আসলে আমরা ভাবি যে খাওয়াচ্ছে তার পরিশ্রমটা কম হোক।'

টিয়া কিচেনে চলে গেল।

দশ মিনিট পরে ফিরে এসে টিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কাছে আধ-বোতল ওয়াইন আছে। নেবেন?'

'না না, ওসব খাইনা আমি।' হাত নাড়ল মতিন।

'আপনার সঙ্গীরা চলে গেল, এখন কী করবেন?'

'মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেয়ে যাব।'

'এই ক'দিনটা ঠিক কতদিন তা তো জানেন না!'

'হ্যাঁ। কিন্তু—।'

'আচ্ছা, দেশের মানুষ আমেরিকায় আসার সুযোগ চেয়েও পায় না, আর আপনি এখানে এসেও ফিরে যেতে চাইছেন কেন?'

'এখানে থেকে আমি কী করব বলুন! আমি তো বিশেষ কোনও কাজ জানি না। জানেন, আজ একটা দোকানের বাইরে লোক চাই বোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকেছিলাম। ওরা বেশ ভালো ব্যবহার করছিল প্রথমে কিন্তু যেই জানল এদেশে থাকার বৈধ কাগজ আমার আছে তখনই প্রায় অপমান করে তাড়িয়ে দিল। বুঝলাম, এখানে আমাকে কেউ কাজ দেবে না।' মতিন বলল।

'কথাটা আপনাকে আগেই বলেছিলাম। যার কাগজ নেই তাকে ঘণ্টায় তিন ডলার দিয়ে খাটানো যায়। কোনও প্রতিবাদ করলেই চাকরি খতম। কম টাকা পাচ্ছে বলে সে পুলিশের কাছে যেতে পারে না। গেলে বৈধ কাগজ ছাড়া এদেশে আছে বলে পুলিশ তাকেই জেলে পাঠাবে। আর বৈধ কাগজ থাকলে অন্তত আট ডলার ঘণ্টায় দিতে হবে। না দিলে পুলিশ এসে মালিককে ধরবে। তাই অবৈধ কর্মচারীদের পছন্দ করে মালিকরা।' টিয়া বলল, 'কিন্তু দোকানের কর্মচারী হওয়া ছাড়াও অন্য কাজও তো আছে।'

'যেমন?'

'এই দেখুন, আমি হাসপাতালের মহিলা রুগিদের সমস্যার কথা ডাক্তারদের বলি। ওই মহিলারা কেউ ইংরেজি বলতে পারে না। আমি বলি তাই ঠিকঠাক চিকিৎসা হয়। মেল ওয়ার্ডেও অনেক বাংলাদেশি পেশেন্ট আছেন, হিন্দিভাষী পেশেন্ট আসেন যাঁরা একবিন্দু ইংরেজি বলতে পারেন না। আপনি যদি বলেন আপনার জন্যে চেষ্টা করতে পারি। আমাদের হাসপাতালের মেল ওয়ার্ডে যিনি ইন্টারপ্রেটার ছিলেন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে গেছেন।'

'কিন্তু ওদের সমস্যার কথা শুনে ডাক্তারকে ইংরেজিতে বলতে হবে তো।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা দেশে ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত নই।'

'লিখতে পড়তে জানেন তো?'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

'তা হলে চেষ্টা করলে বলতেও পারবেন। কয়েকদিন একটু অসুবিধে হলেও পরে রপ্ত হয়ে

যাবে। এবার খেতে দিই?'

'একটু পরে।'

'স্যার, আমাকে ভোর পাঁচটায় উঠতে হয়।'

'কেন? অত ভোরে কেন?'

'উঠে ছেলেকে রেডি করতে হয়। অনেক সময় লাগে। তারপর রান্না সেরে দুজনে খেয়ে নিজে তৈরি হই। দেরিতে ঘুমাতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।' বলেই খেয়াল হল টিয়ার, 'কাল অবশ্য ছুটির দিন।'

'আপনি চলে গেলে গালিব এখানে কার কাছে থাকে?'

'এখানে তো থাকে না।' মাথা নাড়ল টিয়া।

'তা হলে—?'

'ঠিক সাতটায় ওর বাস আসে, স্কুলের বাস, বাসের লোক ওকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নীচে নিয়ে গিয়ে বাসে বসিয়ে দেয়। ওদের স্কুলটা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্যে। সারাটা দিন ও সেখানে কাটায়। খায়, ঘুমায়। ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ'টায় ওরাই ওকে বাসায় পৌঁছে দেয়। আমি যেখানেই থাকি তার আগে বাসায় ফিরে আসি।' টিয়া বলল, 'আজ ছেলে জ্বর নিয়ে ফিরল। শুনলাম ওদের আজ এক ফুট জলের সুইমিং পুলে বসিয়েছিল। সবাই উঠে গেলেও ইনি জোর করে সেখানে বসেছিল। বোধহয় সেই কারণেই—!' টিয়া শ্বাস ফেলল।

খাবার টেবিলে সাজাল টিয়া। রান্না ভালো। মতিনের বেশ মজা লাগল খেতে। খেতে খেতে মতিনের মনে পড়ে যাওয়ায় গল্পটা বলল টিয়াকে।

'আপনার সঙ্গে আবার কথা বলল?' টিয়া অবাক।

'হ্যাঁ। ছেলেটার নাম লিটন। দ্বিতীয়বারে কথা বলার সময় মনেই হচ্ছিল না ও তোলাবাজদের একজন।' মতিন বলল।

'আমার মনে হয় ওদের এড়িয়ে চলাই ভালো।

'ওদেরও নিশ্চয়ই বৈধ কাগজ নেই।'

'জানি না। থাকলেও থাকতে পারে। তবে পুলিশের খাতায় নিশ্চয়ই নাম আছে। তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো যেমন থাকে মন্দও থাকে। কার কতটা আছে তা না জানতে চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' টিয়া বলল।

যাওয়ার আগে গালিবকে দেখতে গেল মতিন। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কপালে হাত রেখে বুঝল জ্বর অনেক কমে গেছে।

সেটা পরীক্ষা করে টিয়া হাসল, 'আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে?'

'আমার ওষুধ?' অবাক হল মতিন।

'আপনিই তো কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে বললেন!' হাসল টিয়া।

বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল মতিন, 'কোনও দরকার হলে ডাকবেন।'

'বাঃ!' এরকম কথা অনেকদিন শুনিনি।'

'গালিবের, কিছু মনে করবেন না, পোলিও হয়েছিল?'

মাথা নাড়ল টিয়া, 'নো।' ও যখন পেটে তখন পড়ে গিয়েছিলাম, আমাকে এত জোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল—, থাক সেসব কথা। গুড নাইট।' যেন নিজেকে আড়াল করতেই দরজা বন্ধ করে দিল টিয়া।

নিজের ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটা বন্ধ করে আলো জ্বালাল মতিন। এর মধ্যেই এই ঘরে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অন্ধকারেও স্বচ্ছন্দে সে হাঁটতে পারছে। জামাপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে যেতেই রিং শুনতে পেল মতিন। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে মোবাইলটা তুলে দেখল চেনা নাম্বার।

'হ্যালো।'

'আর হ্যালো। কী দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে তুমি,' সুলতানা বলল।

'কেন?'

'আবার কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। নাও, কথা বল।'

তার পরেই মুর্শেদের গলা শুনতে পেল, 'কোথাও গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। এই রাস্তায়—।'

'বেশি দূরে না যাওয়াই ভালো। খাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী খেলে?'

'ভাত আর মুরগির মাংস।'

'ওখানকার দোকানে এগুলো না খাওয়াই ভালো। অনেক বেশি দাম নেয়। ম্যাকডোনাল্ডে গিয়ে খাওয়ার অভ্যেস কর। আজ তোমার ভাবি তো ম্যাকডোনাল্ড চিনিয়ে দিয়েছে।' মুর্শেদ গম্ভীর গলায় বলল।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'দেশ থেকে কোনও খবর পেয়েছেন?'

'না। সাহেব লোক পাঠিয়েছিলেন। এখান থেকে কোনও অনুরোধ এখনও যায়নি।'

'সেকি? তা হলে কী আমি কাল গিয়ে খোঁজ নেব? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মতিন।

'কাল ছুটির দিন। কাউকে পাবে না। তা ছাড়া তোমার কেসটার আগে নিশ্চয়ই আরও অনেক কেস পেন্ডিং রয়েছে। এত অধৈর্য হলে চলবে কেন? এখানে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

মতিন উত্তর দিল না। তার খুব খারাপ লাগছিল।

মুর্শেদ বলল, 'ঠিক আছে, বলছি।'

ফোনটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকল মতিন। দেশ-এর সঙ্গে তার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম মুর্শেদ আর মুর্শেদের সঙ্গে এই ফোন। লোকটা কাজ থাকলে তার কাছে নাও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে এই ফোনটাই কথা বলিয়ে দিতে পারে। দেশে ফেরার চিন্তা এত প্রবল হয়ে উঠল যে সে এই মুহূর্তে টিয়ার কথা একদম ভুলে গেল।

সকালে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিল, মতিন। সে ঠিক করল আজ নিউইয়র্কের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরে দেখবে। একদিনে যতটা হয়, তাতে সময় কেটে যাবে। দরজায় তালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল টিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ। আজ ছুটির দিন, টিয়া নিশ্চয়ই ঘরেই আছে। গালিব কেমন আছে, তার খোঁজ নেওয়া দরকার। কাল যাকে অসুস্থ দেখে এল আজ তার খোঁজ না নেওয়া অভদ্রতা হবে। সে এগিয়ে গিয়ে বেলের বোতামে চাপ দিল।

দ্বিতীয়বার চাপ দেওয়ার আগে দরজা খুলে গেল। একগাল হেসে টিয়া বলল, 'ওম্মা। আপনি! আমি ভেবেছিলাম কেয়ার-টেকারের লোক এসেছে। আসুন।'

চোখ সরিয়ে নিল মতিন। টিয়ার পরনে এখন খুব খাটো হাফ প্যান্ট আর নাভির ওপরে জামা গেঞ্জি, চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। এই চেহারায় ওকে দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল। সে ঘরে না ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, 'গালিব এখন কেমন আছে?'

'আসুন না নিজের চোখে দেখবেন।' একপাশে সরে গেল টিয়া।

এর পরে না ঢুকে পারা যায় না। দরজার পাশে জুতো খুলে রেখে শোওয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে অবাক হল মতিন। বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে বসে হাতে রিমোট নিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে গালিব। সেখানে কার্টুন চলছে। দেখতে দেখতে হেসে উঠল একবার।

'দেখুন, কাল জ্বরে প্রায় বেঁহুশ ছিল, আর আজ সকালে সে কথা কেউ ভাববে?' বলতে বলতে টিয়া ভেতরে ঢুকে বলল, 'এক মিনিট, গালিব, একটু বন্ধ করো টিভি। ও! গালিব, তুমি তো ভালো ছেলে, আমার কথা শোনো, প্লিজ—!'

এবার বেশ বিরক্ত হয়ে ছেলে তাকাল মায়ের দিকে কিন্তু রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল না।

টিয়া বলল, 'এই আঙ্কল কাল রাত্রে তোমাকে খুব হেল্প করেছেন, তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন। একবার হাই বলো!'

মতিন লক্ষ্য করল গালিবের মাথা শরীরের তুলনায় বেশ ছোট। মায়ের কথা শোনার পর কয়েক সেকেন্ড ভাবল, তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, 'ড্যাড?'

টিয়া বলল, 'নো। ড্যাড নয়। আঙ্কল!'

মতিন এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ গালিব?'

'অ্যাঁঃ! অ্যাঁঃ!' মুখটা ভ্যাটকাল, বালক।

'তুমি দিন দিন খুব অসভ্য হয়ে উঠেছ। চলুন, ওঘরে গিয়ে বসি। ও দেখুক কার্টুন।' কথাটা কানে যেতে ছেলে যে খুশি হল তা মতিন লক্ষ্য করল।

বাইরের ঘরে এসে সোফায় বসল না মতিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি কথা বলতে পারে না?'

'কয়েকটা শব্দ যা আমি বুঝতে পারতাম, এখন ওর টিচার বুঝতে পারে।'

'জন্ম থেকেই?'

'জন্মাবার সময় শরীর ওরকম ছিল, কথা বলার সময় এলে ধরা পড়ল।' টিয়া বলল, 'বসুন। এত সকালে তৈরি হয়ে কোথায় বের হচ্ছেন?'

প্রসঙ্গ পালটানোয় খুশি হল মতিন, 'এতদিন এখানে আছি, ভালো করে কিছুই দেখিনি। হুট করে চলে যেতে হবে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট পেলে। তাই ভাবলাম আজ নিউইয়র্ক শহরটাকে ঘুরে দেখি।'

'কোথায় যাবেন? কী কী দেখবেন?'

নিউইয়র্কে আসার আগে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা উগরে দিল মতিন। শুনে টিয়া হাসল।

'আপনি হাসছেন কেন?'

'আপনি তো রাস্তাঘাট চেনেন না। জিজ্ঞাসা করে করে যেতে হবে। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে সবচেয়ে উঁচু বাড়িটায় কী করে পৌঁছোবেন? জানেন না। আর নিউইয়র্ক এত বড় শহর যে ট্রেনে চেপে পায়ে হেঁটে একটা কিছু ভালো করে দেখতে না দেখতেই দিন শেষ হয়ে যাবে।' টিয়া বলল।

'তা হলে—!'

'আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি। আজ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখে ম্যানহাটনটা ঘুরে আসুন।' পাশের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট প্যাডে কিছু লিখে মতিনের হাতে দিল টিয়া, 'কোন কোন ট্রেনে যেতে হবে লিখে দিয়েছি। ট্রেন থেকে কোথায় নামতে হবে তাও। নেমে একটু হাঁটতে হবে। ওখান থেকে কীভাবে ম্যানহাটনে যাবেন তাও লিখে দিয়েছি। আপনার সঙ্গে মোবাইল থাকলে ভালো হত। সমস্যায় পড়লে ফোন করতেন।'

'আমি একটা মোবাইল ফোন পেয়েছি।'

'অ্যাঁ! বাঃ। নাম্বারটা বলুন।'

'আমি নাম্বারটা ঠিক জানি না।'

'ও মাই গড! ঠিক আছে, আমার নাম্বারটা ডায়াল করুন।'

টিয়া যা যা নাম্বার বলে গেল তার বোতাম টিপল মতিন। পরদায় সেই নাম্বারগুলো ফুটে ওঠার পরেই টিয়ার ফোনে রিং শুরু হল।

টিয়া বলল, 'কেটে দিন। আমি নাম্বারটা সেভ করে রাখছি।'

সেটা করার পর মতিনের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে নিজের নাম্বার এন্ট্রি করিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এই ফোন কোথায় পেলেন?'

সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে বলল মতিন, 'মুর্শেদভাই আর সুলতানাভাবি দিয়েছেন। দেশে যাওয়ার সময় ফেরত দিয়ে যেতে হবে।'

'সঙ্গে কত টাকা নিয়েছেন?

'ওই, যা ছিল, সব।'

'পাগল! তিরিশ কি চল্লিশ ডলারের বেশি নেবেন না। নিউইয়র্ক শহরটাকে আপনার যদি মনে হয় স্বর্গরাজ্য তা হলে ভুল করবেন। কখন কে পকেট মারবে, কেউ এসে ছিনতাই করবে জানার আগেই সেটা হয়ে যাবে। ঘরে রেখে যান।' টিয়া বলল।

'একদম ভাবিনি একথা। আসলে ঘরে রেখে যেতে ভয় করছিল, যদি চুরি হয়ে যায়।'

'আপনার পাসপোর্ট যদি ঘরে রেখে যেতেন তাহলে এতক্ষণে বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।' টিয়া হাসল, 'ঘুরে এসে বলবেন কী কেমন দেখলেন!'

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মতিন ভাবছিল, দেশে কোনও মেয়েকে এখনকার টিয়ার পোশাকে সে কখনও দ্যাখেনি। শুনেছে, শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কেউ কেউ খুব মড পোশাক পরে। তাদের সে চোখে দ্যাখেনি। কিন্তু তাদের পাড়ায় টিয়াকে যদি এই পোশাকে দ্যাখা যেত তা হলে কত কথাই না হত। প্রথমে তার অস্বস্তি হলেও পরে সেটা চলে গিয়েছিল। টিয়াকে আর অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

স্টেশনে উঠে টিয়ার লেখা কাগজটা ভালো করে দেখল সে। তারপর টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল, আজ ছুটির দিন বলেই বোধহয় তেমন লোক নেই প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে 'এফ' লেখা ট্রেনটা চলে এল। বেশি যাত্রী নেই কামরায়। আরাম করে বসল সে। এই যে ট্রেনে চেপে নিউইয়র্ক শহরের ওপর এবং নীচ দিয়ে সে একা যাচ্ছে, কিছুদিন আগেও ভাবতে পারত না। প্রথমবার একা যাওয়ার সময় যে ভয় ভয় ভাব ছিল এখন সেটা আর নেই।

পরের স্টেশনে লোকদুটো উঠল। দুটো কালো ছেলে, খুব স্মার্ট, সুগঠিত শরীর, চকরা-বকরা পোশাক, চোখে কালো চশমা। সঙ্গে সাউন্ড বক্স আর গিটার। উঠেই দুজনে গান গাইতে লাগল। ওদের গলা এবং বাজনা গমগম করতে লাগল কামরায়। ওরা এভাবে গান গাইছে কেন? একটা গান শেষ হতেই দু-মাথা থেকে টুপি খুলে ঘুরতে লাগল যাত্রীদের সামনে। যাত্রীরা যে যা পারছিল দিয়ে দিচ্ছিল টুপিতে। হঠাৎ এক বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বললেন, আমি তোমাদের দশ ডলার দেব।'

'সো নাইস অফ ইউ মাম্।'

'কিন্তু তোমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে। ওই বিকট শব্দে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন মাথা নীচু করল। পরের স্টেশনেই নেমে গেল ওরা। নামার আগে বৃদ্ধার কাছ থেকে নোটটা নিল না। ট্রেন আবার চালু হলে উলটোদিকের এক যাত্রী বললেন, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বৃদ্ধা বললেন, 'ধন্যবাদটা আপনাকে দেওয়ার সুযোগ যদি করে দিতেন তাহলে খুশি হতাম।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

মতিন হেসে ফেলল। এত ভদ্রভাবে যে ভর্ৎসনা করা যায় তা সে জানত না। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে পড়ল দেশেও ট্রেন বা বাসে মানুষ একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করে। আগে পল্লিগীতি গাইত

ওরা। অন্ধ গায়ক চেঁচিয়ে গাইত ভাঙা গলায়। কিছুদিন আগে ঢাকায় গিয়ে শুনেছে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে এখন ভিক্ষে চাওয়া হচ্ছে। তাহলে এই ব্যাপারটা সব দেশেই রয়েছে। চেহারা, পোশাক এবং যন্ত্রপাতির বিরাট তারতম্য আছে।

টিয়ার লেখা কাগজ-অনুসরণ-করে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে হাঁটা শুরু করা মাত্র পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠল। সে ওটা বের করে বোতাম টিপে হ্যালো বলতেই সুলতানার গলা শুনল, 'তুমি কি এখনও ঘুমাচ্ছ?'

'না না। আমি এখন রাস্তায়। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে যাচ্ছি।'

'ও মাই গড! হঠাৎ এত সাহসী হয়ে গেলে! ঠিক আছে, দ্যাখা হয়ে গেলে আমাকে একটা কল দিয়ো।' লাইন কেটে দিল সুলতানা।

কিছুটা পথ হাঁটার পর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে আচমকা জল দেখতে পেল মতিন। বিরাট নদী। নদীর মাঝখানে বেশ উঁচু বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে মূর্তিটি তা এখান থেকে স্পষ্ট নয়, নদীর ধারে যেতে গেলে একটা পার্ক পেরিয়ে যেতে হবে। সেখানে বেশ কিছু মানুষকে দ্যাখা যাচ্ছে। বোধহয় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে এসেছেন সবাই। মতিন এগোচ্ছিল। রাস্তার পাশে চলমান গাড়ির ওপর কিছু লোক দোকান সাজিয়ে বসে আছে।

খাবারের স্টলটার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মতিন। তারপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সালাম আলেকুম।'

লোকটি তখন দোকান সাজাচ্ছিল। মুখ তুলে অবাক চোখে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, 'আলেকুম সালাম।'

'কেমন আছেন হারুণভাই?'

'আছি। এখনও আছি। আপনাকে ঠিক—!'

'কয়েকদিন আগে আপনার দোকানে আমরা তিনজন খাবার কিনেছিলাম।'

'এত লোক আসে।' বিড়বিড় করল হারুন।

'ওই যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হটডগ মানে কুকুরের মাংস কিনা—!' মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মতিন।

'ওহো! হ্যাঁ।' হা হা করে হাসল হারুণ, 'মনে পড়ে গেছে। দেশের মানুষরা কত অদ্ভুত ধারণা নিয়ে থাকে। তা তারা কোথায়?'

'দেশে ফিরে গেছে।'

'আপনি কি এখানে কিছুদিন থাকবেন?'

'আমাকে তুমি বলবেন। আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। আমি ফিরতে পারিনি পাসপোর্ট পকেটমার হয়ে গিয়েছে বলে। আবার আবেদন করেছি ডুপ্লিকেটের জন্যে। পেলে ফিরে যাব।' মতিন বলল।

'বেশি আশা করবে না। সরকারি কাজ তো, ছত্রিশ মাসে বছর হয়। তা এখানে কী মনে করে? স্ট্যাচু দেখবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওই পানির ধারে দাঁড়ালে ভালো দেখতে পাবেন না। দূরত্বটা তো অনেকখানি। ওই ওপাশে স্টিমার ঘাটা আছে। পনেরো মিনিট অন্তর স্টিমার যায় স্যাটার্ন আইল্যান্ড। যাওয়ার সময় স্ট্যাচুর খুব কাছ দিয়ে যায়। ওটায় উঠে যান। ভালো দেখতে পাবেন।'

'স্যাটার্ন আইল্যান্ড মানে?'

হাসল হারুণ প্রশ্ন শুনে, 'শয়তানের দ্বীপ না, নামটাই ওইরকম? প্রচুর মানুষ ওখানে থাকে। অফিস, ব্যাবসাও আছে। স্টিমারে চেপে যাতায়াত করে সবাই।' হারুণ কথা শেষ করতেই খদ্দের

এসে গেল। তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল সে। মতিনের মনে হল এখান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বেশ খিদে পাচ্ছে। সে গলা তুলে বলল, 'হারুণভাই, আমাকে একটা হটডগ দেবেন।'

খাবার বানাতে বানাতে মাথা নাড়ল হারুণ। চারপাশে তাকাল মতিন। এখানেও একই ব্যাপার। গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন জড়ো হয়েছে স্ট্যাচু দেখতে। ওই স্ট্যাচু যে মশাল ধরে আছে তা স্বাধীনতার প্রতীক।

হঠাৎ যেন খদ্দের বেড়ে গেল হারুণের দোকানে। তাদের সামলে একটু সময় নিল সে মতিনকে খাবার দিতে। ওটা খাওয়ার পর বোতলটা এগিয়ে দিল হারুণ। খানিকটা জল খাওয়ার পরেই মতিন দেখল একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে যার মাথা ন্যাড়া, কানে দুল, পরনে গেঞ্জি আর হাঁটুর নীচ অবধি প্যান্ট দোকানের পেছনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হারুণভাই খিঁচিয়ে উঠল, 'এতক্ষণে টাইম হল? কখন আসতে বলেছিলাম। কতবার বলেছি বাইরে গিয়ে দ্যাখো কত ধানে কত চাল, তবু যাবে না। বাপের ঘাড়ে বসে তবলা বাজাবে!'

'সরি!' কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা।

হারুণভাই তাকাল মতিনের দিকে, 'পৃথিবীতে থাকার সময় মানুষ যে পাপ করে তার শাস্তি আল্লা তাকে বেঁচে থাকার সময়েই দিয়ে যান। কথাটা জানেন?'

মতিন হাসল, 'শুনেছি।'

'এটা আমার সেই শাস্তি। উগরাতে পারি না, গিলতেও পারি না।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আকবর ভাই এসে অপেক্ষা করে চলে গিয়েছে। আবার আসবে দু-ঘণ্টা পরে। তুই এক কাজ কর। একে নিয়ে স্টিমারে চেপে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখিয়ে আন। ভাই, এই ছেলের নাম রাসেল।'

মতিন বলল, 'আমি মতিন।'

'স্টিমার ভাড়াটা রাখ।' ছেলের হাতে নোট দিল হারুন।

সঙ্গে সঙ্গে রাসেল মতিনকে বলল, 'লেটস গো।'

হাঁটা শুরু করে রাসেল জিজ্ঞাসা করল, 'আর ইউ ফ্রম ঢাকা?'

'হ্যাঁ। ইয়েস।'

'আর ইউ অন ট্যুর?'

কী বলবে মতিন বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল হ্যাঁ।'

'হাই, গিভ মি এ ফ্ল্যাগ।'

'কী?'

'আঃ!' দুটো আঙুল ঠোঁটের সামনে নিয়ে গিয়ে টান দিয়ে রাসেল বোঝাল সে সিগারেট চাইছে।

'আমি সিগারেট খাই না।'

'শিট্।' বলে চেঁচাল রাসেল। কথাটার মানে বুঝল না মতিন।

নদীর কাছে এসে রাসেল বলল, 'হাউ অ্যাবাউট হায়ারিং এ বোট? ইউ ক্যান কিস হার!'

'কিস? কাকে?'

'দি স্ট্যাচু।'

'তুমি কি পাগল?'

'আমি? নো! ইউ পিপল আর ম্যাড। আই ডোন্ট নো হোয়াই পিপল কাম হিয়ার টু ওয়াচ দ্য স্ট্যাচু! গিভ মি টেন বাকস।'

'বাকস?'

'ইউ কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ? ডলার, ডলার।'

চটজলদি পকেট থেকে নোটগুলো বের করে দশ ডলার রাসেলকে দিতেই সে চলে গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে।

সামনেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা টিকিট দেখিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, নীচের তলায় গাড়ি ঢুকছে একের পর এক। পদ্মার লঞ্চে গাড়ি ওঠে, যাত্রীও। কিন্তু এখানকার মতো আধুনিক নয়। স্টিমারটা হুইস্‌ল বাজাল।

ব্যস্ত হয়ে মতিন তাকাল। হারুণভাই-এর ছেলে রাসেলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যেদিকে ছেলেটি গিয়েছিল সেদিকে এগিয়ে টিকিট কাউন্টারটা দেখতে পেল কিন্তু রাসেল নেই।

গেল কোথায় ছেলেটা। ঠিক তখনই স্টিমারটা ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মিনিট দুয়েক পরে আর একটা স্টিমার ওপার থেকে এসে ঘাটে লাগাতে যাত্রীরা নেমে এল পিলপিল করে। তারপর গাড়ি উঠে এল একের পর এক। মতিন বুঝতে পারছিল না সে কী করবে। পরের স্টিমারটা ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে মতিন টিকিট কাটল। দুই ডলার লাগল রিটার্ন টিকিটের দাম। রাসেলকে ওর বাবা টাকা দিয়েছিল টিকিট কাটার জন্যে। তার কাছ থেকে দশ ডলার নিয়েছিল সে। অথচ তার দ্যাখা পাওয়া যাচ্ছে না।

টিকিট দেখিয়ে স্টিমারের ওপরের ডেকে উঠে এল মতিন। বসার বেঞ্চি রয়েছে। এই স্টিমারটায় ভিড় হয়নি। টিয়া লিখেছে এই নদীটার নাম হাডসন। কিন্তু দেখলে সমুদ্র বলে মনে হয়। সে ডানদিকে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবির মতো বড় বড় বাড়ি যেন আকাশটাকে সাজিয়ে রেখেছে। এমন দৃশ্য জীবনে কখনও দ্যাখেনি। এই সময় ফোন বেজে উঠতেই অন করল মতিন। সুলতানাভাবি।

'কী গো? কোথায়?'

'স্টিমারে। স্ট্যাচু দেখতে যাচ্ছি।'

'বাঃ। তার আগে তাকিয়ে দ্যাখো ম্যানহাটন স্কাই লাইন। ওই দৃশ্য কোথাও দেখতে পাবেনা। সঙ্গে কোনও মেয়ে জুটে যায়নি তো?'

'ধ্যেৎ!' লজ্জা পেল মতিন।

'তোমাদের এই পুরুষজাতটাকে একটুও বিশ্বাস করি না বাবা। রাখছি।'

ফোন অফ করল মতিন। সুলতানাভাবি একটু বেশি কথা বলে কিন্তু মনটা বেশ ভালো। কথাবার্তাও আটপৌরে।

স্টিমার চলছে জলে ঢেউ তুলে। রেলিং-এ ভর রেখে দাঁড়িয়ে মতিন দেখছিল স্ট্যাচু এগিয়ে আসছে। তরপর খুব কাছাকাছি চলে এলে মুগ্ধ হয়ে দেখল সে। এই সময় পেছন থেকে কথা ভেসে এল, 'আমাদের দেশের লোক বলে মনে হচ্ছে না। বোধহয় পাকিস্তানি? হিন্দিতে বলো, বুঝতে পারবে।'

'পাকিস্তানিরা তো উর্দু বলে।'

'আঃ। একই হল।'

মতিন পেছন ফিরে দেখল দুটি মানুষ তাকে দেখছে। দুজনেরই বয়স হয়েছে। বৃদ্ধার পরনে সাদা শাড়ি।

'আপনারা আমাকে কিছু বলছেন?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'আরে। ইনি তো বাংলা বলছেন! আপনি বাঙালি? বৃদ্ধা উল্লসিত।

'আমি বাঙালি!'

এবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ওই দ্বীপে থাক বাবা? মাথা নাড়ল মতিন, 'না। কেন বলুন তো।'

'আমাদের মেয়ের খোঁজে এসেছি। যে ঠিকানা পেয়েছি সেটা ওই দ্বীপের একটা রাস্তায় আছে। আমরা তো কাউকে চিনি না, তুমি যদি ওই দ্বীপে থাকতে তা হলে—!'

মতিন মাথা নাড়ল, 'এখানে ঠিকানা থাকলে বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। যদি চান তা হলে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।'

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন। ততক্ষণে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ছাড়িয়ে গেছে স্টিমার।'

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী বাবা?'

'আমি মতিন। বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

'বাংলাদেশ? কোথায়। কোন জেলায়?'

মতিন নাম বলতেই বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'আরে! ওর পাশের গ্রামেই তো আমার ঠাকুরদা থাকতেন। আমি যখন ছয় বছরের তখন বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। পনেরো বছর বয়সে একবার গিয়েছিলাম। ওঃ, খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে।'

বৃদ্ধা হাসলেন, 'দ্যাখো, কতদূরে এসে দেশের লোকের সঙ্গে দ্যাখা হয়ে গেল।'

'আপনারা ইন্ডিয়ার কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ ভাই,' বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'আমাদের বাড়ি কৃষ্ণনগরে। জেলা নদীয়া। আমাদের জেলার গেদের গায়েই বাংলাদেশ আরম্ভ।'

'এখানে কবে এসেছেন?'

'তিনদিন হয়ে গেল। সবাই নিষেধ করেছিল আসতে। ওঁর এক আত্মীয়ের ছেলের বাড়িতে উঠেছি। সে-ই এয়ারপোর্ট থেকে এনেছিল। কিন্তু বেচারা এত ব্যস্ত থাকে যে আমাদের সময় দিতে পারে না। তাই নিজেরাই বেরিয়ে পড়েছি।' বৃদ্ধ বললেন।

'ভিসা পেতে অসুবিধে হয়নি?'

'হ্যাঁ। খুব। প্রথমবার ফিরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বারে উনি এমন কান্নাকাটি শুরু করলেন মেয়ের জন্যে, বোধহয় না দিয়ে পারল না।'

স্টিমার ঘাটায় এলেন কী করে?'

'যার বাড়িতে উঠেছি সে তার গাড়িতে চাপিয়ে এখানে নামিয়ে দিল। ম্যানহাটনের কাছে তার অফিস। বলেছে, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।' বৃদ্ধ বললেন।

'আপনারা মেয়ের খোঁজে এসেছেন বললেন!' মতিন দেখল একটা স্থলভূমি এগিয়ে আসছে। ওটাই নিশ্চয়ই স্যাটার্ন আইল্যান্ড। তার রিটার্ন টিকিট তাই নেমে বেরিয়ে আবার আর একটা স্টিমারে উঠতে পারবে।

বৃদ্ধের মুখে ছায়া ঘনাল। ততক্ষণে স্টিমার ঘাটে পৌঁছে গিয়েছে। মাটিতে নেমে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে যাত্রীরা। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে মতিন দেখল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাল রাখতে পারছেন না। সে গতি কমিয়ে দিয়ে ওঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল।

একটু হাঁটতেই দুপাশে দোকানপাট, দেখে বোঝা যায় ব্যবসা করার এলাকা। মতিন বলল, 'যদি ঠিকানাটা দেন তাহলে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি।'

বৃদ্ধ একটা কাগজ বের করে মতিনের হাতে দিলেন।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এখনই ফিরে যাবে বাবা?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'না। বলেছি তো, আমার কোনও তাড়া নেই।'

তারপর একটি পুলিশের কাছে গিয়ে ঠিকানাটা দেখাল মতিন?' পুলিশ বলল, 'ফার অ্যাওয়ে। টেক এ ক্যাব।'

ফিরে এসে সে বৃদ্ধকে বলল কথাটা। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবে?' বৃদ্ধা বেশ জোরে জোরে বললেন, 'এতদূরে এসেছি যখন তখন শেষ দেখে ফিরব।'

বৃদ্ধ ইতস্তত করলেন, 'কিন্তু আমরা একা একা, ট্যাক্সি নিয়ে যেতে বলছে—!'

ক্যাব শব্দটির মানে এতক্ষণে বুঝতে পারল মতিন। হেসে বলল সে, 'কেন চিন্তা করছেন,

আমি তো সঙ্গে আছি।'

'ও। আচ্ছা! তা হলে যাওয়া যেতে পারে।' বৃদ্ধ বললেন।

একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। তার কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখালে সে ইশারা করল উঠে বসতে। পেছনের সিটে ওদের দুজনকে বসিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল মতিন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'অনেকদিন মেয়ের খোঁজ পাননি বোধহয়!'

'পাঁচ বছর!' বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'কোন চিঠি দূরের কথা, ফোনও করেনি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি বলেছিলাম, ধরে নাও মেয়ে মরে গেছে। কিন্তু ইনি সেকথায় কানই দিলেন না। দিন রাত কান্না—।'

'এরকম কেন হল?' মতিন জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

'প্রেম করে বিয়ে। ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে। বছরে একবার যেত। তখনই আলাপ। পরে জানতে পারলাম। বাপ-মা নেই। দূর সম্পর্কের এক মামা থাকেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ে দিলাম। তার ছয় মাস পরে ভিসা পেল মেয়ে। জামাই টিকিট পাঠালে একাই চলে এল। আসার সময় ওই ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল। ফোন নাম্বারও। অনেক ফোন করেছি দেশ থেকে, ফোন বাজেনি। ইনি জেদ ধরলেন, নিজের চোখে দেখে যেতে চান—।' বৃদ্ধ বললেন।

'আমি কিছু চাই না। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, এটুকুই জানতে চাই।' বৃদ্ধার গলার স্বর খুব করুণ শোনাল।

'আপনারা ইন্ডিয়ার বাঙালি?' আচমকা প্রশ্ন করল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

বৃদ্ধ পেছন থেকে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি বাংলা জানেন?'

'আমি বাঙালি। সিলেটের মানুষ ছিলাম।'

'আপনাকে দেখলে মনেই হয় না আপনি বাঙালি।' মতিন বলল, 'আমি বাংলাদেশের মানুষ। ঢাকার কাছেই থাকি।'

'তাই? আপনাদের সম্পর্ক কী?'

মতিন বলল, 'আমরা বাঙালি। তবে পথেই আলাপ।'

'ভালো লাগল। তা চাচা, আপনার জামাই কি ইন্ডিয়ার লোক?'

'হ্যাঁ। কলকাতার ছেলে ছিল একসময়।'

'চলেন, দেখি।'

কুড়ি মিনিট চলার পর বড় রাস্তা ছেড়ে পাড়ার রাস্তায় গাড়ি ঢুকল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটি বাড়ির গায়ে নাম্বারটা দেখতে পেয়ে গেল ড্রাইভার। বলল, 'এই বাড়ি। কিন্তু—!' লোকটা গাড়ি থেকে নেমে বেল বাজাল। পরপর তিনবার। ততক্ষণে ওঁরা নেমে দাঁড়িয়েছেন গাড়ি থেকে। ড্রাইভার বলল, 'বাসায় কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে। ছুটির দিনে বোধহয় বাইরে গিয়েছে।'

পাশের বাড়ির দরজার সামনে বেশ বৃদ্ধ এক আমেরিকান সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। ড্রাইভার তাঁর কাছে গিয়ে অন্যরকম উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, এই বাড়িতে লোকজন থাকে তো?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'থাকে। একজন ইন্ডিয়ান আর তার ফিলিপিনসের বউ দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকে। ওরা কারও সঙ্গে কথা বলে না।'

'কতদিন ধরে আছে ওরা?'

'প্রায় সাত বছর।'

'কোনও ইন্ডিয়ান মহিলাকে এই বাড়িতে দেখেছেন?'

'আমি দেখিনি। তবে আমার স্ত্রী বলেছিল একটি ইন্ডিয়ান মেয়েকে ওই বাড়িতে এনেছিল লোকটা। বহু বছর আগে। তাকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই। আর কোনও ইন্ডিয়ান মেয়েকে আমরা দেখিনি।' বৃদ্ধ মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।

ফিরে এসে ড্রাইভার বলল, 'বুড়োর তো কোনও কাজ নেই। গাড়ি থামলেই বেরিয়ে এসে দ্যাখে কে এল! আপনাদের মেয়ে এখানে থাকলে ওর চোখ এড়াবে না।'

মতিন বলল, 'তাছাড়া এখানে তো একজন ইন্ডিয়ান তার ফিলিপিনের বউ নিয়ে থাকে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে ঠিকানাটা ভুল লিখেছে। কী করবে?'

'ওই ইন্ডিয়ান লোকটার নামটা জানা যাবে?'

'যার অন্যদেশি বউ-বাচ্চা আছে তার নাম জেনে কী করবে।' ধমক দিলেন বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত মুখে চেপে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা।

'কী হচ্ছে? চুপ কর।' বৃদ্ধ বললেন।

ড্রাইভার বললেন, 'আমার মনে হয় আপনাদের থানায় যাওয়া উচিত।'

'থানা?' বৃদ্ধ হতভম্ব।

'দেখুন, যে ঠিকানাটা পেয়েছিলেন সেখানে একজন ইন্ডিয়ান থাকে। লোকটা বাঙালি হতেও পারে। হলে তার কাছ থেকে আপনার মেয়েজামাই-এর খবর পেতে পারেন।' পুলিশ এই লোকটার খোঁজখবর দিতে পারে।' ড্রাইভার বলল।

'কিন্তু থানা কোথায় তা তো জানি না। তা ছাড়া বাবা আমি এখানকার মানুষের বলা ইংরেজি বুঝতে পারি না। তার চেয়ে তুমি যেখান থেকে আমাদের তুলেছিলে সেখানেই নামিয়ে দাও। আমরা ফিরে যাব।' বৃদ্ধ বললেন।

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন! না। উনি ঠিক বলেছেন। আমরা থানায় যাব।'

'আশ্চর্য!' বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন, 'তুমি সেখানে গিয়ে ইংরেজিতে সব কথা ওদের বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

ড্রাইভার হাসল, 'ঠিক আছে, চলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু ট্যাক্সির ভাড়া কত ডলার উঠবে?'

ড্রাইভার বলল, 'আমি গাড়ি থামানোর সময় মিটার অফ করে দিয়েছিলাম' এখন যা উঠে আছে তাই দেবেন। উঠুন।

পুলিশ অফিসারটি তরুণ। তিনজনকে সামনে বসিয়ে ড্রাইভার সব কথা তাঁকে বলতেই তিনি কমপিউটারের সামনে গিয়ে বসলেন। ফিরে এসে বললেন, 'মিস্টার আর পি সেন, ম্যারেড উইদ টু কিডস, ফিলিপিনো ওয়াইফ।'

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রমাপ্রসাদ সেন। ওই, ওই—!'

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আপনার মেয়ের জামাই?'

'মেয়ের কেন হবে? আমাদের জামাই।' বৃদ্ধ বললেন।

ড্রাইভার আবার কথাগুলো বললে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের এই বিয়ের কোনও প্রমাণ আছে?'

কথাটা বৃদ্ধকে ড্রাইভার বুঝিয়ে দিলে তিনি হাতের ব্যাগ খুলে একটা সার্টিফিকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাগ্যিস এই ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা এনেছিলাম!'

সেটায় চোখ বুলিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার সেন এবং তার ফ্যামিলি বাড়িতে নেই যখন-তখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

মতিন বলল, 'আচ্ছা, একজন ইন্ডিয়ান মহিলাকে পাশের বাড়ির মহিলা বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন কিন্তু বেরোতে দেখেননি। তিনি বাড়িতেই থেকে যাননি তো?'

ড্রাইভার কথাগুলো তর্জমা করলে অফিসার হেসে উঠলেন, 'ইটস নট পসিবল। তিনি তো

চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেননি। আমি ওই দিকের যেসব অফিসার রাউন্ড দিচ্ছে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি মিস্টার সেন এলেই যেন আমাকে খবর দেয়। আপনারা পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই নিন কার্ড।' সার্টিফিকেট ফেরত দিলেন তিনি।

কার্ড হাতে নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। বৃদ্ধা বলল, 'আমার মন বলছে রমাপ্রসাদ তৃণাকে মেরে ফেলেছে। বউবাচ্চা থাকা সত্ত্বেও যে বিয়ে করতে পারে! ও মাগো!'

'ওইরকম দুম করে বিয়ে করে বসল মেয়েটা!' বৃদ্ধ বলল।

'তখন তোমাকে বলেছিলাম ছেলেটা কেমন তার খোঁজখবর নাও।'

'বললেই হল। আমেরিকায় আমার কে আছে যে খোঁজ দেবে।'

এই সময় অফিসার বেরিয়ে এলেন থানা থেকে। পুলিশের গাড়ির দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, 'ফলো মি!'

ড্রাইভার বলল, 'নিশ্চয়ই ওর ফিরে আসার খবর পেয়েছে। চলুন, চলুন।'

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ অফিসার সোজা বেল টিপলেন।

একটু বাদেই নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক দরজা খুলল। তাঁর পরণে এখনও বাইরে যাওয়ার পোশাক।

'আপনি মিস্টার আর পি সেন?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?' ইংরেজিতেই জবাব এল।

'আপনি ওই ওল্ড ম্যান এবং লেডিকে চেনেন?'

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখলেন ভদ্রলোক, 'না। কে ওরা?'

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে ওরা? রমাপ্রসাদ, তুমি আমাদের চেন না?'

'সরি। আমি আপনাদের কখনও দেখিনি।'

'আপনি বিবাহিত?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। আমার দুটো বাচ্চাও আছে। ওরা এই মুহূর্তে আমার শ্বশুরবাড়িতে আছে। আজই রেখে এলাম।'

'আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখব।'

'কেন?' হঠাৎ ভদ্রলোক রেগে গেলেন, 'আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে? ওটা ছাড়া আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারেন না।'

'আমি তো বলিনি সার্চ করব। বলেছি ঘুরে দেখব। মিস্টার সেন, এঁরা যে অভিযোগ করেছেন এবং তার যে প্রমাণ দাখিল করেছেন তাতে আপনাকে আমি স্বচ্ছন্দে অ্যারেস্ট করতে পারি। আপনি কি আমাকে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে বাধ্য করবেন?'

'অফিসার। আপনি একতরফা কয়েকটা পাগলের কথা শুনেছেন। আমি এদের কাউকেই কখনও দেখিনি।

'ঠিক আছে, আমি কি আপনার স্ত্রীর ছবি দেখতে পারি?' অফিসার তাকালেন।

'সিওর। শুধু আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি দেখাচ্ছি।'

অফিসারকে বসার ঘরে বসিয়ে পাশের ঘর থেকে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি এনে সামনে ধরলেন মিস্টার সেন।

'কবে বিয়ে হয়েছিল আপনাদের?'

'সাত বছর হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে আছি।'

'সরি স্যার, আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

'ইটস অলরাইট, আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন।' হাসলেন মিস্টার সেন।

এইসময় বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের চিৎকার ভেসে এল। কুকুরটা বাইরে বের হতে চেষ্টা

করছে কিন্তু পারছে না।

'আপনার বাড়িতে কুকুর আছে?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, মানে, আমার কুকুর নয়, এক বন্ধু বাইরে গিয়েছে, রাখতে দিয়েছিল।'

'ওকে বাড়িতে বন্দি করে রেখে আপনারা বাইরে গিয়েছিলেন, সঙ্গে নিয়ে যাননি কেন?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'এখনও ওটা আমাদের পোষ মানেনি, শুনছেন তো কীরকম চেঁচাচ্ছে।'

'ওকে বাইরে আনুন, বোধহয় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।'

'না অফিসার। ও কামড়ে দিতে পারে।'

'কী কুকুর। ডাক শুনে মনে হচ্ছে স্পিজ!'

'হ্যাঁ। স্পিজ।'

'আমাকে কামড়াবে না। স্পিজের সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। চলুন কোন ঘরে আছে ও?'

'আপনি মিছিমিছি আমার বাড়ির ভেতরে নাক গলাচ্ছেন অফিসার।'

'এক্ষেত্রে মিছিমিছি নয়। গৃহপালিত জন্তু বিপদে পড়েছে কি না দ্যাখা আমার কর্তব্য। দয়া করে আপত্তি করবেন না। চলুন।'

মিস্টার সেন বাধ্য হয়ে অফিসারকে বেসমেন্টের বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে এলেন। কুকুরটার ডাক আরও স্পষ্ট হল।

মিস্টার সেন বললেন, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি নিয়ে আসছি।'

দরজা খুলে এক পা নীচে নামামাত্রই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মিস্টার সেনের ওপরে। পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে নিজেকে সামলালেন ভদ্রলোক। কুকুরটা আবার দৌড়ে ফিরে গেল নীচে। অফিসার সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এসে ডাকলেন, 'কাম অন বেবি, কাম অন!'

একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে মাটির নীচের ওই ঘরে। কুকুরটা সোজা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যার পাশে তাকে দেখে চমকে উঠলেন অফিসার, 'হু আর ইউ?'

মতিন এবং ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে মহিলাকে ওপরে যখন নিয়ে আসা হল তখন দ্যাখা গেল তিনি আলো সহ্য করতে পারছেন না। দু-হাতের আড়ালে চোখ রেখে পায়ে পায়ে হাঁটছেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসামাত্র তাঁরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'বৃদ্ধা কাঁদলেন, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোর। এ কী অবস্থা?'

মিস্টার সেনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে সমস্ত অভিযোগ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং তাঁদের মেয়েকে দিয়ে লিখিয়ে পুলিশ জানাল তাঁদের এখনই দেশে ফিরে যাওয়া চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলা আদালতে তুলবে তারা, সেখানে তাঁদের প্রয়োজন হবে। নিউইয়র্কের ঠিকানা, ফোন নাম্বার নিয়ে নিল পুলিশ। মিস্টার সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক, বিবাহিত হয়েও সেটা চেপে গিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। দুই, সেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাড়িতে এনে বেসমেন্টে রেখে রান্না করিয়েছেন, বেবিসিটারের কাজ করিয়েছেন, কখনই সূর্যের আলো দেখতে দেননি। এইসব অপরাধের জন্যে ওঁকে অন্তত দশ বছর জেলে থাকতে হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ওঁদের যখন স্টিমার ঘাটায় পৌঁছে দিল তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ড্রাইভার বলল, 'শান্তিতে যান। যখনই স্যাটার্ন আইল্যান্ডে আসবেন আমাকে একটা কল দেবেন।' দুটো কাগজের টুকরোতে নিজের মোবাইল ফোনের নাম্বার লিখে দিল সে। বৃদ্ধ পকেট থেকে দুশো ডলার বের করে এগিয়ে ধরলেন, 'আজ তুমি যা করেছ বাবা তার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব

না। এইটে রাখো।'

'আপনি কী বলেন! বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্যে এটুকু করতে পারব না? ওটা রাখুন, এখন আপনাদের সামনে অনেক খরচ আছে।' ড্রাইভার হাসল।

'কিন্তু এতক্ষণ সময় গেল, তেল পুড়িয়ে গেলে এলে—।'

চাচা। গাড়িটা আমার ঠিক আছে, বিশ টাকা দিন।'

'বিশ টাকা?'

'ওই হল, কুড়ি ডলার। তাতেই সব হয়ে যাবে।'

স্টিমারে বৃদ্ধা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন। বৃদ্ধ বললেন, 'সমস্যায় পড়ে গেলাম। যতদিন মামলার রায় না বের হচ্ছে ততদিন তো এখানে থাকতে হবে। ছয় মাসের ভিসা দিয়েছে। কিন্তু যেখানে আছি সেখানে তো এতদিন থাকা যাবে না।'

'ফিরে গিয়ে আবার আসা যাবে না?' বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন?'

'তোমার কি মাথা খারাপ?' খিঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, 'প্লেনের ভাড়া কত তা কি ভুলে গেছ? কী যে করি!'

মতিন চুপচাপ শুনছিল, 'যাঁর বাড়িতে আছেন তাঁকে বলুন কম পয়সায় ঘর ভাড়া করে দিতে। নিজেরা রান্না করে খাবেন।'

'একটা ঘরের ভাড়া কীরকম?'

'আমি জানি না। তবে খোঁজ নিয়ে বলতে পারি।'

মতিন সুলতানার নাম্বারটা টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সুলতানার গলা, 'বাপস' এতক্ষণে মনে পড়ল। প্রাণভরে স্ট্যাচু দেখলে? আমি বাজি রাখতে পারি, ওটা যদি কোনও পুরুষমানুষের স্ট্যাচু হত তাহলে এক মিনিটেই দেখা হয়ে যেত।'

'আমাকে একটা খবর দেবেন?'

'বলো।'

'আচ্ছা, বাথরুম রান্নাঘর সমেত একটা ঘরের ভাড়া কত হবে?'

'এ্যাঁ? তুমি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবে?'

'না না। অন্যের জন্যে। ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন দুজন বয়স্ক মানুষ।'

'অ। এর মধ্যেই তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল?' হাসল সুলতানা, 'কোন জায়গায় থাকবে তার ওপর ভাড়া কমবেশি হবে। কুইন্সে মাসে আটশোর নীচে পাওয়া যাবে না। আবার জ্যামাইকায় পাঁচ-ছয়শোতেও পাওয়া যেতে পারে। তুমি কোথায়?'

'বাসায় ফিরছি।'

'ফিরে কল দিও।'

ফোন বন্ধ করে খবরটা দিল মতিন।

বৃদ্ধ বললেন, 'দেশ থেকে টাকা আনাতে হবে। ওই ভাড়া হলে কয়েকমাস নিশ্চয়ই থাকতে পারব। তুমি আমাদের ঘরটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে?'

'আমার মোবাইল ফোনের নাম্বার রাখুন। দুদিন পরে ফোন করবেন।'

নাম্বারটা লিখে বৃদ্ধ বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ মতিন।'

বৃদ্ধা বললেন, 'তোমার এতদিনের ভুল ভাঙল তো?'

'কী ভুল?' বৃদ্ধ ভ্রু কোঁচকালেন।

'কবে কোন মুসলমান তোমার বাবার ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছিল বলে ওদের তুমি সহ্য করতে

পারতে না। আমি কতবার বলেছি, নজরুল ইসলামও তো মুসলমান ছিলেন। মহম্মদ রফি, তালাত মামুদরাও তো তাই। কানে তোলনি কথাগুলো। আজ দেখলে তো, এরা না থাকলে আমরা কখনও মেয়েকে ফিরে পেতাম? কী দরকার ছিল ওদের আমাদের জন্যে সময় নষ্ট করার? বলো?' বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন।

মতিন হাসল, 'সব জাতের মধ্যে ভালো যেমন আছে মন্দও আছে। কোনও কোনও হিন্দু নিশ্চয়ই খুব খারাপ লোক। তার মানে এই নয় সব হিন্দুই খারাপ।'

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে মতিনকে স্পর্শ করলেন, 'তোমরা আমার ভুল ভাঙিয়ে দিলে মতিন। না হলে আজ আমরা তৃণাকে খুঁজে পেতাম না।'

মতিন বলল, 'মেয়েকে পাওয়ার আনন্দে আপনারা ভুলে গেছেন উনি কখন খেয়েছেন তা জিজ্ঞাসা করতে!'

তৃণা মায়ের কাঁধে মুখ রেখে বসেছিল, শুনে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

কান্না গিলতে গিলতে তৃণা বলল, 'শুধু রাত্রে খেতে দিত। একবেলা।'

মতিন দেখল স্ট্যাচু এগিয়ে আসছে, সে কিছুটা হেঁটে এপাশ-ওপাশ তাকাতেই খাবারের স্টলটা দেখতে পেল। প্যাটিস, কেক, প্যাস্ট্রির সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্ক বিক্রি করছে। সে একটা ফ্রুট কেক আর কোল্ড ড্রিঙ্ক কিনল চার ডলার দিয়ে। তারপর ফিরে এসে বৃদ্ধাকে বলল, 'আপাতত খেয়ে নিতে বলুন। শরীর ভালো লাগবে।'

বৃদ্ধা খুশি হয়ে মেয়ের হাতে দিলেন। তৃণা একটু ইতস্তত করে খেতে শুরু করলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত লেগেছে?'

'ভুলে গেছি।' হাসল মতিন।

'সত্যি, তোমাদের কী বলে—।'

'কিছুই বলতে হবে না।'

কেক পুরোটা খেতে পারল না তৃণা। কিন্তু তার মুখের চেহারা অনেকটা পালটে গেল। মতিনের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, 'ধন্যবাদ।'

এপারে নেমে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারাও তো অনেকক্ষণ খাননি। চলুন, এখানে বাংলাদেশের একজন খুব ভালো হটডগ বানায়।'

বৃদ্ধা বললেন, 'না বাবা। আমরা বাড়িতে গিয়েই খাব।

বোধহয় তৃণার অসুবিধের কথা ভেবেই একটা ট্যাক্সি ধরলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'মতিন, তুমি কোনদিকে যাবে? আমাদের দিকে হলে সঙ্গে চলো।'

মতিন মাথা নাড়ল, 'আমি মাটির ওপরের কিছুই চিনি না। তাই ট্রেনে যাব।'

টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন বলে ওঁরা চলে গেলেন।

হারুণভাই তার চলমান দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। এখন কোনও খদ্দের নেই। মতিনকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এতক্ষণ কোথায় কি ছিলেন?'

'ওই দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একটা হটডগ দিন।' মতিন বলল।

'ওখানে তো কিছু দেখার নেই। স্ট্যাচু কেমন লাগল?' হারুণ জিজ্ঞাসা করল।

'ভালো।' মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'রাসেল কোথায়?'

'কোথায় মানে? সে তো আপনার সঙ্গে গেল। এত দেরি হবে জানলে আমি ওকে পাঠাতাম না। আমার টয়লেটে যাওয়ার খুব প্রয়োজন।'

'কিন্তু রাসেল আমার সঙ্গে যায়নি।'

'বলেন কী?' চোখ কপালে তুলল হারুণ।

রাসেলের ব্যাপারটা খুলে বলল মতিন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল হারুণ, 'হারামজাদা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার কাছে দশ ডলার নিয়ে নিশ্চয়ই গাঁজা খাচ্ছে পার্কের কোনও কোণে বসে। এই ছেলে আমাকে একদম বরবাদ করে দিল। কিছুতেই তাড়াতে পারি না ওর মায়ের জন্যে। ছি ছি ছি।' বলে ক্যাশবাক্স থেকে দশ ডলারের নোট নিয়ে মতিনের হাতে গুঁজে দিল হারুণ, 'সরি ভাই।'

নোটটা নিল মতিন, বলল, 'আপনার টয়লেটে কতটা সময় লাগবে?'

'কেন?'

'ততক্ষণ আমি দোকান পাহারা দিতে পারি।'

'কাস্টমার আসলে কী করবেন?'

'আপনি যেভাবে খাবার গরম করে দেন সেইভাবে দেব।'

মতিনের কথা শুনে হাসল হারুণ, 'থ্যাঙ্কস ভাই। আপনাকে খাবার বিক্রি করতে হবে না। আপনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন। এখানে অনেক চ্যাংরা আছে, দেখবেন তারা যেন কিছু তুলে নিয়ে না যায়।'

'ঠিক আছে।'

হারুণের যে প্রয়োজন বেশ হয়েছিল তা ওর হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল। মতিন দোকানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। পরিচিত কেউ এখানে নেই। যদি টিয়া তাকে দেখত নিশ্চয়ই খুব হাসত।

ভাবতেই দুটো মেয়ে এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। অল্প বয়সি কালো মেয়ে। কিন্তু তাদের অঙ্গে শরীর দেখানো পোশাক। মতিন গম্ভীর হল।

একজন বলল, 'হাই!'

মতিন মাথা নাড়ল। হাই শব্দটা বলতে গিয়েও পারল না।

'উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার ওয়ালেট। বাট উই আর হাংরি। প্লিজ হেল্প আস।' বলতে বলতে মেয়েটা বাঁ-চোখ ছোট করল। অন্য মেয়েটি হেসে উঠল শব্দ করে, 'নাইস গাই। পারহ্যাপস পাকিস্তানি!'

সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গেল মতিনের, 'সরি! দিস ইজ নট মাই শপ।'

'আর ইউ সিওর?' প্রথম মেয়েটি বলল, 'দেন, বাই ফর আস।'

'ইউ ওয়েট। দি শপকিপার ইজ কামিং।' মতিন বলল।

প্রথম মেয়েটি তার নাভির দুপাশে লাগানো রিং দুটোয় বাঁধা হলদে সুতো একটানে খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'দেন, হু আর ইউ?'

কী উত্তর দেবে, মতিন ভেবে পাচ্ছিল না। তখনই হারুণভাই-এর চিৎকার ভেসে এল, 'কথা বলবেন না ভাই, এরা ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ।' কাছে এসে মতিনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক-ইউ ভাই, আপনি যান।' বলতে বলতে একটু ঠেলে দিল হারুণভাই। মতিন বুঝতে পারল সে ওখানে থাকুক তা মানুষটা চাইছে না। সে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠল। মেয়েদুটো তার পেছন পেছন আসছে। সে আরও গতি বাড়িয়ে দিল।

পাতালরেলের স্টেশনে ঢুকে পড়ে খানিকটা স্বস্তি পেল মতিন। এ কীরকম মেয়েমানুষ? 'এফ' ট্রেন আসতেই উঠে পড়ল সে। সিটে বসতে না বসতেই সুলতানার টেলিফোন এল, 'কোথায় এখন?'

'ট্রেনে। বাসায় ফিরছি। এইমাত্র উঠলাম।' মতিন বলল।

'তা হলে তুমি ইউনিয়ন টার্নপাইকে নেমে এসো।'

'সেটা কী?'

'বুদ্ধু কোথাকার। ওটা একটা স্টেশন। নাম অ্যানাউন্স করলেই নেমে পড়বে। আমি ওখানে থাকব।' লাইন কেটে দিল সুলতানা।

একটু পরেই দিন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। দিনভর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে আরাম করতে ইচ্ছে করছে, তাছাড়া সারাদিনে একটা হটডগ ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি। স্টিমার থেকে নেমে আর একটা খেতে চেয়েছিল কিন্তু রাসেলের প্রসঙ্গ ওঠার পর হারুণভাই এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে ওটা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল।

অনেকগুলো স্টেশন পার হওয়ার পর ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনের নাম কানে আসতেই উঠে দাঁড়াল সে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতেই সুলতানাকে দেখতে পেল মতিন। আজ সুলতানার পরনে প্যান্ট এবং টপ। একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। মুখোমুখি হতেই সুলতানা জিজ্ঞাসা করল, 'কতক্ষণ খাওনি?'

হেসে ফেলল মতিন, 'অনেকক্ষণ।'

'চলো, আমিও আজ সারাদিন খাইনি।'

'কেন?'

'একা খেতে ইচ্ছে করছিল না।'

'মুর্শেদভাই ছিল না?'

'না। তিনি আজ জরুরি কাজে ফিলাডেলফিয়াতে গিয়েছেন। ফিরতে অনেক রাত হবে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল সুলতানা।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

'চলো না।'

মতিন দেখল রাস্তাঘাট বেশ নির্জন। ছবির মতো। ছিমছাম বাড়ি দুই পাশে। সে জিজ্ঞাসা করল 'এদিকে ম্যাকডোনাল্ড নেই।'

'থাকবে না কেন! তবে তার চেয়ে ভালো খাবারের জায়গা আছে। তোমার কেমন লাগছে পাড়াটা। আমাদের দেশের মতো মোটেই না।' সুলতানা হাসল।

সুন্দর একটা দোতলা বাড়ি। নীচের দরজার তালা খুলল সুলতানা। বলল, 'এসো।'

'এটা কাদের বাড়ি?'

'আমাদের। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল মতিন সুলতানার পেছন পেছন। একটা মাঝারি হল ঘরে সোফা রয়েছে ছয় জনের জন্যে। পাশে কিচেন, ওদিকে ব্যালকনি।

'বসো। আমি এখনই আসছি।' করিডোর দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল সুলতানা।

মতিন দেখল ঘরটাকে। বঙ্গবন্ধুর বড় ছবি দেওয়ালে। তার নীচে খাওয়ার টেবিল। মুর্শেদভাই মামার কোম্পানিতে কাজ করে। বোঝাই যাচ্ছে খুব খারাপ মাইনে পায় না। অথচ মামা কোনওদিন তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি।

সুলতানা বেরিয়ে এল পোশাক বদলে। হাঁটুর নীচ অবধি যে পোশাকটা সে পরেছে তা ঠিক নাইটি নয় অথচ কী বলা যায় বুঝতে পারল না মতিন। অনেক আগে বাঙালি মা-মাসিরা এইরকম পোশাকের ওপর শাড়ি পরত। কিন্তু সুলতানা সেটা পরেনি।

সুলতানা এখন রান্নাঘরে, 'কী কী দেখলে বলো!'

মতিন তার অভিজ্ঞতার কথাগুলো একে একে বলল। তৃণার কথা শোনার পর সুলতানা

বলল, 'বেচারা! কী শয়তান লোকটা। এখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না, যারা করে তারা কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনেক টাকা নেয়। বেবিসিটারের কাছে বাচ্চা রাখলেও বেশ খরচ। তাই কেউ কেউ দেশ থেকে বিয়ে করে লোক নিয়ে আসে এখানে। আয়া কাম রাঁধুনির কাজ করায়। এই লোকটা তো ক্রিমিন্যাল, মেয়েটাকে বন্দি করে রেখেছিল। ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।'

রাসেলের কথা শুনে বলল, 'কিছু করার নেই। এদেশে জন্মালে এরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে বাপ-মায়েরও দোষ আছে।'

দুটি কালো মেয়ের কথা শুনে বলল, 'বেঁচে গেছ। এসো।'

খাবারের প্লেট টেবিলে এনে রাখল। মতিন উঠে এসে দেখল ভাত, ভর্তা, ডাল, মুরগির মাংস আর চাটনি সাজিয়ে দিয়েছে সুলতানা। নিজেও তাই নিয়ে বলল, 'খেতে পারবে কিনা জানি না। শুরু কর।'

তৃপ্তি করে খেল মতিন। বলল, 'খুব মজা লাগল।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

প্লেট বাটি সিঙ্কে রেখে হাত ধুয়ে ধপ করে মতিনের পাশে বসল সুলতানা, 'এই, তুমি সিগারেট খাও?'

'না।'

'গুড। সিগারেটের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। পেট ভরেছে?'

'খুব।'

'আমার ভরেনি।'

'আরও একটু খেলেন না কেন?'

'তুমি কম খেলে আমি বেশি কী করে খাব। ঠিক আছে, এদিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও।' মতিনের মুখ দু-হাতে নিজের দিকে ফেরাল সুলতানা। তারপর তার ঠোঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতানা। কীরকম অবশ হয়ে গেল মতিন। ততক্ষণে মুখ সরিয়ে নিয়ে সুলতানা বলল, 'লবণ ছাড়া ভর্তা খেলাম।'

মতিনের মুখ থেকে বের হল, 'অ্যাঁ!'

'আমি চুমু খেলাম কিন্তু পেলাম না। ভাল্লাগে না।'

'আমি ঠিক—!'

'এর আগে কোনও মেয়েকে চুমু খাওনি?'

'না।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সুলতানা। তারপর মতিনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি খুব ভালো। আচ্ছা, আমাকে তুমি খারাপ ভাবছ, না?'

'না, ঠিক তা নয়—!'

'তাহলে!'

'মুর্শেদভাই জানলে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে।'

মাথা নাড়ল সুলতানা, 'তোমার মুর্শেদভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমাকে বিয়ে করার সময় হয়তো ওর মন অন্যরকম ছিল, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আমার দিকে তাকালেই ভেবেছে আমি আগের স্বামীর সঙ্গে একইরকম আচরণ করেছি। সে আমাকে যেভাবে আদর করবে তা আর একজন আগেই আমার সঙ্গে করে গেছে। আচমকা পালটে গেল সে। একইসঙ্গে থাকি, কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, কিন্তু কোনও শারীরিক সম্পর্ক রাখেননি। আমার খুব রাগ হয়। ওর ওপর খামোখা বকাঝকা করি, চোখ রাঙাই, আসলে ওই রাগটা অন্যভাবে প্রকাশ করি। কিন্তু আর পারছি না।'

'ওকে সব বুঝিয়ে বলেন না কেন?'

'বলে কোনও লাভ হবে না। জানো, আমার যে বান্ধবীর কথা তোমায় বলেছিলাম, যার স্বামী গ্যাস স্টেশনে চাকরি করে, তার সঙ্গে ওর ইদানীং বন্ধুত্ব হয়েছে। ওর দুটো বাচ্চা, দেখতে সাধারণ, আমার চেয়ে অনেক খারাপ, তবু তার প্রেমে পড়েছে। অথচ আমার বান্ধবীও তো একজনের স্ত্রী, তাকে দেখে কিন্তু ওর মনে হয় না সে-কথা।' সুলতানা বলল।

'আপনি হয়তো ভুল ভাবছেন!'

'মোটেই না। বান্ধবীই আমাকে সব কথা বলে। আমি চুপচাপ শুনি। বান্ধবী বলে কী করব, বল। আমি বলে দিয়েছি, তোর যা ইচ্ছে, আমি একটুও দুঃখিত নই।' হেসে উঠল সুলতানা।

'একথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ, কারণ, সে তো বান্ধবীকে বিয়ে করতে পারবে না।' সুলতানা দুহাতে জড়িয়ে ধরল মতিনকে, 'তুমি বলো, আমি কি বিশ্রী দেখতে?'

শ্বাস নিল মতিন, 'না না। একদম নয়।'

ছেড়ে দিল মতিনকে সুলতানা। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। মতিন, আমার কোনও বন্ধু নেই। এতদিন ভাবতাম সংসারই করব। এখন সময় কাটছে না। তাই ভাবছি চাকরি করব। কিন্তু তাতেও তো একাকিত্ব কাটবে না। তুমি আমার বন্ধু হবে?'

'আমি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।'

'বয়স বন্ধুত্বের মধ্যে বাধা হতে পারে না।'

'তাহলে আমি খুশি হব।'

হাতে হাত মেলাল সুলতানা, 'চা খাবে? বানাই?'

সুলতানা কিছুতেই ছাড়ল না, মতিনকে সে স্টেশনে পৌঁছে দেবেই। বলল, 'এই রাস্তায় রোজ একা হেঁটে যাই, আজ তোমার সঙ্গে হাঁটতে ভালো লেগেছিল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যখন হেঁটে আসব তখন সেই ভালো লাগাটা নিয়ে ফিরব।'

ছবির মতো রাস্তা। খানিকটা হাঁটার পরে বাঁ-দিকে ঘুরতেই ডানদিকের রেলিং ঘেরা বাগানটার দিকে হাত তুলে সুলতানা বলল, 'ওটা সমাধিক্ষেত্র। কত মানুষ মৃত্যুর পর ওখানকার কবরে শুয়ে আছে। আমার ওখানে যেতে খুব ভয় করে।'

'কেন? ভূতের ভয়ে?'

'না না। গেলেই মনে হয় আমি একদিন এরকম একটা কবরে শুয়ে থাকব। ধীরে ধীরে আমার শরীরের সব নষ্ট হয়ে শুধু হাড়গুলো সেখানে থাকবে। ভাবলেই বুক কীরকম করে ওঠে। তাই যাই না।' সুলতানা বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

মতিন কিছু বলল না। ছেলেবেলায় পড়া কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?' কিন্তু মুখে কিছু বলল না। তার মনে হল একা একা থাকলে হয়তো মানুষের মনে মৃত্যুচিন্তা এসে যায়।

রাস্তা থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে পাতাল-স্টেশনে। সেখানে পৌঁছে মতিন বলল, 'আর নীচে নামতে হবে না।'

সুলতানা হাসল, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে ফোন করো না কেন?'

'করব।'

হঠাৎ মতিনের দুটো হাত নিজের হাতে ধরে সুলতানা বলল, 'এখন থেকে আমরা খুব ভালো বন্ধু হলাম তো?'

মতিন হাসল, 'হ্যাঁ। হলাম।'

ট্রেনে বসে ভাবছিল মতিন। জীবনে এই প্রথম কোনও নারী তাকে চুম্বন করল! সুলতানার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়নি, তার দিক থেকে কোনও দুর্বলতাও নেই, এই অবস্থায় চুমু খেতে তার ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু সে একটুও বিরক্ত হয়নি। উপভোগ যেমন করেনি তেমনি মন্দ ভাবনাও মনে আসেনি। বয়সে তার চেয়ে বড় হলেও সুলতানাকে বন্ধু ভাবতে এখন তার অসুবিধে হচ্ছে না।

দোতলায় উঠে টিয়ার ঘরের দিকে তাকাল মতিন। দরজা বন্ধ। সে নিজের ঘরের দরজা খুলল। বেশ ক্লান্ত লাগছে।

ঘরে ঢুকে জামাপ্যান্ট ছেড়ে সোজা স্নান করতে চলে গেল সে। শরীরে জলের ছোঁয়া লাগামাত্র একটু শীত-শীত অনুভূতি হল যা সকালেও হয়নি। তবে কি শীত চলে আসছে আমেরিকায়।

এক বিন্দু খিদে নেই। শেষ বিকেলে খাওয়ার পর সেটা হওয়াও সম্ভব নয়। শুয়ে পড়ল মতিন। আঃ, কী আরাম! আজ সারাদিনে কত কী ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোনও খবর এসেছে কি না জানা হল না। খবর হলে মুর্শেদভাই জানতে পারবে মামার কাছ থেকে। মুর্শেদভাই-এর ফোন সে পায়নি। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল মতিনের। খবর হলে মুর্শেদভাই নিশ্চয়ই সুলতানাভাবী জানাত। সুলতানাভাবিকে একবার ফোন করবে নাকি! আড়ষ্ট হল মতিন। বন্ধুত্বের প্রথম দিনেই সে দেশে চলে যাওয়ার খবর জানতে চাইছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত হবেন। শ্বাস ফেলল মতিন। তখনই দরজায় শব্দ হল।

'কে?' উঠে বসল মতিন।

সাড়া এল না। বিস্মিত মতিন দরজা খুলতেই দেখল টিয়া দাঁড়িয়ে হাসছে।

'আরে!'

'কখন এলেন?'

'এই একটু আগে। গালিব এখন কেমন আছে?'

'ভালো। কার্টুন দেখছে। এখন তাকে বিরক্ত করা চলবে না।'

'ভেতরে আসবেন না?'

'না। আমি রান্না করছি। চিতল মাছ ভালোবাসেন?'

'খুব।'

'তাহলে আজ রাত্রে আমার ওখানে খাবেন।'

'আজ রাত্রে!' ইতস্তত করল মতিন।

'কোনও অসুবিধে আছে?'

'হ্যাঁ। মানে, আজ প্রায় বিকেলবেলায় ভাত খেয়েছি। পেট একদম ভরতি।'

'ওঃ তা হলে ফ্রিজে রেখে দেব। সকালে যাওয়ার সময় দিয়ে যাব। আপনি খেয়ে নেবেন। আসছি।' টিয়া ফিরে গেল তার ঘরে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মতিন। মোবাইলটা বেশ কিছুক্ষণ বাজতে তার ঘুম ভাঙল। চটজলদি যন্ত্রটাকে অন করে সে 'হ্যালো' বলল।

'তোমার কাছে এটা আশা করিনি মতিন। এটা কী করলে? ছিঃ। মুর্শেদের গলা শুনল সে। জিজ্ঞাসা করল, 'আমি বুঝতে পারছি না—!'

'পারছ না। মিথ্যে কথা তো বলবেই। তুমি আজ আমার বাড়িতে আসোনি? নিশ্চয়ই না বলবে?' মুর্শেদভাই-এর গলা অন্যরকম লাগল মতিনের।

'হ্যাঁ। গিয়েছিলাম। সুলতানাভাবী বলেছিলেন, তাই—।'

'একজন মহিলা একা বাড়িতে আছে জানার পরে কীরকম পুরুষ তার বাড়িতে যায়? ছি ছি। সুলতানার মনে কোনও পাপ নেই, সে সব বলেছে আমাকে।'

'কী বলেছেন ভাবি?'

'সেকথা আমার মুখ দিয়ে শুনতে চাও? আচ্ছা লম্পট তো! আমি কামাল সাহেবকে সব কথা বলছি।' ফোন রেখে দিল মুর্শেদ।

হতভম্ব হয়ে বসে থাকল মতিন। এটা কীরকম হল। সে নিজে ওই বাড়িতে যায়নি। সুলতানাভাবী প্রায় জোর করেই তাকে নিয়ে গিয়েছে। তাকে ভাত খাইয়েছে। তারপর চমু খাওয়ার সময় তার কোনও ভূমিকা ছিল না। অথচ এসব কথা মুর্শেদভাই ফিরতেই তার কানে তুলে দিয়েছে? ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে সুলতানভাবি।

মতিনের খুব ইচ্ছে করছিল সুলতানার সঙ্গে কথা বলতে। তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন সে? বন্ধু বলে হাত মিলিয়ে ছুরি মারল কেন? কিন্তু এখন ফোন করলে মুর্শেদভাই ফোন ধরবে। না ধরলেও তার সামনে কথা বলতে বোধহয় সুলতানাভাবী পারবে না। মামাকে এসব কথা জানাবে বলেছে মুর্শেদভাই। শুনলে মামা নিশ্চয়ই খুশি হবে না। উলটে মাকে জানিয়ে অন্য ধরনের আনন্দ পাবে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক তো খারাপ, আরও খারাপ করবে।

কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। রাত বাড়ছে, কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। মনে হচ্ছিল, এক দৌড়ে যদি এদেশ থেকে সে পালিয়ে যেতে পারত।

মধ্যরাতে ফোনটা বাজল। অবাক হয়ে ওটা অন করতে মতিন টিয়ার গলা শুনতে পেল, 'আপনি কি এখনও জেগে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়েছে। আমার কিচেনের জানালা দিয়ে আপনার ঘরের জানালার আলো দেখতে পেলাম, 'গুড নাইট।'

আলো নিভিয়ে দিল মতিন।

ঘুম ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে। সে ঝটপট উঠে অচেনা নাম্বার দেখতে পেল। ওটা অন করতেই ইংরেজিতে প্রশ্ন শুনল, 'আর ইউ মতিন?'

'হ্যাঁ, ইয়েস!'

'মতিন, তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা-ই হয়ে থাক আমি তাকে একটা ব্যাপারে শ্রদ্ধা করি, তিনি অত্যন্ত সৎচরিত্রের মানুষ। তুমি গতকাল যে কাজটা করেছ তা যদি আমি তাঁকে বলি তিনি প্রথমে বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন, আমি তাঁর ছেলের নামে বানিয়ে বদনাম দিচ্ছি। আর যদি বিশ্বাস করেন তা হলে হার্ট ফেল করবেন। মুর্শেদ আমার খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী। তুমি তার ক্ষতি কেন করেছ—এই প্রশ্ন আমি করব না। কারণ, আমি জানি এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু তুমি এদেশে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতো মুখ করে ঘুরে বেড়াবে তাও আমি চাইনা। সেক্ষেত্রে মুর্শেদ তোমার বাবাকে সব কথা জানিয়ে দেবে।'

মতিন ঢোঁক গিলল, তার মামা কামাল হোসেন কথা বলছেন।

তিনি আবার বললেন, 'এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে তোমার দেশে ফিরে আসা উচিত নয়। তা ছাড়া এসে তুমি তোমার বাবা-মায়ের কী কাজে লাগবে? আমি তোমাকে এসব শোনা সত্ত্বেও

একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। শিকাগোতে আমার ব্যবসার কাজ যে দেখত তার বয়স হয়েছে। আর পারছে না। তুমি তার কাছে চলে যাও। কাজগুলো শিখে নাও। আপাতত তুমি বাইশশো ডলার মাসে পাবে। তা থেকে যতটা পারো বাবা-মা'কে পাঠালে তাদের উপকার হবে।'

'কিন্তু দেশ থেকে ডুপ্লিকেট পাসপোর্টের অর্ডার এসে গেলে—!'

'আসবে না।' গম্ভীর গলায় বললেন কামাল সাহেব।

'তাহলে আমি এখানে থাকব কী করে?'

'ওরা যে কাগজটা দিয়েছে তা রিনিউ করে যাবে। শিকাগো শহরের ইমিগ্রেশন আইন নিউইয়র্কের মতো কড়া নয়। এখন বলো, রাজি আছ কি না?'

'মামা, বিশ্বাস করুন আমি কিছু করিনি।'

'এসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই। যদি রাজি থাকো তাহলে মুর্শেদের সঙ্গে যোগাযোগ কর, সে কীভাবে শিকাগোতে যাবে বলে দেবে।' লাইনটা কেটে দিলেন কামালসাহেব।

মিথ্যে, মিথ্যে, প্রচণ্ড মিথ্যে কিন্তু তাই মামা বিশ্বাস করলেন। মামা নিশ্চয়ই তার ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবেন। আর যদি যায় তাহলে মুর্শেদের কথা শুনলে বাবার কী হবে তা ভাবতেও পারছিল না মতিন।

কিছুক্ষণ পরে সে বাইরে বেরিয়ে দেখল টিয়ার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। এখন এই নিউইয়র্ক শহরে একটাও লোক নেই যার সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

মতিনের কান্না এল। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে।

বেলা বাড়ছিল। স্নান সেরে বাইরে বের হল মতিন। এখন তার কাছে সবই বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে। মামার নির্দেশ না মানলে তিনি যা করবেন তা সে কিছুতেই হতে দিতে চায় না। বাবা তাঁকে সমর্থন করেন না, কালোবাজারি, অর্থপিশাচ অমানুষ হিসেবে মনে করেন। ভাই-এর প্রতি টান থাকলেও মা বাবার বিরোধিতা করতে পারেনি কারণ মানুষটি অত্যন্ত সৎ। সেই মাথা নিশ্চয়ই মুর্শেদভাইকে দিয়ে বাবার সব স্বপ্ন চুরমার করে দেবেন। সে যদি বাবার পা ধরে বলে ওই অভিযোগ মিথ্যে তাহলেও বাবা বিশ্বাস করবেন না। বলবেন, কেউ নিজের স্ত্রীর নামে কলঙ্ক বানিয়ে বলে না।

'আরে ভাই! খবর কী? মনে হয় খুব চিন্তায় আছ!'

ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল মতিন, মুখ ফিরিয়ে দেখল লিটন দাঁড়িয়ে। জিনসের ওপর অনেকরকম কথা লেখা গেঞ্জি ওর পরনে। মতিন বলল, 'না-মানে-, কিছু না।'

'আমাদের দলের দুজনকে আর ওদের দলের সবাইকে পুলিশ ধরেছে। হয়ে গেল। অন্তত এক বছর বিহাইন্ড দ্য বার।' লিটন বলল।

'তোমাকে ধরল না কেন?'

হা-হা করে হাসল লিটন, আমি তখন ব্রুকলিনে গিয়েছিলাম। তাছাড়া পুলিশ আমার নাম জানে ফয়েজুর, লিটন জানে না। ওরা ফয়েজুরকে খোঁজ করেছিল, কেউ বলতে পারেনি সে কে! ভাবছি কিছুদিন নিউইয়র্কের বাইরে গিয়ে থাকব।'

'কোথায় যাবে?'

বুঝতে পারছি না। টেক্সাসে আমার খালাতো ভাই থাকে। ভাইটা ভালো কিন্তু তার বউটা দুদিনের বেশি থাকলে খারাপ ব্যবহার করবে।' লিটন মাথা নাড়ল। বকুল আপার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। ওর অনেক চেনাজানা। যাবে নাকি?'

'কোথায়?'

'বকুল আপার বাসায়। এর আগের দিন তো গেলে না। ভালো লাগবে।'

কিছুই যখন করার নেই তখন যেতে আপত্তি কী!

চারটে ব্লক হেঁটে একটা পুরোনো চেহারার বাড়িতে ঢুকল লিটন, বাড়িটার গঠন ঢাকার বাড়ির মতো। সিঁড়ির দুপাশে ফ্ল্যাটের দরজা। দোতলার একটি দরজার বেল বাজাল লিটন। দরজা খুললেন যিনি তিনি বেশ বৃদ্ধ। দাঁড়াতে অসুবিধে হচ্ছে তাঁর, লিটনকে দেখে বললেন, 'ও।' তারপর কোনওরকমে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে এল?'

লিটন জবাব দিল, 'আমি লিটন, আমরা।'

সোফায় বসতে বলল লিটন। মতিন বসে দেখল ঘরটিতে সোফা ছাড়া কোনও আসবাব নেই, শূন্য দেওয়াল। মিনিটখানেক বাদে যে মহিলা এলেন তাঁর বয়স বোঝা যাচ্ছে না তবে এককালে যে ডানপিটে সুন্দরী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বেশ লম্বা, শরীর ভারী, মুখটি খুব মিষ্টি। এসেই বললেন, 'ওম্মা লিটন যে। এ কে? কী ভালো লাগছে।'

'ওর নাম মতিন। কিছুদিন হল এদেশে এসেছে।'

'বাঃ! চমৎকার। ছাপ আছে না নেই?' মতিনের দিকে তাকালেন তিনি।

মানে বুঝতে পারল না মতিন। ভদ্রমহিলা হেসে গড়িয়ে পড়লেন প্রায়। 'এখন তো কেউ চট করে ভিসা ছাড়া ঢুকতে পারে না। তবে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও অনেকে থেকে যায়। তোমার কী অবস্থা ভাই!'

মতিন সংক্ষেপে তার কাহিনি শোনালে ভদ্রমহিলা গালে আঙুল দিলেন, 'কী সর্বনাশ। তবু মন্দের ভালো যে থাকার পারমিট পেয়েছ।'

লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কিছুদিন বাইরে থাকা দরকার। কোথায় যাই আপা?'

'জাহান্নামে।' বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন বকুল আপা।

'কীভাবে যাব যদি বলে দেন।' লিটন বলল।

'নেকু! লস অ্যাঞ্জেলসে যাও।'

'ওরে ব্বাবা। অত টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে পারব না।'

'তা হলে আটলান্টিক সিটিতে যাও। কবে যাবে?'

'যেদিন বলবেন। আজ বললে আজই। কিন্তু গিয়ে কোথায় উঠব?'

'ইকবালভাইকে ফোন করে দিচ্ছি। সিজার ক্যাসিনোতে রেস্টুরেন্ট আছে। তা ছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া খাটায়। একসময় আমার সঙ্গে প্রেম করত। পুরোনো প্রেমিকরা খুব কথা শোনে। কতদিন থাকবে?' বকুল আপা জিজ্ঞাসা করলেন।

'এখানে হাওয়া ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত, ধরুণ ছয়-সাত মাস।'

'ইকবালভাইকে বলতে হবে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে।' মতিনের দিকে তাকালেন বকুল আপা, 'তুমি এখন কী করছ?'

'কিছু না।'

'কী মজা! এই সুযোগে দেশটাকে দেখে নাও। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখানে এখনও কোনও বান্ধবী হয়নি। তাই তো?'

মাথা নেড়ে না বলে হাসল মতিন। তারপর বলল, 'আমাকে বোধহয় শিকাগোতে যেতে হবে। যতদিন দেশে ফেরার কাগজপত্র না আসে ততদিন ওখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।'

'শিকাগো?' বকুল আপা মাথা নাড়েন, 'খুব ভালো শহর। কী হাওয়া। ওখানে আমার এক বান্ধবী থাকে। স্কুলে পড়ায়। ডিভোর্সি, একমাত্র মেয়েকে নিয়ে থাকে। ওর বাসায় এক্সট্রা ঘর আছে। বললে তোমাকে পিজি রাখতে পারে। দাঁড়াও।' উঠে ভেতরে চলে গেলেন বকুল আপা।

লিটন বলল, 'দেখলে, বকুল আপা কত হেল্পফুল। ভাবছি, আটলান্টিক সিটিতে না গিয়ে

তোমার সঙ্গে শিকাগোতে গেলে কেমন হয়!'

'আটলান্টিক সিটি কত দূরে?'

আড়াই ঘণ্টা লাগে বাসে, ক্যাসিনোর শহর। দিন রাত জুয়া খেলা হয়। আমাদের দেশের অনেক মানুষ ওখানে কাজ করে।'

বকুলআপা ফিরে এসে একটা কাগজ মতিনকে দিলেন, 'নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার লিখে দিলাম। দরকার হলে ফোন করবে। কিন্তু লিটন, আমাকে এখনই বের হতে হবে। আমার কর্তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আজ চেক আপের ডেট।'

লিটন উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মতিন।' জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কি অসুস্থ?'

'এমন কিছু না, বয়সের জন্যে। দেখলে তো, দরজা খুলে দিল।'

হতভম্ব হয়ে গেল মতিন। এই মহিলার অত বৃদ্ধ স্বামী?

বাইরে বেরিয়ে এসে লিটন বলল, 'আচ্ছা চলি। পৃথিবীটা খুব ছোট। নিশ্চয়ই একদিন কোথাও না কোথাও আবার দ্যাখা হয়ে যাবে। হাত মেলাও।'

ওরা হাত মেলাল।

বাড়ির কাছে ফিরে আসতেই ফোন বেজে উঠল। সুলতানাভাবী। খুব রাগ হয়ে গেল মতিনের। প্রথমে ভাবল ফোন অন করবে না, বেজে যাক। কিন্তু ফুটপাথের লোকেরা তার দিকে তাকাচ্ছে রিং শুনে। বাধ্য হয়ে বোতাম টিপল মতিন—'হ্যালো'। 'তুমি কোথায়?' সুলতানার গলায় একটুও জড়তা নেই।

'রাস্তায়।' মতিন বলল।

'কী ছেলেরে বাবা! আমরা তোমার সঙ্গে দ্যাখা করতে এসে দেখি দরজা বন্ধ।'

'আমি আসছি।' ফোন বন্ধ করল মতিন।

সুলতানাভাবী আমরা শব্দটা বলল কেন? তা হলে কি একা আসেনি? মুর্শেদভাই তো ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবেন না। কে এসেছে সঙ্গে?

ঘরের দরজা খুলতে না খুলতে ওরা এসে গেল। নিশ্চয়ই ফুটপাথের কোথাও অপেক্ষা করছিল। মতিনকে ঢুকতে দেখে অনুসরণ করেছে। মতিন শ্বাস ফেলল, সুলতানাভাবীর সঙ্গে মুর্শেদভাই এসেছে।

ভেতরে ঢুকে সুলতানাভাবী হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি দেখছি এরমধ্যে নিউইয়র্ক শহরটা ভালো চিনে নিয়েছ। ভাবলাম ফোন না করে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেব, উলটে নিজেরাই বোকা বনে গেলাম।'

এত স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন মহিলা যে মতিন ঠিক বুঝতে পারছিল না। মুর্শেদভাই অন্যদিনের মতো শান্ত। যেন কিছুই হয়নি।

মতিন বলল, 'বলুন।'

মুর্শেদ বলল, 'সাহেব চাইছেন তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে। দেশে ফেরার কাগজপত্র যতদিন না আসে ততদিন এখানে না বসে থেকে শিকাগোতে গিয়ে কাজটা করতে। তা ছাড়া এখানে থাকার সময় তো শেষ হয়ে আসছে। যদি আজই শিকাগোতে চলে যাও তো ভালো হয়। অবশ্য তুমি যাবে কিনা তা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

'এ কথা মামা বলেছেন?'

'হ্যাঁ, যদি যাও তা হলে মাসে বাইশশো টাকা মাইনে পাবে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। যদি রাজি না হও তাহলে কথামতো দু'দিন পরে এই ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজের

ব্যবস্থা করে নেবে। তোমার ফেরার টিকিটটা আমি ওপেন করে রেখেছি। কাগজ পেলে টিকিট কনফার্ম করে নিও।' মুর্শেদ বলল।

সুলতানা বলল, 'কী হবে দেশে গিয়ে। শিকাগো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তুমি কাজটা নিয়ে নাও।'

মতিন খানিক্ষণ ভাবল। ওরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী করা যায়? এই ঘর ছেড়ে দিয়ে থাকবে কোথায়? টিয়াকে বলা যায় কিন্তু ওরও তো অসুবিধে থাকতে পারে। ক'দিন পরে যখন হাত খালি হয়ে যাবে তখন কী করবে?

আচমকা মতিন মরিয়া হল, 'মুর্শেদভাই, আমি কোনও দোষ করিনি। সুলতানাভাবী, আপনি বলুন, আমি কি কিছু করেছি?'

সুলতানা বলল, 'আরে! একথা বলছ কেন? কে বলেছে তুমি দোষ করেছ?'

মুর্শেদ বলল, 'এই প্রসঙ্গ থাক মতিন।'

'এই অভিযোগের জন্যেই তো আমার এমন অবস্থা।' মতিন বলল।

সুলতানা অবাক হয়ে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কে অভিযোগ করেছে?' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিছু জানো?'

'না। আমার বস্ যা বলতে বলেছেন তাই বলছি। কী করতে চাও মতিন?'

'বেশ, মামা যখন চাইছেন তখন আমি শিকাগোতেই যাব।'

'বাঃ! এই তো, খুব ভালো হল।' হেসে উঠল সুলতানাভাবী।

মুর্শেদ পকেট থেকে একটা খাম বের করল, 'এর মধ্যে বাস ভাড়া, কিছু অ্যাডভান্স, যার সঙ্গে দ্যাখা করবে তার ঠিকানা রয়েছে। আমি টেলিফোনে তাঁকে বলে দেব, তুমি ট্রেন ধরে পোর্ট অফ অথরিটিতে চলে যাবে। রাত্রে ওখান থেকে শিকাগোর বাস ধরলে কাল সকালে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা, আমরা চলি।'

ওরা উঠল। সুলতানাভাবী বলল, 'ভালোই হল। এখন থেকে ছুটি পেলে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া যাবে।'

দরজার কাছে গিয়ে মুর্শেদ বলল, 'ওহো। সুলতানা, তোমার মোবাইলটা ফেরত নিয়ে নাও। আর হ্যাঁ, চাবিটা নীচের গ্রোসারি শপে দিয়ে যেও, পরে নিয়ে নেব।'

'ওটা যে আমি ওকে দিয়েছি।' সুলতানা প্রতিবাদ করল।

'দিয়েছিলে। তখন ওর কেনার ক্ষমতা ছিল না। এখন ও ভালো মাইনে পাবে। মোবাইল কিনতে অসুবিধে হবে না।' মুর্শেদ বলল।

'না-না।' মাথা নাড়লেন সুলতানাভাবী।

মতিন এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে মোবাইলটা দিয়ে বলল, 'উনি ঠিক বলেছেন?'

মাথা নীচু করে যন্ত্রটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুলতানা।

জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মতিন। স্বাভাবিক রাস্তা। সুলতানাদের দেখতে পেল না। হঠাৎ মনে হল, সুলতানার ফোন নাম্বার তার মুখস্থ নেই, তার নিজেরও কোনও নাম্বার নেই। তাই ইচ্ছে করলেও যোগাযোগ করা যাবে না। মুর্শেদভাই নিশ্চয়ই স্ত্রীকে তার ঠিকানা জানাবে না।

কিন্তু সুলতানাভাবীর ব্যবহার, কথাবার্তা শুনে মনেই হয়নি এইসব ঘটনার কথা তার জানা। সরল গলায় স্বামীকে সব বলেছিল বোধহয়। স্ত্রীকে একটা কথাও না বলে মুর্শেদভাই কামাল হোসেনকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। তাই সুলতানাভাবী অন্ধকারেই থেকে গেছেন। স্ত্রীর ওপর রাগ এইভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে মিটিয়ে নিলেন মুর্শেদভাই।

বিকেল শেষে ব্যাগ নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে যখন বের হচ্ছে তখন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে

এল টিয়া। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একী কোথায় যাচ্ছেন?'

'শিকাগোতে।'

'হঠাৎ?'

'একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।'

'বাঃ! আমাকে ফোন করবেন কিন্তু।'

'আমার মোবাইল নেই, হারিয়ে গিয়েছে।'

'সে কী!' চট করে ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে নিজের নাম্বার লিখে দিল টিয়া। বলল, 'আপনি যোগাযোগ রাখলে খুব খুশি হব। আপনার মতো মানুষের দ্যাখা আমি এই প্রথম পেয়েছি। ঠোঁট কামড়ে টিয়া চলে গেল নিজের ঘরের তালা খুলতে।

বিষণ্ণ বিকেলে ব্যাগ হাতে জ্যাকসন হাইটের ফুটপাথ ধরে স্টেশনের দিকে হাঁটছিল মতিন। ট্রেনে করে পোর্ট অথরিটির বাস টার্মিনাল, তারপর নতুন জীবনে।

গ্রেহাউন্ড বাসে চেপে একা একা যাওয়ার কথা দু'সপ্তাহ আগেও কল্পনা করেনি মতিন। করলে তখন দিশেহারা হয়ে যেত। আজ মনে হল, পরিস্থিতি মানুষকে কী করাতে পারে তা আগাম জানা যায় না। বিশাল পোর্ট অথরিটির বিভিন্ন দরজা থেকে গ্রেহাউন্ড বাস ছাড়ছে প্রতি আধঘণ্টায় এক এক শহরের উদ্দেশ্যে। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে নাজেহাল হয়ে শেষপর্যন্ত এক বৃদ্ধ কালো মানুষের সাহায্যে সে সঠিক কাউন্টারে পৌঁছোতে পেরেছিল। টিকিট কাটলেই বাসে জায়গা পাওয়া যাবে না। লাইন দিতে হবে। সিট ভরতি হয়ে গেলে পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

রাত দশটার বাসে উঠতে পেরেছিল মতিন। নরম আসন, শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাস, একটুও ঝাঁকুনি নেই। তার পাশে বসে একটি সাদা যুবক কানে তার ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে পেছনে হেলান দিয়ে সেই যে গান শোনা শুরু করেছিল, গোটা পথে আর খোলেনি। নিউইয়র্ক শহরের ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে যখন বাস হাইওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মতিন।

সকাল সাড়ে আটটায় শিকাগো শহরের গ্রেহাউন্ড টার্মিনাসে বাস যখন স্থির হয়ে গেল তখন যাত্রীরা নামছে দেখে মতিনও নামল। বাসের পেট থেকে যাত্রীদের মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। নিজেরটা চিনতে পেরে তুলে নিল সে। তারপর সুনসান রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার পকেটে এখন তিনটে কাগজ। একটায় মুর্শেদভাই-রে লেখা নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার। দ্বিতীয়টা বকুলআপার লেখা ঠিকানা ফোন নাম্বার, তৃতীয়টা টিয়ার ফোন নাম্বার। তিনটে কাগজই তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। সে মুর্শেদের কাগজটা বের করল। চৌত্রিশের একের বি মিডো রিজ ড্রাইভ ওয়েস্ট, ন্যাপের ভিল। জায়গাটা কতদূরে এবং কীভাবে যাবে বুঝতে পারছিল না সে। মুর্শেদভাই যে ডলার দিয়েছে তা থেকে ট্যাক্সি ভাড়া অবশ্যই দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা যদি অনেক হয় তা হলে খরচ করা কি উচিত হবে? কিন্তু মতিন দেখল ধারে কাছে কেউ নেই। যারা বাস থেকে নেমেছিল তারা সবাই চলে গিয়েছে।

এইসময় একটা গাড়ি এসে খানিকটা দূরে দাঁড়াল। যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি নেমে দাঁড়াতেই মতিন বুঝতে পারল ওই লোকটি বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তান অথবা শ্রীলঙ্কার। বেশ বৃদ্ধ, সে এগিয়ে গিয়ে ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করল, 'মাফ করবেন, আমি এখানে নতুন, মিডো রিজ ড্রাইভ ওয়েস্ট নামের রাস্তায় কীভাবে যেতে পারি? যদি একটু বলে দেন—।'

'আমি ওখানেই ফিরে যাব। একটু অপেক্ষা করুন।' বৃদ্ধ বাংলায় বললেন।

'আপনি বাঙালি?' অবাক হল মতিন।

'হান্ড্রেন্ড পারশেন্ট। যদিও চল্লিশ বছর এই শহরে আছি।'

তারপর কিছুটা সময় চলে গেল। ভদ্রলোক এপাশ-ওপাশে তাকাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন শহর থেকে আসছেন?'

'নিউইয়র্ক।'

'ও, নিউইয়র্কের বাসটা পৌঁছে গেছে। আপনার নাম কী?'

'মতিন।'

'আই সি। আমার নাম আজাদ। মনে হচ্ছে আপনি আমার কাছেই এসেছেন। মুর্শেদ বলল আপনি রাত্রের গ্রেহাউন্ডে আসছেন। ভাবলাম, প্রথম দিন, আপনাকে রিসিভ করি। আপনি আসায় খুব খুশি হলাম।' হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্যে। মতিন পুলকিত।

হাত মিলিয়ে বলল, 'উঃ, আপনি আমার খুব উপকার করলেন। কীভাবে যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষপর্যন্ত ট্যাক্সি নিতে হত।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। চলুন। আপনার সঙ্গে এটা ছাড়া আর মালপত্র নেই?'

'না।' মতিন বলল, 'আপনি আমাকে তুমি বলুন।'

গাড়িতে বসে মতিন দেখল বৃদ্ধ খুব সতর্ক হয়ে চালাচ্ছেন। কিছুতেই স্পিড বাড়াচ্ছেন না। অন্য গাড়িগুলো ওভারটেক করে চলে যাচ্ছে।

আজাদ বললেন, 'যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমি আর পারছিলাম না। মনে করছি মাসখানেক লাগবে আপনাকে কাজগুলো বোঝাতে। তারপর আমার ছুটি। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছেলের কাছে চলে যাওয়ার। সে থাকে কানাডার টরেন্টো শহরে। আমার ইচ্ছে দেশে গিয়ে থাকার। দ্যাখা যাক।'

ভালো লাগল মতিনের। চল্লিশ বছর এদেশে থাকার পরেও বৃদ্ধ দেশে ফেরার কথা ভাবছেন! সে মনে মনে গাইল, 'ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত শহর জেগে উঠল। এখন গাড়িতে বসেও শীত-শীত করছিল মতিনের, বাসের নিয়ন্ত্রিত উত্তাপ থেকে বেরিয়ে এসে সে বুঝতে পারেনি কিন্তু হাওয়া বইতে শুরু হওয়ার পরেই অনুভব করছিল চিনচিনে ঠান্ডা চামড়ায় লাগছে। বৃদ্ধ আজাদের পরণে হাফ সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট। বুড়ো মানুষ বলেই অতিরিক্ত সতর্কতা।

এখন তারা শহরের মধ্যে। দুপাশে বড় বড় বাড়ি। রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ছে। যদিও ফুটপাথে খুব কম মানুষ দ্যাখা যাচ্ছে। একটা বাড়ির গায়ে লাগানো পার্কিং প্লেসে গাড়ি দাঁড় করালেন আজাদ। বললেন, 'নেমে এসো।'

ব্যাগ নিয়ে বৃদ্ধকে অনুসরণ করে বাড়িটির দোতলায় উঠল মতিন। চারটে দরজা। একটা দরজার ওপর বোর্ড ঝুলছে, 'কে হোসেন অ্যান্ড কো।'

বেল বাজালে দরজাটা খুলল যে তার বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। কালো মানুষ, বলল, 'গুড মর্নিং, স্যার।'

আজাদ বললেন, 'গুড মর্নিং। মিট ইওর নিউ বস, মিস্টার মতিন। হি ইজ এ ক্লোজ রিলেটিভ অফ আওয়ার নাম্বার ওয়ান। মতিন, এর নাম জন। আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড। অফিসের কাজ করার জন্যে একটি মেয়ে আছে। জন, কল জুলিয়া। জুলিয়া ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান।'

জন বলল, 'শী কলড ফাইভ মিনিটস বিফোর। আই থিংক শী ইজ অন দ্য ওয়ে।' জন এগিয়ে এসে হাত বাড়াল মতিনের দিকে, 'ওয়েলকাম স্যার। আই উইল বি অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

কী বলবে বুঝতে না পেরে মতিন বল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আজাদ অফিসঘর ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘর বলতে, আজাদের চেম্বার এবং জুলিয়ার কাজ করার জায়গা। জনের জন্যেও টেবিল আছে। আজাদ বললেন, 'তুমি এই একমাস আমার

সঙ্গেই চেম্বার শেয়ার করবে। আমি চলে গেলে ওটা তোমার। আর হ্যাঁ, চেম্বারের ভেতরে আর একটা ছোট ঘর আছে। দেখে যাও।'

মতিন দেখল, সেই ঘরে একটা ডিভান পাতা। পাশে অ্যাটাচড বাথ।

আজাদ বললেন, 'সারারাত জার্নি করে এসেছ। স্নান করে বিশ্রাম নাও। কী খেতে চাও বললে জন এনে দেবে। ওই ঘরে বেশিদিন তো থাকতে পারবে না, খুব তাড়াতাড়ি একটা ভালো থাকার জায়গা খুঁজে নাও।'

মতিন বলল, 'আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না।'

'চেনার দরকার নেই। নেটে গেলেই অনেক রুমরেন্টের খবর, পিজির বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে। জুলিয়াকে বললে সে প্রিন্ট আউট দেখিয়ে দেবে।' আজাদ বললেন।

আধঘণ্টার মধ্যে স্নান সেরে জনের এনে দেওয়া চিকেন বার্গার খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। ডিভানটা লম্বায় তার শরীরের সমান। পা গুটিয়ে রাখতে হচ্ছিল। বাথরুমে গরম-ঠান্ডা জল আছে, না হলে স্নান করা যেত না। সে ব্যাগ থেকে একটা চাদর বের করে শরীরে জড়িয়ে নিল শোওয়ার সময়। কিন্তু রাত্রে একটা কম্বল না হলে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু মতিন ঠিক বুঝতে পারছিল না, আজাদ তাকে সরাসরি এখানে এনে তুললেন কেন? উনি যেখানে থাকেন সেখানে কি একটাই ঘর? চল্লিশ বছর ধরে কেউ একটা ঘরে থাকতে পারে না। ওঁর মাইনে নিশ্চয়ই অনেক বেশি, গাড়িও চালাচ্ছেন, কিন্তু মালিকের ভাগনে হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন না। সেখানে সে অনেক আরামে থাকতে পারত। ওঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই ভাত ডাল ভর্তা রান্না করেন। সুলতানাভাবি বা টিয়া তাকে যত্ন করে খাইয়েছে। ওঁর স্ত্রী কি সেটা করতে চাননি? না কি, তাঁর ওপর নির্দেশ আছে বলে আজাদ তাকে বাসায় নিয়ে গেলেন না। মতিনের মনে হল এইটেই সত্যি। মামা না জানতে পারে, কিন্তু মুর্শেদভাই নির্দেশ পাঠাতে পারে। মুর্শেদভাই চাইবে তাকে অনেকরকম ভাবে জব্দ করতে। শ্বাস ফেলল মতিন। কী কাজ তাকে করতে হবে এখানে তা সে জানে না। যে কাজই হোক, খুব দ্রুত শিখে নিতে হবে।

এইঘরে বাইরের আলো ঢোকে না। তাই ঘুম ভাঙার পরেও সময় বুঝতে পারল না মতিন। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আজাদের চেম্বারে পা দিয়ে দেখল তিনি নেই। বাইরের হলে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল একজন মহিলা কম্প্যুটারে কাজ করছে। ওপাশ থেকে জনের গলা ভেসে এল, 'গুড আফটারনুন স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা মুখ ঘোরাল। শ্যামলা গায়ের রং কিন্তু মুখটা মিষ্টি। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন স্যার। আই অ্যাম জুলিয়া।'

মাথা নাড়ল মতিন, বলল, 'প্লিজ সিট ডাউন।'

জুলিয়া বসলে সে মনে মনে অনুবাদ করে বলল, 'মাই নেম ইজ মতিন। সো, প্লিজ কল মি মতিন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ।' বেশ জোরে হাসতে হাসতে বলল, 'জন!'

'হোয়ার ইজ মিস্টার আজাদ?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'হি লেফট।' জুলিয়া একটা খাম নিয়ে এগিয়ে এল, 'দিজ ইজ ফর ইউ। মিস্টার আজাদ টোল্ড মি টু গিভ ইউ। ইট কেম থ্রু মেইল।'

মতিন খামটা খুলে প্রিন্ট আউট বের করল। তার নাম লেখা, ইউ আর হিয়ার বাই অ্যাপয়েন্টেড...। তার এই চাকরির অফিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। জুলিয়া দাঁড়িয়েছিল, মতিন বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ডু ইউ নিড দি লিস্ট অফ পিজি অর রুমরেন্ট লিস্ট রাইট নাউ?'

জুলিয়ার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল মতিন। এবং তখনই তার মনে পড়ল বকুলআপার কথা।

বকুলআপা তার এক পরিচিত শিক্ষিকার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন যোগাযোগ করতে। সে মাথা নাড়ল, 'নো, নট টুডে।'

জুলিয়া বলল, 'মিস্টার আজাদ বলেছেন কোম্পানির ব্যবসার ব্যাপারটা আপনাকে একটু ব্রিফ করে দিতে। আপনি কি এখন শুনতে চান?'

'বেশ, বলুন!'

'আপনি কি চেম্বারে বসবেন?'

'না। এখানেই বসা যাক।' জুলিয়ার চেয়ারের পাশের চেয়ারে বসল মতিন। জন কাছে এসে বলল, 'মিস্টার মতিন, একটু চা বা কফি বানাই?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'চা।'

প্রায় আধঘণ্টা ধরে জুলিয়া তাকে বোঝাল। শিকাগো শহরের যত 'মল' আছে, সেগুলোতে বটেই, ওদিকে ওহাহিও কলম্বাস পর্যন্ত প্রায় তিনশো কিলোমিটারের মধ্যে সব শহরের বড় দোকানগুলোতে জামা-প্যান্ট, স্কার্ট সাপ্লাই দেওয়া এবং অর্ডার ও পেমেন্ট নেওয়ার কাজ এই অফিসকে করতে হয়। এই জন্যে শহরের উপকণ্ঠে একটা গোডাউন ভাড়া নেওয়া হয়েছে। স্টক কমে এলে বা নতুন কিছুর অর্ডার পেলেই ঢাকায় জানিয়ে দিতে হয়। ইমার্জেন্সি থাকলে ফ্লাইটে মাল আসে, না হলে জাহাজে। পেমেন্ট পেলে তা নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। মিস্টার কামাল হোসেনের ঢাকার কোম্পানি সব মনিটারিং করে। মাঝে-মাঝে নিউইয়র্কের মিস্টার মুর্শেদের সাহায্য দরকার হয়। এই মুহূর্তে কত পেমেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং আছে, কত স্টক গোডাউনে আছে তার লিস্ট কম্প্যুটার থেকে বের করে মতিনকে দেখাল জুলিয়া। বলল, 'মিস্টার আজাদ রিটায়ার করার আগে আপনাকে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে একে একে আলাপ করিয়ে দেবেন।'

ক্লায়েন্টের লিস্টটা নিয়ে কার কাছে কত পাওনা আছে খুঁটিয়ে দেখল মতিন। মেসির নামে এক মল-এর কাছে এই মুহূর্তে বাইশ হাজার ডলার পাওনা আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কতদিন ধরে বাকি আছে?'

'দুই মাস ওরা পেমেন্ট দিতে পারেনি। এ সপ্তাহে কিছু দেবে।'

'এর মধ্যে ওরা অর্ডার দিয়ে মাল নিয়েছে?'

'মিস্টার আজাদ বলেন এটা রোটেশনের ব্যাপার। মাল না দিলে আগের আউটস্ট্যান্ডিং পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে।'

'অন্যান্য শহরগুলোতেও কিছু কিছু আউটস্ট্যান্ডিং পড়ে আছে দেখছি।'

'সাধারণত মেইল বা টেলিফোনে তাগাদা দিতে হয় বলে—!' কথা শেষ করল না জুলিয়া।

বিকেল পাঁচটায় ওরা চলে গেল। যাওয়ার আগে জন বলল, 'মিস্টার মতিন, আপনি রাত্রে যা খাবেন তা এনে দিয়ে যাব?'

'কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট নেই?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'এক ব্লক দূরে আছে। কিন্তু সন্ধের মধ্যে খেয়ে আসাই ভালো।'

'কেন?'

'রাস্তায় কোনও লোক থাকে না আর রাত্রে শিকাগো শহরের সুনাম নেই।'

জুলিয়া শুনছিল। বলল, 'আপনাকে পিজা হাটের নাম্বার লিখে দিচ্ছি। ফোন করলে ওরা দিয়ে যাবে। সন্ধের পরে আপনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। নাম্বারটা লিখে দিয়ে গেল জুলিয়া।

দরজা বন্ধ করে চেম্বারে গিয়ে মিস্টার আজাদের চেয়ারে বসল সে। ডান দিকের ড্রয়ারটা টানতেই টুকটাক অনেক কিছুর সঙ্গে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার দেখতে পেয়ে অবাক হল। মিস্টার আজাদকে আজ একবারও ধূমপান করতে দ্যাখেনি সে। সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়েও খেতে ইচ্ছে করল না মতিনের।

শেষপর্যন্ত সে নিজেই ফোনটা করল। আমেরিকায় ফোন নাম্বার দশ সংখ্যার। কাগজটা দেখে দেখে নাম্বার টিপতেই রিং শুনতে পেল। তারপর মহিলা কণ্ঠে শুনতে পেল, হ্যালো!'

মতিন ঢোঁক গিলে বলল, 'বকুলআপা এই নাম্বার আমাকে দিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বকুল আমাকে ফোনে বলেছে। আপনার নাম কী যেন—!'

'মতিন।'

'হ্যাঁ। আপনি এখন কোথায়?'

'শিকাগোয়।'

'চলে এসেছেন? কোথায় উঠেছেন?'

'অফিসে।'

'অফিস? সেকি! কোন রাস্তায়?'

'রাস্তা? একটু দাঁড়ান।' টেবিলের একপাশে রাখা কোম্পানির নাম ঠিকানা লেখা খাম তুলে নিয়ে ঠিকানাটা বলল মতিন।

'বুঝতে পেরেছি। ওখানেই থাকবেন? বকুল অবশ্য অন্য কথা বলছিল।'

'না না। এখানে ক'দিন থাকা যায়! আমি ঘর খুঁজছি। নেট থেকে একটা লিস্ট অবশ্য বের করেছি।' মতিন বলল।

'ঘর আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু রান্না করে খেতে পারবেন তো?'

'সেটা একটু সমস্যার হবে। চেষ্টা করব। তবে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে পারলে সুবিধে হত। আপনার কাছে সেরকম খবর থাকলে-পরে ফোন করে করে জেনে নেব।' মতিন বলল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। বকুল আমাকে বলেছে যদি আমার এখানে আপনাকে পিজি হিসেবে রাখতে পারি তা হলে ভালো হয়। এখান থেকে আপনার অফিস বেশি দূরে নয়। আপনি এসে দেখে যান, পছন্দ হলে কোনও অসুবিধে নেই। আমি সাধারণত বাড়িতে পিজি রাখি না। কোন মানুষ কীরকম হবে, তারপর বিপদে পড়ব। কিন্তু বকুল একসময় আমার খুব উপকার করেছিল। তাই ভরসা পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। তা হলে খুব ভালো হয়।'

'আপনি এখন কী করছেন?'

'কিছু না। একা বসে আছি।'

'আপনি টেলিফোনের পাশে থাকুন, আমি পনের মিনিটের মধ্যে আসছি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে কাগজটা আর একবার দেখল মতিন। মহিলার নাম রুকসানা। কথাবার্তায় খুব আন্তরিক এবং ভদ্র। নিশ্চয়ই সামনা সামনি এসে কথা বলতে চাইছেন।

মিনিট কুড়ি পরে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই শুনল, 'নীচে নেমে আসুন, আমি আপনার অফিসের নীচে গাড়িতে আছি।'

তাড়াতাড়ি উঠে চারপাশে তাকিয়ে দরজার চাবি দেখতে পেল না মতিন। কী করবে এখন? দরজা খোলা রেখে যাওয়া অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তার ধড়ে প্রাণ এল। জন যেখানে বসে তার পাশের টেবিলে পাওয়া গেল দুটো চাবি। দরজার চাবির গর্তে দুবার খোলা বন্ধ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নীচে নামল মতিন। একটাই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সালোয়ার কামিজ পরা মধ্যবয়সি মহিলা তাকে দেখে হাসলেন, আপনি মতিন তো?'

'হ্যাঁ।'

'উঠে পড়ুন। আমার নাম নিশ্চয়ই বকুল বলেছে। আমি রুকসানা। উঠুন। হাসলেন মহিলা! বেল্টটা বেঁধে নিন।'

এখন সন্ধে নেমেছে। নিউইয়র্কের মতো শিকাগোর রাস্তায় গাড়ির ভিড় যেমন নেই তেমনি

ফুটপাথেও বোধহয় মানুষ হাঁটে না। কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় বাড়ির ভিড় ছাড়িয়ে এল গাড়ি। এবার হাইওয়ে। পাশাপাশি অনেকগুলো গাড়ি এক মুখে ছুটছে। উলটোদিকে গাড়িগুলো রাস্তার অন্যপ্রান্ত দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এরকম বড় রাস্তা নেই। হঠাৎ একজিট লেখা বোর্ডের পাশ দিয়ে রুকসানা হাইওয়ে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। একটু পরেই মতিন ছবির মতো রাস্তা আর তার দুপাশে সুন্দর দোতলা বাড়ি দেখতে পেল। বাড়িগুলো বেশ ছাড়া ছাড়া। কোনও বাড়িই ইটের নয়। কাঠের গায়ে চমৎকার রং করা। এরকম একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রুকসানা বললেন, 'এইখানে আমরা থাকি। আসুন।'

চাবি ঘুরিয়ে গা-তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। মতিন দেখল সন্ধে হয়ে গেলেও চারধারে হালকা আলো ছড়িয়ে আছে। কীরকম মায়াবী দেখাচ্ছে চারধার।

নীচেই বসার ঘর। বাঁ-দিক দিয়ে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে।

রুকসানা বললেন, 'চলুন বাড়িটাকে দেখবেন।'

দোতলায় তিনটে শোওয়ার ঘর, ডাইনিং রুম কাম কিচেন। প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া বাথরুম টয়লেট, নীচে বসার ঘর ছাড়া আর একটি গেস্টরুম, বাথরুম, লাইব্রেরি রয়েছে। রুকসানা গেস্টরুমে ঢুকে বললেন, 'যদি ইচ্ছে করেন তা হলে আপনি এইঘরে থাকতে পারেন। আসুন ডেকে যাই।'

পেছনের দরজা খুলে রুকসানা একটা মাঝারি কাঠের ডেকে পা রাখলেন। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে এই ডেক। কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার আর টেবিল রয়েছে সেখানে। ডেকের সামনে অনেকটা বাগান। সেখানে প্রচুর সবজি এবং ফলের গাছ। লঙ্কা লালচে হয়ে গাছে ঝুলছে।

মতিন বলল, 'বাঃ, সুন্দর। এদেশে এরকম বাড়ি আছে তা প্রথম দেখলাম।'

'এ পাড়ায় সব বাড়ির পেছনেই জায়গা আছে। যার শখ আছে সে বাগান তৈরি করে। বসুন এখানে।' চেয়ার এগিয়ে দিলেন রুকসানা।'

ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রুকসানা বললেন, 'কী নেবেন? চা না কফি?'

'চা। কিন্তু সেটা আপনাকেই করতে হবে?'

'হ্যাঁ ভাই। এখানে সব কিছু আমাদেরই করতে হয়। ঘর পরিষ্কার, রান্না, কাপড় কাচা থেকে সব। কাজের লোক রাখতে হলে বিশাল বড়লোক হতে হয়।' রুকসানা বললেন, 'এবার বলুন, বাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'খুউব। কিন্তু এখান থেকে অফিসে যাব কী করে?'

'কোনও সমস্যা নেই। দু-মিনিট হাঁটলেই একটা মোড় দেখতে পাবেন। সেখানে বাস দাঁড়ায়। উঠলে আপনার অফিসের সামনে নামতে পারবেন। তবে এখানে বাসের টাইমিং অদ্ভুত। সকাল ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত কুড়ি মিনিট পরপর বাস পাবেন। দশটার পর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ঘণ্টায় একবার বাস যায়। তারপর আবার রাত দশটা পর্যন্ত কুড়িমিনিট বাদে যায়। আপনাকে নিশ্চয়ই সকালে যেতে হবে। কোনও সমস্যা নেই।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে রুকসানা যখন কাপ-প্লেট তুলতে যাচ্ছেন তখন মতিন বলল, 'আমারটা আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'

'থাক। প্রথমদিনে এটা করতে হবে না।' রুকসানা ওগুলো নিয়ে চলে গেল।

বাড়ি, পরিবেশ খুব ভালো লাগছিল। মহিলার ব্যবহারও। কিন্তু এখানে থাকতে হলে কত ডলার দিতে হবে ভদ্রমহিলা এখনও বলেননি।

একটু পরে রুকসানা একটা ট্রে-তে কিছু স্ন্যাক্স আর কেক নিয়ে এলেন। খোলা ডেকে বসে কেকে কামড় দিয়ে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না, এখানে থাকতে হলে আমাকে কত দিতে হবে?'

'সেটা এখনই না বললে নয়?' ভদ্রমহিলা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

'আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে এখানে থাকতে কিন্তু সাধ্যে যদি না কুলায়!'

'আপনি যদি সাড়ে সাতশো টাকা দেন তা হলে কি খুব অসুবিধে হবে?'

মতিন চট করে হিসেব করে নিল। বাইশশো থেকে সাড়ে সাতশো গেলে চোদ্দোশো পঞ্চাশ থাকবে। অনেক টাকা।

সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। কিন্তু সামনের মাসের মাইনে পাওয়ার পর দিতে পারব। তাতে কি অসুবিধে হবে?'

'আপনাকে যখন বকুল পাঠিয়েছে তখন বলব, ঠিক আছে। আপনি বসুন। রাত্রের খাওয়া খেয়ে যাবেন।' রুকসানা চলে গেল।

মতিন বাগানে নামল। এখানে অন্ধকার কখন হয়? সে গাছপালা দেখতে দেখতে খিড়কি দরজার কাছে যেতেই মোটরবাইকের আওয়াজ শুনতে পেল। বাইকটা বাড়ির পাশে থামতেই একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'শিট্! নেভার শো ইওর ফেস। ডার্টি পিগ!' যাকে বলা হল সে বাইক ছুটিয়ে চলে গেল।

কথাগুলোর মানে স্পষ্ট হয়নি মতিনের কাছে। এদের উচ্চারণ বোঝা মুশকিল। মেয়েটিকেও দেখতে পায়নি সে কাঠের বেড়ার এপাশে থাকায়। সে যখন ডেকের দিকে ফিরে আসছে তখনই একটি মেয়ে ভেতর থেকে ডেকের ওপরে এসে দাঁড়াল, পেছনে রুকসানা, 'ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না।'

মেয়েটি কাঁধ নাচাল, 'বাট হোয়াই? কেন পিজি রাখছ?'

'তুমি বুঝবে না।' রুকসানা বলল।

'হাউ মাচ হি ইজ গোয়িং টু পে?'

'আঃ। এসব কথা বোলো না। বকুল আন্টির রিকোয়েস্টে ওকে এই বাড়িতে থাকতে বলেছি।'

'ও মাই গড! অ্যাবসোলিউটলি ফ্রি?'

'না।'

মেয়েটি এগিয়ে এল দু-পা, 'হাই।'

মতিন তাকাল। রুকসানা বললেন, 'ও আমার মেয়ে। রোজি। এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে।'

মতিন ধীরে ধীরে ডেকের ওপরে উঠে এল। তাকে আপাদমস্তক দেখে শব্দ করে হেসে উঠল, 'মাম, হি সিমস্ টু বি এ পিওর বাংলাদেশি।'

রুকসানা বললেন, 'নিশ্চয়ই। সেইজন্যে ওকে রেসপেক্ট করা উচিত। বাংলাদেশের মানুষের তো বাংলাদেশি হওয়াই উচিত। তোমার মতো হওয়া সম্মানের নয়।'

'আই অ্যাম নট এ বাংলাদেশি। আই অ্যাম আমেরিকান।'

'আমি তর্ক করতে পারছি না।' রুকসানা ভেতরে চলে গেলেন।

রোজি এবার বাংলায় বলল, 'তাহলে আমাকে রোজ তোমার মুখ দেখতে হবে।'

খুব রাগ হয়ে গেল মতিনের, 'চোখ বন্ধ করে থাকলে দেখতে হবে না।'

'ওয়াও! তুমি কথা বলতে পারো? আমার বাড়িতে আমিই চোখ বন্ধ করে থাকব?'

'খারাপ লাগলে তো অন্য কোনও উপায় নেই!'

'কী করো তুমি?'

'চাকরি।'

'কতদিন এসেছ এদেশে?'

'প্রায় দুই সপ্তাহ।'

'ওইসব জামাপ্যান্ট দেশ থেকে কিনেছ?'

'হ্যাঁ।'

হাসল রোজি, 'গার্ল ফ্রেন্ড আছে?'

হঠাৎ কী মনে হল, মতিন বলল, 'হ্যাঁ। অনেক।'

'সেই মেয়েগুলো মনে হয় অন্ধ।' বলে চলে গেল রোজি বাড়ির ভেতরে। মেয়েটির শরীরের কোথাও বাংলাদেশ নেই। না পোশাকে, না ভঙ্গিতে। রুকসানাকে দেখলে সেটা মনে হয় না। মেয়েকে তিনি এরকম হতে দিয়েছেন কেন?

ডেকের চেয়ারে বসল মতিন। বোঝাই যাচ্ছে রোজি তাকে অত্যন্ত অপছন্দ করছে। এই অবস্থায় এখানে থাকা কতটা স্বস্তির হবে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সে মনে মনে বকুল আপার কাছে কৃতজ্ঞ হল। লিটন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কয়েক মিনিটের আলাপ, তাতেই ভদ্রমহিলা সুপারিশ করেছেন। অথচ লিটনের ভাবভঙ্গি দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল মহিলা বাড়িতে খারাপ আড্ডা বসান।

রাত্রের খাওয়া ন'টার আগেই খাওয়া হয়ে গেল। রোজি খাওয়ার টেবিলে আসেনি, রুকসানাই মতিনকে সঙ্গ দিলেন। বললেন, 'মেয়ে এসব খাবার খায় না। আমেরিকান মেমসাহেব তো!'

কথা হল, আগামীকাল অফিসের পর রুকসানা মতিনকে নিয়ে আসবেন। শেষপর্যন্ত মতিন জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'রোজি বোধহয় আমার এখানে থাকা পছন্দ করছে না। কী হবে?'

'আপনি আপনার মতো থাকবেন।' গম্ভীর মুখে বললেন রুকসানা।

ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে মতিন দেখল রাস্তার আলো জ্বলছে। এখন রাত বলেই মনে হচ্ছে। রুকসানা বললেন, 'চলুন, আপনাকে বাস স্টপ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মতিন দাঁড়ল, 'শুনেছি এখানে রাত্রে রাস্তায় হাঁটা নিরাপদ নয়।'

'আমাদের পাড়াগুলোতে কোনও ভয় নেই। ওসব ডাউনটাউনে হয়।'

'আমিও তো ওদিকেই যাব।'

একটু ভাবলেন রুকসানা। তারপর বললেন, 'আপনি দাঁড়ান, আমি রোজিকে বলছি গাড়ি বের করতে।' রুকসানা ভেতরে চলে গেলে মতিন দেখল যে গাড়িতে ওরা এসেছিল সেটা এখন রাস্তায় নেই।

কয়েক মিনিট পরে নীচের গ্যারাজের শাটার খুলে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে এলে সে অবাক হয়ে দেখল ড্রাইভিং সিটে রোজি বসে আছে। পাশে এসে বলল, 'কাম অন মিস্টার মতিন।'

রুকসানা বেরিয়ে এলেন বাড়ির মূল দরজা দিয়ে, 'মতিন আপনাকে রোজি পৌঁছে দিয়ে আসছে। আমার আবার রাত্রে গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয়। রোজি, ওকে নামিয়ে তুমি কোথাও যাবে না। সোজা বাড়ি চলে আসবে।'

'ওকে! বেবি!' হাসল রোজি।

বাধ্য হয়ে সামনের সিটে বসল মতিন। বসে বেল্ট বেঁধে নিল।

রোজি বলল, 'গুড বয়।'

কিছুক্ষণ চলার পরে রোজি বলল, 'সো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ গার্ল ফ্রেন্ড! তা হলে অনেক বলতে না। আজ অবধি ক'টা মেয়েকে চুমু খেয়েছ?'

'ইচ্ছে হয়নি।' মতিন জবাব দিল।

'কেন? তুমি কী হোমো?'

'কী?' বুঝতে পারল না মতিন।

'তোমাদের স্কুলে ইংরেজি পড়ায় না?'

'হ্যাঁ। পড়ায়।'

'উঃ।' কাঁধ নাচাল রোজি।

শেষপর্যন্ত শহরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। হঠাৎ একটা ছোট ক্যান ছুটে এসে গাড়ির ছাদে পড়ে ওপাশে চলে গেল। শব্দে চমকে উঠল মতিন, 'কী হল?'

'ফান। ওই বাস্টার্ডগুলো ফান করছে।'

'এটা কী ধরনের মজা। ওরা কারা?'

'মাগার। মাগার মানে জানো?' গাড়ি চালাচ্ছিল রোজি।

'না।'

'এখানে গাড়ি থেকে নামলে ওরা তোমার পকেট থেকে সব নিয়ে নেবে।'

'ও। ছিনতাইবাজ। পুলিশ নেই?'

'আছে। তাদের দেখলেই এরা পালায়।' রোজি বলল, 'তুমি কতদিন থাকবে এই শহরে?'

'আমি জানি না।'

'আমাদের বাড়িতে কবে যাবে?'

'কালই যাওয়ার কথা।'

'কিন্তু আমাকে একদম বিরক্ত করবে না। আউটসাইডার হয়ে থাকবে।'

সেটা কীরকম থাকা বুঝতে পারল না মতিন।

রোজি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় নামবে তুমি?'

'আমার অফিসের সামনে।'

'অফিসটা কোথায়?'

'সমস্যায় পড়ল মতিন। রুকসানাকে সে ঠিকানা বলেছিল একটা খাম দেখে। সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে সে। এমকি রাস্তার নামটাও মনে নেই। সে লজ্জিত গলায় বলল, 'সরি, মনে করতে পারছি না। আজই প্রথম এসেছি।'

'তা হলে কোথায় নামবেন তা আমাকে বলুন।'

'কী বলি!' সামনের বাড়িটাকে চেনা বলে মনে হল। ওখান থেকেই সে বেরিয়ে রুকসানার এই গাড়িতে উঠেছিল। মতিন বলল, 'এখানে আমাকে নামিয়ে দিন।'

গাড়ি রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে ইশারায় মতিনকে বসতে বলে রোজি ফোন করল, 'মাম, হি ডাজ নট নো হিজ অ্যাড্রেস।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

ওপাশের জবাব শুনতে পেল না মতিন। রোজি আবার গাড়ি চালালো। মিনিট আটেক পরে বাড়িটার নীচে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করল, 'চেনা মনে হচ্ছে?'

এবার চিনতে পারল সে। মাথা নেড়ে গাড়ি থেকে নামতেই রোজি নামল। রাস্তায় লোক দূরের কথা একটা গাড়িও নেই। মতিনকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রোজি বলল, 'হোপ ইউ উইল রিচ ইন ইওর প্লেস। গুড নাইট।'

বলে সে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াতেই মতিন দেখতে পেল দুটো ছেলে প্রায় মাটি ফুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রোজির ওপর। পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে রোজি চিৎকার করতে লাগল, বাধা দিতে লাগল। দৌড়ে ছুটে এল তিন। প্রথমেই রোগা ছেলেটার ঘাড়ে প্রচণ্ড শক্তি ঘুষি মেরেই পা চালাল সে। ছেলেটি ককিয়ে উঠে পড়ে গেল ফুটপাথে। লম্বা ছেলেটি তখন রোজির গলায় হার ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, বাধা দিচ্ছে রোজি। ছেলেটার কোমরের নীচে লাথি মারল মতিন। সে হকচকিয়ে তাকাতেই মুখে ঘুষি মারল। সম্ভবত নাক থেকে রক্ত বের হয়েছিল। ছেলেটা দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। প্রথমজন তখনও ফুটপাথে পড়ে ছটফট করছে।

রোজি বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তাড়াতাড়ি চলে যান।'

'আপনি আগে উঠে পড়ুন।' দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকল রোজি।

ঘরে ঢুকে তালা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়ল মতিন। জীবনে কখনও সে মারপিট করেনি। কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন মুস্তাফা ভাই-এর বক্সিং-এর স্কুলে ভরতি হয়েছিল। মায়ের আপত্তিতে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আজ রোজিকে আক্রান্ত হতে দেখে তার কী যে হয়ে গেল, অজানা শক্তি বোধহয় ভর করেছিল তার ওপর। ঘাড়ের কাছে বেশি আঘাত পেলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। ওই ছেলেটার ওরকম কিছু হলে তাকে পুলিশ খুনের দায়ে ধরবে। ছেলেটা মরে গেছে কিনা তা দেখতে গেলে আবার নীচে নামতে হয়, কিন্তু সাহস হল না মতিনের। শেষবার ওকে দেখেছে ছটফট করতে। তারপরই খেয়াল হল, এই ঘটনার তো কোনও সাক্ষী নেই। তার আঘাতেই যদি ছেলেটা মরে যায় তাহলে সেটা পুলিশের পক্ষে জানতে পারা সম্ভব নয়।

হাত-মুখ ধুয়ে ডিভানে শুয়েও স্থির হতে পারছিল না মতিন। সে যে কখনও এইভাবে কাউকে মারতে পারে তা নিজেই জানত না। একটু পরে বাইরের ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। কার ফোন? এত রাত্রে নিশ্চয়ই তার ফোন আসতে পারে না। সে ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল, 'শুয়ে পড়েছিলে?' রোজির গলা।

'না-মানে—!'

'মাম ফোন নাম্বারটা দিল। তুমি আমার খুব উপকার করেছ। আমি ভাবতেই পারিনি তোমার মতো শান্ত ছেলের শরীরে অত শক্তি আছে। থ্যাঙ্ক ইউ ওয়ান্স মোর।'

'আপনি পৌঁছে গিয়েছেন তো?' মতিন প্রশ্ন করল।

'আপনি? বাংলাদেশে কি ছোটরা বড়দের তুমি আর বড়রা ছোটদের আপনি বলে।' মতিন হেসে ফেলে, 'না।'

'তা হলে?'

'ঠিক আছে।'

শব্দ করে হাসল রোজি, 'আমি পৌঁছে গিয়েছি।'

এখন রুকসানা আপার বাড়ি থেকে অফিসে আসতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মতিন। ওঁর কথায় বাসের জন্যে মাসিক টিকিট করে নিয়েছে। এই বাসে উঠলেই তার দেশের কথা মনে পড়ে। এত আরামের বাস যদি দেশে চলত!

আজাদভাই তাকে নিয়ে রোজ বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে যাচ্ছেন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে হচ্ছিল কথা বুঝতে, বলতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সে অনেকটা সড়গড় হয়ে গেল। এই ব্যাপারে জন এবং জুলিয়া খুব সাহায্য করেছে মতিনকে। ওদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে আড়ষ্টতা ভেঙেছে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসার কাজ অনেকটা বুঝে গেল সে। এখন দিনের বেলায় সে একাই ক্লায়েন্ট মিট করতে যায়। বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি পোশাক আনন্দের সঙ্গে কিনছে এখানকার মানুষ, দেখেও সুখ হয়। ইতিমধ্যে দুদিন মুর্শেদের সঙ্গে কথা হয়েছে ব্যবসার প্রসঙ্গে। মুর্শেদ হেসেই কথা বলেছে কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়ে একটাও কথা বলেনি। জন তাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছিল অফিস থেকে পয়সা নিয়ে গিয়ে। একদিন দেশে ফোন করেছিল সে। বাসায় জানিয়ে দিয়েছে খুব ভালো চাকরি পেয়েছে, সামনের মাস থেকে হাজার ডলার করে

পাঠাবে। মা প্রথমে এতদিন চুপচাপ থাকার জন্যে বকাঝকা করলেও খবরটা শুনে খুশি হয়েছিল। টিয়াকেও ফোন করেছে মতিন। গালিব আবার অসুস্থ হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। টিয়া তাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে।

রুকসানা আপা খুব যত্ন করেন। সকাল সাতটার সময় সে বেরিয়ে যায়। ফেরে সন্ধ্যার মুখে। ফিরে নিজের ঘরে বসে টিভি দ্যাখে। রাত আটটায় ডিনার করে শুয়ে পড়ে। সপ্তাহের প্রথম পাঁচদিন রোজির সঙ্গে দ্যাখা হয় না। সে বাসায় ফেরে প্রায় রাত এগারোটা-বারোটায়। যেহেতু এই অঞ্চলটা শিকাগো শহরের গায়ে হয়েও একদম আলাদা তাই রাত্রে পথে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটে না। সে যখন বাসায় ফেরে তখন মতিন গভীর ঘুমে। যখন অফিসে যায় তখন রোজি ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু শনি এবং রবিবার ছুটি থাকে মতিনের। একটু বেলা বাড়লে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ নিয়ে আসে রোজি। এসে ডেকে বসে। ছুটির দিনে বাড়ির পেছনের বাগানে সকালটা কাটায় মতিন। গাছগুলোর যত্ন নেয়। সেই কারণে রুকসানা আপা খুব খুশি।

তখন রোজির সঙ্গে গল্প হয়। এখন রোজি খুব নরম গলায় কথা বলে।

পাশের চেয়ারে বসে মতিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'ওঃ, সিওর!'

'তুমি রোজ অত রাত্রে বাসায় ফেরো কেন?'

'অত রাত্রে মানে? আমি বারোটার মধ্যে ফিরে আসি। এখানে রাত হয় একটা নাগাদ। তখন তো বেশি রাত হয় না।' রোজি বলল।

'কী করো অতক্ষণ?'

'ফান। বন্ধুদের সঙ্গে মজা করি।'

'তুমি তাদের একজনকে গালি দিয়েছ, আমি শুনেছি।'

'ওঃ! ওটা একটা স্কাউন্ড্রেল।'

'কেন?'

কাঁধ নাচাল রোজি, 'হি নো নাথিং একসেপ্ট সেক্স।'

'বাকিরা?'

'আমরা বাইকে স্পিড তুলি, পুলিশ দেখলেই শান্ত। কেউ কেউ বিয়ার খাই, কেউ কোক। আর লেগপুল করি।' হাসল রোজি।

'রোজ এই এক কাজ করতে বিরক্ত লাগে না?'

'ওয়েল, আমি অফিসে যাই বারোটায়। আটটা পর্যন্ত ডিউটি করি। আর তারপর একটু রিল্যাক্স না করলে চলে? তুমিই বলো।'

মতিন মাথা নাড়ল, 'আমার ব্যাড লাক।'

'কেন?'

'সোম থেকে শুক্র, কোনওদিনই রাত্রে তোমার দ্যাখা পাব না।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রোজি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার ভয়েস? তোমার না হার ম্যাজেস্টির?'

'মানে?'

'মাম একই কথা বলে তো!'

'আমি সেটা জানি না।'

'তুমি চাও আমি মাঝে-মাঝে ছুটির পরে বাসায় চলে আসি?'

'তাহলে একসঙ্গে ডিনার করা যায়।'

হাত বাড়াল রোজি, 'ধরো।'

'ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে মতিন হাত বাড়াল। সেটাকে মুঠোয় নিয়ে রোজি বলল, 'ডান। কিন্তু তখন গম্ভীর কথা বলবে না!'

'ঠিক আছে।' মতিন হাসল।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে রুকসানাকে টাকাটা দিল মতিন। রুকসানা যখন শুনল মতিন দেশে মা-বাবার ঠিকানায় এক হাজার টাকা পাঠাতে চায় তখন খুব অবাক হলেন, 'তারপর তো তোমার হাতে কিছুই থাকবে না!'

'কেন! যা থাকবে তা আমার পক্ষে অনেক।'

'দেশে হাজার টাকা গেলে ওরা তো সত্তর হাজারের বেশি টাকা পাবেন। অবশ্য কিছু কমিশন বাদ যাবে। আমি বলি কী তুমি আটশো পাঠাও।'

মতিন কিছু বলল না। সে মাসে হাজার পাঠাবে বলে দিয়েছে।

রুকসানা বললেন, 'তুমি খুব ভালো ছেলে মতিন। এদেশের ছেলেরা কেউ এরকম চিন্তা করে কিনা আমি জানি না। তুমি আসার পরে আমার মেয়েটারও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। একেই বোধহয় বলে সঙ্গগুণ।'

আজাদভাই ব্যবস্থা করে দিলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন একজন ধনী বাংলাদেশির সঙ্গে। যাঁকে টাকা দিলে তাঁর লোক মতিনের বাসায় পৌঁছে দেবে।

এবার আজাদভাই অবসর নিলেন। শেষদিন অফিসে বসে বললেন, 'মতিন, কাল থেকে আমার বিশ্রাম। তোমাকে এখন থেকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে কামালসাহেবকে স্টেটমেন্ট পাঠাবে। তাতে গোডাউনে কত স্টক আছে, কত ক্লায়েন্টদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, কত বিক্রি হয়েছে এবং কী ডিম্যান্ড আছে তা যেন প্রতিফলিত হয়। জুলিয়া এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ। ওর সাহায্য পাবে তুমি। আশাকরি তুমি অসুবিধেতে পড়বে না। যদি দরকার হয় তা হলে নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করবে।'

আজাদভাই চলে যাওয়ায় বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল মতিনের। সে দিনের প্রথম ভাগটা ক্লায়েন্ট ভিজিট করতে লাগল। নতুন কাস্টমার তৈরি হল।

এক সন্ধ্যায় বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে যখন হাঁটছে তখন মতিন অবাক হয়ে দেখল রোজি দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'কিছু না।' মাথা নাড়ল রোজি।

'তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছো। অফিসে যাওনি?'

'না।'

'কেন?'

'আমি খুব ডিসটার্বড।'

'কেন?'

'আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্নের উত্তর চাই।'

মতিন তাকাল।

'তুমি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করো। আমি তোমাকে বুঝতে পারি না। তাই বুঝতে চাই।' রোজি বলল।

মতিন বলল, 'চল হাঁটি। হ্যাঁ কী বুঝতে চাও?'

'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'আমি? এটা মুখে বলতে হবে?' মতিন তাকাল।

'হ্যাঁ। আমি শুনতে চাই।'

'কী আশ্চর্য! আমরা বন্ধু, এই বন্ধুত্বটা চিরকাল থাকুক।'

'ও! ওকে! থ্যাঙ্ক ইউ।' মাথা নাড়ল রোজি।

বাকি পথটা মতিন কিছু কথা বললেই রোজি হুঁ হ্যাঁ ছাড়া কিছুই বলল না। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার পর সেই যে ওপরে চলে গেল আর নীচে নামল না। রুকসানা বললেন, 'ওর খুব মাথা ধরেছে বলল। তাই আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে।'

পরদিন অফিসে গিয়েই মতিনকে জুলিয়া বলল, 'মুর্শেদসাহেব ফোন করেছিলেন, আপনাকে আসামাত্রই কথা বলতে বলেছেন। খুব জরুরি দরকার।'

মুর্শেদভাইকে ফোন করল মতিন। মুর্শেদ বলল, 'খুব খারাপ খবর মতিন। বড় সাহেব অসুস্থ হয়েছেন।'

'কী হয়েছে মামার?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'হার্ট অ্যাটাক। নার্সিংহোমে ভরতি আছেন। আই সি ইউ-তে।'

'ও।'

মুর্শেদভাই বলল, 'ডাক্তার বলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে কিছুই বলা যাবে না।'

'তা হলে—!'

'কিছুই করতে পারি না আমরা। অপেক্ষা করা ছাড়া।' মুর্শেদ বলল।

'আমি কি হেড অফিসে ফোন করে খোঁজ নিতে পারি?'

'কী খোঁজ নেবে? বুঝতেই পারছ, বড়সাহেবের খারাপ কিছু হলে এই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। ওঁর ছেলে নেই যে ব্যবসার হাল ধরবে।'

'তা হলে—।'

'তা হলে আমাদের একটাই করণীয়। আমরা আর নতুন কোনও অর্ডার দেশে পাঠাব না। যা স্টক আছে তা বিক্রি করে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। মুর্শেদভাই লাইন কেটে দিল।

দু-হাতে মাথা ধরে বসে থাকল মতিন। জুলিয়া চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে বাংলা সামান্য বোঝে। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'মামার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আই সি ইউ-তে আছেন। উনি আমার মামা। যদি কিছু ওঁর হয়ে যায় তা হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।' মতিন বলল।

'এখনই এসব ভাবছেন কেন? আমি ওঁকে কয়েকবার দেখেছি। খুব বিচক্ষণ মানুষ। নিশ্চয়ই জানেন তিনি না থাকলে ব্যাবসা কী করলে চালু থাকবে। জুলিয়া বলল। মতিন মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না।'

চারদিন পরে ঢাকা থেকে মেল এল। মতিনকে অবিলম্বে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। মতিন মরিয়া হল। সে হেডঅফিসে ফোন করল। জানল, কামাল হোসেন সাহেব এখনও নার্সিংহোমে। তবে আই সি ইউ থেকে তাঁকে বের করে আনা হয়েছে। মেল তাঁরই নির্দেশে পাঠানো হয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় রুকসানাকে ব্যাপারটা জানাল মতিন। ভদ্রমহিলা খুব খুশি হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমার ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট এসে গিয়েছে। কালই চলে যাও। তারপর ইউ এস ইমিগ্রেশনে গিয়ে ওয়ার্কিং ভিসা নিয়ে নাও।'

'আমি পাব?'

'নিশ্চয়ই। তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাই হেল্প করবে।'

'রোজি কোথায়?'

'অফিসে। ফিরবে তো রাত বারোটায়। মাঝখানে পালটে গিয়েছিল, আবার যে কী হল, যে কে সেই!' রুকসানা বললেন।

এবার বাস নয়। অফিসের টাকায় প্লেনের টিকিট কেটে নিউইয়র্কে এল। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় রোজির খোঁজ করেছিল মতিন, কিন্তু সে তখন ঘুমাচ্ছে। রুকসানা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বলে দেব। তুমি তো ভিসা পেতেই ফিরে আসছ।'

বাংলাদেশের দূতাবাসে খবর নিয়ে জানা গেল রুকসানার অনুমানই সত্যি। এতদিন পরে তার আবেদনের জবাবে ডুপ্লিকেট পাসপোর্ট ইস্যু করার অর্ডার এসেছে। অফিসার অত্যন্ত সজ্জন। অতি দ্রুত পাসপোর্ট ইস্যু করে দিলেন। সেখান থেকে মতিন ছুটল ইউ এস ইমিগ্রেশনে। সব কিছু দেখে শুনে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, 'আর টেম্পোরারি ভিসা বাড়ানো যাবে না। আগামীকালের মধ্যেই মতিনকে দেশে ফিরে যেতে হবে। আমেরিকায় কাজ করতে হলে মতিনকে ঢাকার আমেরিকান দূতাবাস থেকে ভিসা নিতে হবে।'

মতিন শুধু একটা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসেছিল শিকাগো থেকে। বাধ্য হয়ে মুর্শেদকে টেলিফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানাল। মুর্শেদ বলল, 'এ তো ভালো খবর। তুমি এই পাসপোর্টটার জন্যে ব্যাকুল ছিলে। আমার মনে হয় তোমার আজই দেশে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু আমার সমস্ত জিনিসপত্র তো শিকাগোতে।'

'থাক না। যখন আবার আসবে তখন কাজে লাগবে।'

'কিন্তু ফিরব কী করে? আমার কাছে টিকিট নেই।'

'আমার কাছে আছে। আমি ওটা ওপেন করে রেখেছি। তুমি সোজা জে এস কে-তে চলে যাও। আমি আসছি।' ফোন রেখে দিল মুর্শেদ।

নিজেকে খুব অসহায় বলে মনে হচ্ছিল মতিনের। সে টিয়াকে ফোন করল। টিয়ার ফোন সুইচ অফ করা। তারপর রুকসানাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল। রুকসানা বললেন, 'তুমি যদি মাসখানেকের মধ্যে ফিরে আসো তা হলে আমাকে জানিও। না এলে জিনিসপত্রগুলো তোমার অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসব। ভালো ভাবে যেও।

এখন অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার সময়। কিন্তু জুলিয়াকে পেয়ে গেল সে। সব শুনে জুলিয়া বলল, 'আমি প্রে করছি, আপনি যেন ফিরে আসেন স্যার।'

একেবারে রোবটের মতো টিকিটটা মতিনের হাতে তুলে দিয়ে মুর্শেদ বলল, 'তুমি জেনে খুশি হবে তোমার টিকিট কনফার্ম করে দিয়েছি। হ্যাভ এ নাইস জার্নি। যাও, দেরি হয়ে গেছে একটু।'

মা খুব খুশি। বাবা বললেন, 'কবে বাস্তবজ্ঞান হবে? আসতে পারছ না, এ কথাটা আমাদের জানানো দরকার বলে মনে করলে না! যাক গে, শুনলাম তোমার মামা খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁরই অনুগ্রহে তো আমেরিকা দেখে এলে। একবার দ্যাখা করে এসো।' বাবাকে মামার সম্পর্কে এতটা নরম হতে কখনও দ্যাখেনি মতিন। মৃত অথবা অসুস্থ লোকের সঙ্গে বোধহয় কেউ শত্রুতা রাখে না।

বিকেলে মামার বাড়ি থেকে খবর নিয়ে নার্সিংহোমে গেল মতিন। মামার কেবিনে তখন মামি ছাড়াও আরও দুজন। উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে মামা আধ-শোওয়া হয়ে আছেন। তাকে দেখে মামি বললেন, 'মতিন এসেছে।'

মামা তাকালেন। খুব রোগা হয়ে গিয়েছেন। বললেন, 'এসেছ।'

'হ্যাঁ।' মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আছি। এ যাত্রায় যেতে পারলাম না।'

মামি বললেন, 'আঃ, কী বাজে কথা বল!'

মামা বললেন, 'আজাদভাই তোমার প্রশংসা করেছেন। ওঁর চলে যাওয়ার পরে তুমি ব্যবসা আরও বাড়িয়েছ দেখলাম। আমি এটা আশা করিনি।'

মতিন চুপ করে রইল।

মামা বললেন, 'কাল সকালে অফিসে যেও। জরুরি।'

'আচ্ছা।'

বাইরে বেরিয়ে এসে বেশ স্বস্তি পেল মতিন। মামা যখন তাকে জরুরি দরকারে অফিসে যেতে বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এখানেই তার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। বাড়িতে ফিরে গিয়ে মাকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, 'এখনই তোর বাবাকে কিছু বলিস না। কাল গিয়ে জান কেন যেতে বলল!'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বারংবার মনে পড়ছিল টিয়ার কথা। খুব ভালো মেয়ে টিয়া। প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। এরকম মেয়েকে সে আগে দ্যাখেনি। মনে পড়ছে রোজির কথা। ইদানীং, রোজি তার সঙ্গে দ্যাখাই করত না। সেই যে সন্ধেবেলায় হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করেছিল, তুমি আমার কাছে কী চাও, কী উত্তর চেয়েছিল সে? যত ইচ্ছেই হোক ভালোবাসার কথা বলার সাহস যে তার হয়নি। তাই কি শুনতে চেয়েছিল সে?

পরদিন অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয় জানাতেই হইচই পড়ে গেল। চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট তাকে খুব খাতির করে বসালেন। তারপর তার হাতে একটা বন্ধ খাম তুলে দিলেন। মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'কী এটা?'

'খুলে দেখুন।'

খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করল মতিন। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'কে হোসেন অ্যান্ড কোম্পানি তাদের আমেরিকার গার্মেন্টস ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে মিস্টার মতিন আহমেদকে অনুরোধ করছে। এই ব্যবসায় যা মুনাফা হবে তার চল্লিশ ভাগ মিস্টার মতিন আহমেদ পাবেন, বাকি ষাটভাগ কে হোসেন অ্যান্ড কোম্পানির প্রাপ্য হবে। মিস্টার মতিন আহমেদ কোম্পানির ব্যবসা যেসব আমেরিকান শহরে আছে তার বৈদেশিক কর্তা হিসেবে দ্যাখাশোনা করবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হলে মিস্টার আহমেদকে নিম্ন সাক্ষরকারীর সাক্ষরের পাশে সাক্ষর করতে হবে।' তলায় কে হোসেন কোম্পানির কর্ণধার মিস্টার কামাল হোসেনের সই রয়েছে।

মতিনের মাথার ভেতর আচমকা শূন্য হয়ে গেল। সে কিছুই ভাবতে পারছিল না। চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন, 'স্যার, আপনার পাসপোর্টটা দরকার। ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিতে হবে আমেরিকান ভিসার জন্যে।'

মতিন শূন্যচোখে তাকাল। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

স্বপ্নেই এমন হয়

সারারাত মেল ট্রেনে না ঘুমিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। একদিন আগে টিকিট কাটলে এসব ট্রেনে শোওয়ার জন্যে বার্থ খালি পাওয়া যায় না। সকালে ট্রেনটা জংশন স্টেশনে দাঁড়ালে প্ল্যাটফর্মে নেমে মিলন জেনেছিল, তাকে এখনও ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। ওপাশে ন্যারো গেজ ট্রেনের লাইন আছে। সেখানে ট্রেন আসবে সাড়ে ন'টায়। ওই ট্রেন তাকে পৌঁছে দেবে বিন্দু নামের স্টেশনে, পাঁচ ঘণ্টা পরে। মেল ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেলে চারধার বেশ শান্ত হয়ে গেল। স্টেশনের নোংরা টয়লেটে গিয়ে কোনওমতে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে এক কাপ চা আর বিস্কুট দিতে বলল মিলন।

বেঞ্চির একপাশে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একটা লোক উদাসভঙ্গিতে বসেছিল। সে এবার চা-ওয়ালাকে বলল, 'তাহলে পয়সা না দিলে তুমি আমাকে চা দেবে না?'

চা-ওয়ালা জবাব না দিয়ে মিলনের জন্যে চা বানাতে লাগল।

'হাতি যখন কাদায় পড়ে তখন ব্যাঙও লাথি মারে।'

'তুমি এখন ট্যাঁকখালির জমিদার। মুখে শুধু কথার খই ফুটছে।' কাপে চা ঢেলে একটা সুজির বিস্কুট আর-একটা প্লেটে রেখে মিলনকে দিল চা-ওয়ালা।

একটু অস্বস্তি হল মিলনের। সেটা কাটাতে না পেরে বলল, 'ওঁকে চা দিন। আমার সঙ্গে দামটা জুড়ে দেবেন।'

'কপাল করেছিলে!' বলে চা-ওয়ালা আবার চা বানাতে লাগল।

'বাবু দেখছি জীবনে অনেক দুঃখ পাবেন।' লোকটা মিলনের দিকে তাকিয়ে বলল।

'কী করে বুঝলেন?' চায়ে চুমুক দিল মিলন।

'আপনার মন নরম।' নইলে আমার জন্যে চা বলতেন না। হাসল লোকটা, 'আগে তো দেখিনি। এদিকে নতুন আসা হল?'

'হ্যাঁ। ছোট ট্রেন ধরে বিন্দু যাব।'

'সর্বনাশ!' শব্দটা যেন ছিটকে বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে।

'কেন?'

'তার আগে বলুন, কেন সেখানে যেতে হচ্ছে?'

'বিন্দু থেকে ভটভটি নৌকায় চেপে একটা দ্বীপে যেতে হবে, সেখানে চাকরি পেয়েছি।' মিলন বলল।

'যাক। তাহলে বিন্দুতে থাকবেন না। বেঁচে গেলেন।'

'কেন ভয় দেখাচ্ছ? কী জান সেটা বলে দিলেই পার।' চা-ওয়ালা চা দিয়ে বলল, 'শুধু নাটক করে কী লাভ!'

চায়ের কাপ ধরে লোকটা বলল, 'বিন্দুর যে-কোনও বাচ্চা কথা বলতে শেখার সময় শিখে ফেলে কী করে মিথ্যে কথা সত্যির মতো বলতে হয়। একটাও মানুষ পাবেন না, যে সত্যি কথা বলে। ছেলেগুলো অলস, মেয়েরাই কাজ করে। ফলে তারা যা খুশি করলে ছেলেরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তা দ্বীপের নাম কী?'

'দারুচিনি।'

'নাম শুনিনি, যাইনি তো কোনওদিন। আপনি ওখানে থাকবেন, যদি সুযোগ পাই ঘুরে আসব।' লোকটা চা খেতে লাগল।

ছোট ট্রেন প্রবলবিক্রমে ছুটলেও আধঘণ্টা অন্তর থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে স্টেশনের জন্যে। মিলন লক্ষ করছিল যত এগোচ্ছে তত যাত্রী কমে যাচ্ছে কামরার।

বিন্দু স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক দেখল মিলন। ছোট্ট স্টেশন। বলা হয়েছে, স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে তার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই লোক বাজার-হাট করে তাকে তুলে দেবে ভটভটিতে। স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে কেউ নেই। অথচ অফিস থেকে তাকে এরকম কথাই বলা হয়েছিল। একটু ইতস্তত করে বাইরে বেরুবার জন্যে ওখানে গিয়ে মিলন দেখল, গেটে কোনও টিকিট চেকার নেই।

স্টেশনের বাইরেটা যে-কোনও গ্রামের মতো। তাকে সাহায্য করার জন্যে যাঁর আসার কথা তিনি আসেননি। একটু আগে মিলন শুনেছিল বিন্দুর লোকজন সত্যি কথা বলে না। কিন্তু কথার খেলাপও যে করে তা লোকটা বলেনি।

এই সময় একটা সাইকেল তীব্র গতিতে বাঁ-দিক থেকে এগিয়ে এসে বেশ শব্দ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। সাইকেল থেকে নেমে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যে মেয়েটি স্টেশনের ভেতরে ঢুকে গেল তার বয়স বড়জোর বাইশ কি তেইশ। মিলন একটু কৌতূহলী হয়ে পেছনে ফিরল। শূন্য প্ল্যাটফর্মে কাউকে না পেয়ে মেয়েটা সাইকেল নিয়ে এগিয়ে এল গেটের দিকে। মিলনকে দেখে দাঁড়াল সে, 'ট্রেন এখনও আসেনি?'

'এসে চলে গেছে।' মিলন জানাল।

'বাঃ! ভালোই হয়েছে। লোকটা নিশ্চয় আসেনি, এলে এখানেই দেখতে পেতাম। বিন্দুর জল যার পেটে পড়েনি তার মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি। ভালো হজম হয় না তো, তাই পেটের রোগে ভোগে বাইরের লোকগুলো। যাকগে, মিছিমিছি কথা বলে সময় নষ্ট করছি! চলি।' সাইকেলে উঠে বসল মেয়েটি।

'কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম জানতে পারি?'

'অনামিকা। আর কিছু?'

'আপনার বাবার নাম?'

'আশ্চর্য! কার সঙ্গে দরকার? বাবার সঙ্গে না আমার সঙ্গে?'

'আমাকে বলা হয়েছিল একজন লোক আমাকে এই স্টেশনে রিসিভ করে দারুচিনি দ্বীপে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু তিনি আসেননি।'

'অ। তা আসবে কী করে? ঘুমাচ্ছে যে।'

'ঘুমাচ্ছে মানে? এসময় কেউ ঘুমায়? তা ছাড়া ওঁকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা না করে ঘুমিয়ে পড়লেন?'

'ঘুমের ওপর কারও জোর চলে না। ঘুম হল অর্ধেক মৃত্যু। কথা বাড়াবেন না। আমার সাইকেলের পেছনে উঠে বসুন।'

'আপনার সাইকেলের ক্যারিয়ারে আমি উঠব কেন?'

'ঘাটে যাবেন বলে।'

অগত্যা মিলন সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসল। মেয়েটি পাঁইপাঁই করে সাইকেল চালাচ্ছে, পাশের লোকজন যে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী নয় ওর ব্যাপারে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'পকেটে টাকা আছে?'

'কেন?'

'বাজার করে না নিয়ে গেলে দ্বীপের হাওয়া খেয়ে থাকতে হবে। শাকপাতা ছাড়া কিছু জুটবে না সেখানে।'

'অফিস থেকে বলেছিল যে আমাকে ভটভটিতে তুলে দেবে, সে-ই বাজার করে আনবে। ওই লোকটার ঘুম ভাঙলেই কথাটা জানতে পারবেন।'

'এখন ঘুম ভাঙবে না। ভাঙতে-ভাঙতে সূর্য ডুবে যাবে। তখন আবার নতুন করে ঘুমোবার জন্যে বোতল উপুড় করবে মুখের ওপর।'

'সর্বনাশ! এরকম মাতালকে দায়িত্ব দিলে অফিস লাটে উঠবে।'

'অ্যাই খবরদার! ওকে তুমি মাতাল বলবে না। চেন না, জান না, কোনওদিন চোখে দ্যাখোনি, সে তোমার কাছে মাতাল হয়ে গেল? যাকগে, বাজার করবে তো করো। আমার আর বেগার খাটার সময় নেই।'

মিলন বাজারে ঢুকল। প্রথমে চালের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কত করে।'

দোকানদার বলল, 'যা দেবেন।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল মিলন। খদ্দেরের ইচ্ছে অনুযায়ী দাম ঠিক হয় নাকি কোথাও? সে বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কত দামে বিক্রি করছেন?'

কয়েকপ্রস্থ দরাদরির পরে সে চাল কিনল। সেইসঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য যা-যা লাগে সবকিছু। অফিস থেকে বলে দেওয়া হয়েছে দারুচিনি দ্বীপে কিছুই পাওয়া যায় না। মুটের মাথায় বস্তা চাপিয়ে সে যখন সাইকেলের কাছে এল, তখন মেয়েটি সেখানে নেই।

একটা লোক বলল, 'ওই সাইকেলে বস্তা বসিয়ে আপনাকে চলে যেতে বলেছে। যান, যান।'

সে অবাক হয়ে দ্বিতীয়জনের দিকে তাকালে লোকটা একগাল হেসে বসল, 'ও সত্যি কথা বলছে।'

চট করে মনে পড়ে গেল। বিন্দুর প্রতিটি মানুষ শৈশব থেকে মিথ্যে কথা সত্যির মতো বলতে শেখে। তাহলে ওই দুজনই মিথ্যে বলছে। প্রয়োজনে মিথ্যে যারা বলে তাদের বোঝা যায়, অপ্রয়োজনে কেন বলছে বোধগম্য হয় না।

সে মুটেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নদীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে?'

মালের ভারে ঝুঁকে দাঁড়ানো মুটে বলল, 'ও ব্বাবা! পারব না।'

'একটু কষ্ট কর না ভাই, টাকা বাড়িয়ে দেব।' মিলন বলল।

'কত বাড়াবেন? এখান থেকে দশ মাইল হাঁটতে হবে। অসম্ভব।'

'দশ মাইল?' অবাক হল মিলন। লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। এই বোঝা নিয়ে কেউ দশ মাইল হাঁটতে পারে না। স্বীকার করে নিল মিলন।

'ঠিক আছে। আমি একটা ভ্যানরিকশা ভাড়া করে নিয়ে যাচ্ছি, তার ভাড়া আপনাকে দিতে হবে। এই ধরুন, আরও একশো টাকা।' মুটে বলল।

'অসম্ভব। অত টাকা আমি দিতে পারব না।'

'তাহলে ভাড়া মিটিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন বাবু।'

লোকটা এমন নাছোড়বান্দা যে পুরো ভাড়া না নিয়ে বিদায় হবে না।

জিনিসপত্রগুলো নিয়ে অসহায় হয়ে যখন মিলন দাঁড়িয়ে, তখন একটি প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবা?'

'নদীতে গিয়ে ভটভটি ধরব। যাব দারুচিনি দ্বীপে।'

'হায় কপাল! আজ তো তোমার যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'এখন তো সন্ধে হয়ে এসেছে। নৌকো পাবে না।'

'সন্ধে? কী বলছেন? চারধারে কড়া রোদ আর আপনি বলছেন সন্ধে হয়ে এসেছে?' প্রতিবাদ করল মিলন।

'এখন গরমকাল বলে তুমি রোদ দেখছ, শীতকাল হলে একটু পরে সন্ধ্যাতারা দেখতে আকাশে।' প্রৌঢ় হাসল, 'তারপর যাওয়া কি সোজা কথা! যেতে আসতে মাঝরাত। ওই ভয়ঙ্কর ঢেউ-এ কোনও নৌকো রাত্রে যাবে না।'

'তাহলে উপায় কী?' মিলন বিড়বিড় করল।

'রাতটা বিন্দুতেই কাটিয়ে যাও। তবে একটু সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে।'

'কেন?'

'দিনকাল তো ভালো নয়।'

'এখানে হোটেল আছে?'

লোকটি শব্দ করে হেসে বলল, 'পাগল! তবে সত্যি যদি সুস্থভাবে রাত কাটাতে চাও তাহলে আমার বাড়িতে যেতে পার। তুমি তো একদম অচেনা নও।'

অবাক হল মিলন, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'তুমি যার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে এখানে এলে তাকে তো চিনি। সে তো যাকে-তাকে সাইকেলে বসাবে না। সে যাকে বাবা বলে তাকেও চিনি।'

'হ্যাঁ, ওই ভদ্রলোকই আমাকে সমস্যায় ফেলেছেন। উনি যে সকাল থেকে মদ খেয়ে পড়ে থাকেন তা বোধহয় আমার অফিস জানত না।' মিলন বলল।

'মদ? কী যা তা বলছ? সে কখনও মদ স্পর্শ করেনি। একটা মানুষের নামে অযথা দুর্নাম দিচ্ছ কেন হে?' লোকটি খেঁকিয়ে উঠল।

ঠিক তখনই মেয়েটি ফিরে এসে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'বাজার হয়েছে?' তারপর জিনিসপত্র দেখে মাথা নাড়ল, 'বাঃ! বেশ সংসারি দেখছি।' বলে হাত নেড়ে কাউকে ডাকল।

মিলন অবাক হয়ে দেখল, যে মুটে তাকে জিনিসপত্রসমেত এখানে দাঁড় করিয়ে পুরো ভাড়া নিয়ে গিয়েছিল সে অম্লানবদনে এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় নিয়া যাব দিদি?'

'নদীর ঘাটে। নৌকায় তুলে দেবে।'

মিলন বলল, 'এক মিনিট। ইনি বলছিলেন এখন নাকি নৌকো ছাড়বে না।'

'তা জানি না।' মেয়েটি বলল।

'তা ছাড়া নদী নাকি ওখান থেকে দশমাইল দূরে।'

'একথা কে বলেছে আপনাকে?'

'এই মুটেই বলছিল।'

'বেশ তো। গিয়েই দেখা যাক।'

মেয়েটি সাইকেল চালিয়ে আগে-আগে চলে গেল। মুটের পেছনে মিলন। এই মুটেটাকে নিশ্চয়ই ভাড়া দিতে হবে। মেয়েটি আসার পরেই প্রৌঢ় সরে গিয়েছিল। এখানকার সবাই যে মিথ্যেবাদী তা বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। নইলে বিকেল না হতেই বলে, সন্ধে হয়ে আসছে!

মিনিট দশেক হাঁটার পর নদী দেখতে পেল মিলন। বেশ চওড়া নদী। সে মুটেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যে তখন বললে দশমাইল রাস্তা?'

'আমি বলেছি?' মালপত্র নামিয়ে মুটে পালটা প্রশ্ন করল।

'আশ্চর্য!' মিলন হাঁ হয়ে গেল।

'আপনি ভুল শুনেছেন। আমি বলেছিলাম দশ মিনিটের পথ।'

'তুমি মিথ্যেকথা বলছ।'

'না বাবু। আমি সত্যিকথা বলছি।'

হাল ছেড়ে দিল মিলন। নদীর ধারে ছোট-বড় নৌকো, লঞ্চ দাঁড়িয়ে। কিছু যাত্রী তাদের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। মেয়েটি ঘুরে এসে বলল, 'তাহলে আপনি আজ দারুচিনি দ্বীপে যাবেনই?'

'সেরকম কথাই আছে।'

'পৌঁছতে কত রাত হবে বলতে পারছি না। নিশ্চয়ই সমস্যায় পড়বেন না?'

'না গেলে বলব কী করে। শুনেছি, আমাকেই সব বুঝে নিতে হবে।'

'বেশ। দেখি, আপনি কী করে বুঝতে পারেন। কোন নৌকো দারুচিনি দ্বীপে যাচ্ছে তা খুঁজে বের করুন তো!' মেয়েটি এই প্রথম হাসল।

মিলন তাকাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রথম নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি দারুচিনি দ্বীপে যাচ্ছেন?'

লোকটা চোখ বড় করল, 'বাপরে! সেখানে এখন বিশাল-বিশাল হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে এগোনোই মুশকিল।'

পরের নৌকোর মাঝি কোনও কথা না বলে মাথা নেড়ে না বলে দিল। মিলন প্রত্যেকটি নৌকো থেকে একই জবাব পেয়ে ফিরে এসে মেয়েটিকে বলল, 'কী আশ্চর্য। এদের কেউ দারুচিনিতে যাচ্ছে না।'

'তাহলে আপনি কী করে যাবেন?' মেয়েটি হাসল।

'আপনি বলুন। আমি তো এখানকার কিছু জানি না।'

'আমি কেন আপনাকে পরামর্শ দেব?' মেয়েটি আবার হাসল।

'যেহেতু এখানে একমাত্র আপনিই আমার ভরসা। আপনার মতো সুন্দরী মহিলা নিজের কাজ ফেলে এতটা সময় আমাকে দিচ্ছেন যখন, তখন এটুকু আবদার করতেই পারি।'

'আবদার?' মেয়েটি বেশ জোরে হাসল, 'বেশ মন রেখে কথা বলতে পারেন তো। ঠিক আছে প্রথম নৌকায় উঠে বসুন।'

'প্রথম নৌকা? ওর মাঝি বলল দারুচিনিতে যাবে না।'

'কী বলেছে ঠিকঠাক ভেবে দেখুন।'

মিলন মনে করল। লোকটা বলেছে ওখানে বিশাল-বিশাল হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একবারও বলেনি সে ওখানে যাবে না। ওর ভয় দেখে মিলন ধরে নিয়েছিল সেকথা। উঃ, চারপাশের লোকজন যদি এত মিথ্যে বলে তাহলে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো মুশকিল।

প্রথম নৌকায় উঠল মিলন। মুটে মালপত্র তুলে দিলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

মুটে আকাশের দিকে তাকাল, 'আমি এখন মাটিতে নেই, জলের ওপর নৌকায় আছি। তাই আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।'

অর্থাৎ জলের ওপর দাঁড়িয়ে লোকটা মিথ্যে বলবে না। দশটা টাকা দিতে লোকটা নিরাসক্ত মুখে নেমে গেল। একটু-একটু করে জনাদশেক লোক হল। মিলন লক্ষ করছিল, মাঝিরা একবারও হেঁকে বলছে না কোথায় নৌকো যাচ্ছে। সে পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'কুমিরডাঙা।'

মিলনের মনে পড়ল, এরা কেউ সত্যি কথা বলে না।

সে দেখল মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। চেঁচিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'হাঙরের পেটে গেলাম কিনা জানবেন কী করে?'

'নৌকা ফিরে এলে জেনে যাব।' মেয়েটি হাসল।

ইঞ্জিন চালু হল। এখন রোদ নেই, ছায়া ঘন হয়েছে। নৌকা পাড় ছাড়ল। দেখতে-দেখতে

বেশ টপকে যাচ্ছে নৌকাটা, মোট ছয়জন মাঝি আছে নৌকাতে। কোনাকুনি গিয়ে উলটো দিকের পাড়ের কাছাকাছি চলে এল নৌকা। কিছুটা যেতেই একটা ঘাট। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেল সেখানে। দুজন উঠল। মিলন জিজ্ঞাসা করে জানল, ঘাটের নাম ভাঙা কপাল। এরকম নাম কোনও জায়গার হয়? মিলনের বিশ্বাস, লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে।

আরও আধঘণ্টা চলার পর যে ঘাটে নৌকা ভিড়ল সেখানে হারিকেন জ্বলছে। পাশের লোকটা নেমে যাচ্ছিল। মিলন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি কুমিরডাঙা?'

লোকটা মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে নেমে গেল।

এই সময় চাঁদ উঠল। ধীরে-ধীরে আলো ছড়াল। নৌকা তখনও ঘাট ছেড়ে যাচ্ছে না। মাঝিরা নেমে গেছে ঘাটে। উসখুস করছিল মিলন। চাঁদ আর-একটু ওপরে উঠলে চারপাশ চনমনে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হলে মাঝিরা ফিরে এল। ওদের কথাবার্তা কানে এল মিলনের। একজন বলল, 'এই রাত্রে আর না এগিয়ে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

'ভাটার টান চলছে। সোজা টেনে নিয়ে সমুদ্রে ফেলবে। ফিরেই চল।'

নৌকো ছাড়ল। বাতাসে ওদের কথা ডুবে যাওয়ায় আর কিছু শুনতে পেল না মিলন। কিন্তু ওরা এখন বিন্দুতে নিয়ে যাবে নাকি? সে চিৎকার করল, কিন্তু মাঝিদের কানে আওয়াজ পৌঁছল না।

নৌকো খুব দুলছে। নিজের জায়গা ছেড়ে ওদের কাছে উঠে যেতে সাহস পাচ্ছিল না মিলন। ওরা যদি ফিরে যায় তাহলে সে কিছুই করতে পারবে না। বিন্দু যে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওখানে কোথায় রাত কাটাবে সে?

জলের দিকে তাকাল। আকাশ থেকে যেন রূপের স্রোত নেমেছে জলে। ক্রমশ ডাঙা মিলিয়ে গেল। এখন আর কূল দেখা যাচ্ছে না। আকাশে তাকাল সে। চাঁদের লাবণ্যে যেন বান ডেকেছে। আকাশ জুড়ে এখন এত তারা যে আকাশটাকেই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। শহরের আকাশে ওইসব তারাদের দেখা যায় না। একটা মাঝি এগিয়ে এল, 'সামনে সমুদ্র, বাবু শক্ত করে ধরে বসুন।'

'সমুদ্র?' অবাক হয়ে তাকাল মিলন।

'হ্যাঁ। এখন ঢেউ নৌকো নিয়ে খেলবে।'

'তোমরা বিন্দুতে ফিরে যাচ্ছ না?'

'যাওয়াই উচিত ছিল। রাতে নৌকা চালানোর নিয়ম নেই। কিন্তু কাল পূর্ণিমা বলে আজ নদী দিনের মতো পরিষ্কার। দেখতে পাচ্ছি বলে চলছি। তা ছাড়া আপনি দারুচিনিতে যাবেন বলে নৌকায় উঠেছেন। একজন নৌকায় থাকলে তাকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।' একটা দড়ি ছুড়ে দিল লোকটা, 'এইটে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নৌকার সঙ্গে বেঁধে ফেলুন বাবু।'

মাঝি নিজের জায়গায় ফিরে গেলে দুটো কারণে মিলন খুশি হল। প্রথমত, লোকগুলো কর্তব্যনিষ্ঠ। যাত্রী একজন হলেও তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয়ত, যাত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারটা খেয়াল রাখে। মিলন শুনেছে প্লেনের সিটে বসলে কোমরে বেল্ট বাঁধতে হয়। দড়িটাকে কোমরে জড়িয়ে নৌকার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে নিল মিলন। পরক্ষণেই মনে হল, নৌকা যদি ডুবে যায় তাহলে তাকেও ডুবতে হবে, সাঁতরে ভেসে থাকার সুযোগ পাবে না।

ক্রমশ ঢেউ বড় হচ্ছে। নৌকা বাঁ-দিকে ডান দিকে হচ্ছে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হল। ঢেউগুলো খ্যাপা ষাঁড়ের মতো গুঁতোতে লাগল নৌকাকে, জল থেকে ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রায়ই। নামার সময় মনে হচ্ছিল সোজা জলের নীচে চলে যাবে। যেতে-যেতেও আবার ভেসে উঠছিল নৌকা। কিন্তু তার মধ্যে ছিটকে ওঠা জলে ভরে যাচ্ছিল নৌকা। এসব সামলে একটা মাঝি ক্রমাগত জল তুলে ফেলছিল নৌকা থেকে। বমি হয়ে গেল মিলনের। পেটে ব্যথা শুরু হল। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। সুটকেস যে ছিটকে গেছে নৌকার অন্যদিকে, তা দেখার মতো হুঁশ ছিল না।

তারপর নৌকাটা স্থির হল। চোখ খুলল মিলন। চাঁদ যেন নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। মুখ ফেরাতেই স্থলভূমি চোখের সামনে ভেসে উঠল। গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। পেছনে তাকাতে সেই ভয়ঙ্কর ঢেউগুলোকে দেখতে পেল। নৌকা এখন পাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

মাঝি চেঁচিয়ে বলল, 'বাবু! আপনার দারুচিনি এসে গেছে।'

কোমর থেকে দড়ি খোলার কথা খেয়াল ছিল না, উঠে দাঁড়াতে যেতে টান পড়তে হুঁশ ফিরল। দড়ি খুলে উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষকে দেখতে পেল সে। লাঠি হাতে একটু কুঁজো হয় দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর থেকে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝিরা চিৎকার করতে লাগল তাকে দেখে, 'দাদু, এসে গেছি।'

তীর অবধি গেল না নৌকো। সুটকেস কুড়িয়ে নিয়ে মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কত ভাড়া দিতে হবে?'

'বিশ টাকা।' মিলনের বাজারভরতি থলেটা নামিয়ে দিল সে।

বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা দিয়ে নৌকো থেকে জলে নামল সে। হাঁটু পর্যন্ত জল ভেঙে সে বালিতে উঠতেই বৃদ্ধ বললেন, 'আসুন ভাই। এখন থেকে এই জায়গার দেখাশোনার ভার আপনার ওপর। চেষ্টা করবেন এদের যত্নে রাখতে।'

'আপনি?' জিজ্ঞাসা করল মিলন।

'তিরিশ বছর বয়সে এসেছিলাম। চল্লিশ বছর ধরে এই জল, গাছ, পাহাড়ের সঙ্গে মিলেমিশে ছিলাম। এখন শরীর অশক্ত, তাই ছুটি চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত মালিকের ছেলে মালিক হয়ে আমাকে ছুটি দিয়েছেন। জানিয়েছিলেন আজ বদলি লোক আসবে। এলে আমার ছুটি হবে।' বৃদ্ধ হাসলেন।

একজন মাঝি বলল, 'তাই তো আমরা এলাম। রাত হয়েছিল, ঢেউ বাড়ছিল, তবু আপনাকে নিয়ে যেতে না এসে পারলাম না। এতদিন পরে আপনি এই দারুচিনি ছেড়ে যাবেন, আমরা না এলে আপনার কষ্ট হত।'

বৃদ্ধ মিলনকে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, এদের আর দেরি করাব না!'

মাঝি বলল, 'আমরা বুঝে গিয়েছিলাম ইনি আপনার জায়গায় আসছেন। আচ্ছা বাবু, মাঝে-মাঝেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

বৃদ্ধ জলে নামতে যাচ্ছিলেন নৌকায় উঠবেন বলে। মিলন পেছন থেকে বলল, 'যাওয়ার সময় আমাকে কোনও উপদেশ দিয়ে যাবেন না?'

হাসলেন বৃদ্ধ, 'একা থাকতে হবে। কিন্তু এই গাছগাছালি পাখিদের সঙ্গে কথা বলবেন। দেখবেন ওরা কথা বোঝে। চোখ-কান খোলা রাখবেন। কাউকে আঘাত করবেন না, তাহলে দেখবেন সবাই আপনাকে বন্ধু বলে ভাববে। চলি।'

নৌকার ইঞ্জিন চালু হল। দেখতে-দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল সেটা। আকাশে তাকাল মিলন। চাঁদ হাসছে।

এখন থেকে এই দ্বীপের দেখাশোনা তাকেই করতে হবে। সেটাই চাকরি। কিন্তু বৃদ্ধ বলে গেলেন না তিনি কোথায় থাকতেন! এতগুলো বছর নিশ্চয়ই কেউ খোলা আকাশের নীচে কাটাত না। অফিস থেকে বলা হয়েছে, সেসবের ব্যবস্থা আছে।

এম.এ. পাস করেও বেকার দশা চলছিল। দুটো টিউশনির টাকায় হাতখরচ চলে। বিভিন্ন অফিসে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্তের-পর-দরখাস্ত দিয়েও কোনও ডাক আসছিল না। সেই সময় কাগজে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। 'পরিদর্শক চাই। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন জরুরি নয়।' ফোন নাম্বার ছিল। ফোন করতেই বলা হল দেখা করতে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তার দুই ছেলে ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। বৃদ্ধই কথা বলছিলেন। এম.এ.-র সার্টিফিকেট দেখে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন না আমরা কোন কাজের জন্যে লোক চাইছি!'

সে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, সে জানে না।

'এমন কাউকে চাইছি যে অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে। তাকে থাকতে হবে একটি নির্জন দ্বীপের মতো জায়গায়। গাছপালা, পশুপাখিদের ভালোবাসতে হবে। সপ্তাহে একদিনের বেশি মানুষের সঙ্গ পাবে না।' বৃদ্ধ বলেছিলেন।

'কী কাজ করতে হবে?' সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ওই দ্বীপের তিরিশ একর জমির মালিকানা আমাদের। ধান বাদ দিয়ে বছরকমের ফসল ওখানে হয়। আছে বেশ কিছু মূল্যবান গাছ। এছাড়া মুরগি এবং হাঁস প্রতিপালিত হয়। প্রতি সপ্তাহে যে নৌকা ওই দ্বীপে যায় তাতে যেমন দিনযাপনের প্রয়োজনীয় বস্তু পাঠানো হয় তেমনি দ্বীপ থেকে পাওয়া ফসল, ডিম ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়। একমাত্র বর্ষার সময় সমুদ্র-নদী উচ্ছল হলে নৌকা বন্ধ থাকে। পরিদর্শকের কাজ এই সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে দেখা। আর হ্যাঁ, কায়িক পরিশ্রমের জন্যে একটি লোক ওখানে আছে। কিন্তু সে কথা বলতে পারে না। আপনি কি এইরকম নির্জনে চাকরি করতে যেতে চাইবেন?

এক মুহূর্ত চিন্তা করেছিল সে। গাছপালা সে ভালোবাসে। কিন্তু একদম একা থাকা কি সম্ভব? যে লোকটিকে সে পাবে সে তো কথাও বলতে পারে না। কতদূরে সেই দ্বীপ? প্রশ্নটা করতেই বৃদ্ধ বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে সেখানে পৌঁছাতে হবে। তখন সে জানতে পারল দ্বীপের নাম দারুচিনি। সঙ্গে-সঙ্গে অপূর্ব এক ভালোবাসায় আক্রান্ত হল সে। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

'বেশ। একটাই শর্ত আছে, যদি আপনার মন না টেকে তাহলে অন্তত দু-মাসের নোটিশ না দিয়ে চলে আসতে পারবেন না।'

'আমি রাজি।'

'আগেই বলেছি, আপনার জীবনধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস প্রতি সপ্তাহে নৌকো পৌঁছে দিয়ে আসবে। বর্ষার মুখে সেগুলো কয়েক মাসের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতে হবে, এর জন্যে কোনও দাম আপনাকে দিতে হবে না। এছাড়া আপনাকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ব্যাংকে যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে সেটা খুলে দিচ্ছি। প্রতি মাসের এক তারিখে সেই অ্যাকাউন্টে আপনার টাকা জমা পড়বে। আর কাজে যোগ দেওয়ার সময় আপনাকে যে টাকা রাহাখরচ বাবদ দেওয়া হবে তা বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে না।'

'এখন ওখানে কি কেউ নেই?'

'আছেন। দীর্ঘকাল উনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার পরে তাঁর শরীর অশক্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। আপনি দ্বীপে পৌঁছলে তিনি ফিরে আসবেন।'

তারপর সাতদিন কেটেছিল। এই চাকরি নিয়ে রওনা হয়েছিল মিলন। একবছর ওখানে থাকলেই ব্যাংকে ষাট হাজার টাকা জমে যাবে। খুশি হয়েছিল সে।

নৌকাটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বৃদ্ধের সঙ্গে ভালো করে কথা বলা গেল না। গেলে জেনে নিতে পারত এখানকার সুবিধে-অসুবিধেগুলো। কিন্তু এত বছর থাকার পর বৃদ্ধ চলে গেলেন, অথচ সেই বোবা লোকটি তাকে বিদায় জানাতে এল না কেন? এই বোবা লোকটি কে, কোথায় বাড়ি, এখানে কতদিন আছে, তার কিছুই অফিস থেকে জানায়নি তাকে।

এই সময় হাওয়া উঠল। সমুদ্রের বুক থেকে শোঁশোঁ শব্দে সেই হাওয়ারা ছুটে এসে

গাছগাছালিকে প্রবলভাবে নাড়াতে লাগল। এই সুটকেস, বাজারভরতি ব্যাগ সামলে কোনদিকে যাবে বলে মিলন যখন দ্বিধায়, তখন সেই লোকটিকে দেখতে পেল। লোকটি একা নয়, তার পাশে চার হাত-পায়ে দৌড়ে আসছে একটা বিশাল সাইজের হনুমান। সামনে এসে লোকটা নীচু হয়ে মাথায় হাত ঠেকাল। মিলন অবাক হয়ে দেখল, হনুমানটা লোকটাকে নকল করল। তারপর বোঝাটা পিঠেয় তুলে সুটকেস ডানহাতে নিয়ে লোকটা হাঁটা শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা হাঁটার পরে একটা ঘর দেখতে পেল মিলন। ঘরের পাশেই চারটে লম্বা খুঁটির ওপরে আর একটা ঘর। মাটি থেকে অন্তত তিরিশ ফুট উঁচু নিশ্চয়ই হবে। সেই ঘরে পৌঁছবার জন্যে বাঁশের সিঁড়ি খুঁটির সঙ্গে জোড়া রয়েছে।

বাজারের ব্যাগটা নীচের ঘরে নিয়ে গেল লোকটা। তারপর সুটকেস নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। হনুমানটাও লাফাতে-লাফাতে সিঁড়ি ভাঙল।

নীচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মিলন দেখল, ভেতরে একটা লম্ফ জ্বলছে। তার আলোয় বুঝতে পারল এখানেই বৃদ্ধ রান্নাবান্না করতেন। কাঠের উনুন, বাসনপত্র, বালতিতে জল ভরা আছে। এই জল নিশ্চয়ই সমুদ্র থেকে নিয়ে আসা হয়নি। এখানে খাওয়ার জলের ব্যবস্থাটা কী জানা দরকার। কিন্তু লোকটাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। ওই হনুমানটার মতোই ও কথা বলতে পারে না।

দুটো বড় হাঁড়ির ওপর থালা চাপা ছিল। ও দুটোর ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে থালা সরাতেই একটায় ভাত অন্যটায় মাছের ঝোল দেখতে পেল মিলন। মাছের সঙ্গে কয়েকটা ডিমও আছে। দরজায় শব্দ হতে মুখ ফিরিয়ে বোবা লোকটাকে দেখতে পেল। পরনে একটা খাকি হাফপ্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। বয়স চল্লিশের ওপরেই। লোকটা হাত মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, মিলন খাবে কিনা? মিলন মাথা নাড়তেই ঘরে ঢুকে বালতি থেকে এক মগ জল তুলে এগিয়ে দিল। মিলন অনুমান করল লোকটা জল দিচ্ছে হাতমুখ ধোওয়ার জন্যে।

ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে অন্যমনস্ক হয়ে মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'এই জল কোত্থেকে নিয়ে আস? এখানে টিউবওয়েল আছে?'

লোকটা হাত নেড়ে দূরের একটা কিছু দেখাতে লাগল। কিন্তু সেখানে টিউবওয়েল আছে কিনা বুঝতে পারল না মিলন। তবে এই জল বেশ ঠান্ডা এবং মিষ্টি। এবার লোকটা তাকে ইশারায় ওপরে উঠে যেতে বলল। সিঁড়িতে বসে হনুমানটা তাকে লক্ষ করছিল। মিলনকে এগোতে দেখে নেমে পড়ল।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে অবাক হয়ে গেল মিলন। ঘরটা ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার। দুদিকে দুটো জানলা রয়েছে। একপাশে পরিষ্কার বিছানা পাতা, অন্যপাশে একটা জলচৌকি। কোনও চেয়ার-টেবিল নেই। সুটকেসটাকে সে দেখতে পেল জলচৌকির পাশে। এই টঙের ওপর বৃদ্ধ থাকতেন? ওই শরীর নিয়ে এত ওপরে উঠতে পারতেন?

সে জানলার সামনে যেতেই বহুদূর পর্যন্ত দ্বীপটাকে দেখতে পেল। গাছগাছালির পর মাঠমতো জায়গা। তার পরে ছোটখাটো পাহাড়। শব্দ কানে আসতেই মিলন পেছন ফিরে তাকাল। লোকটি থালাভরতি ভাত আর বড় বাটিভরতি মাছ এবং ডিমের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকে জলচৌকির ওপর রাখল। হেসে ফেলল মিলন। একেই বোধহয় বলে বেড়াল ডিঙোতে না পারা ভাত। সে বলল, 'অত ভাত আমি খেতে পারব না। এটাকে অর্ধেক করে দাও।'

লোকটি অবাক হল। হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল, এটা এমন কিছু বেশি নয়। তারপর নীচে নেমে গেল। মিলন দেখল হনুমানটা তাকে পিটপিট চোখে দেখছে। সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তোর নাম কী?'

হনুমানটা যেন লজ্জা পেল। একপাশে অদৃশ্য হল সে।

এবার লোকটা আর-একটা হাঁড়ি আর-এক মগ জল নিয়ে ওপরে উঠে এল। মিলন জলচৌকির

সামনে বসে অনেকটা ভাত হাঁড়িতে তুলে দিয়ে নিজের পাতে মাছ ডিমের ঝোল ঢেলে নিয়ে বলল, 'আর কিছু লাগবে না আমার। তুমি যেতে পার।'

জিনিসগুলো নিয়ে লোকটা নেমে গেলে ভাতে হাত দিল মিলন। ঝোলভাত মুখে দিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এমন চমৎকার রান্না যে কেউ করতে পারে তা সে আন্দাজই করেনি। নিশ্চয়ই বৃদ্ধ এই রান্না তার জন্যে রেখে গিয়েছেন। একা থাকতে-থাকতে উনি অনেক কিছু শিখে ফেলেছিলেন নিশ্চয়ই।

পেট ভরতি হয়ে গিয়েছিল। মগ থেকে জল খেয়ে বাকিটায় হাত-মুখ ধুয়ে নিল জানলার বাইরে মাথা গলিয়ে। তারপর থালা এবং মগ দরজার পাশে রেখে খেয়াল হল মগে এখনও জল রয়েছে। রাত্রে যদি প্রয়োজন হয় তাই সে মগটাকে তুলে চৌকির ওপর রেখে সুটকেস খুলে একটা বারমুডা বের করে পোশাক পালটে নিল। এখানে আর প্যান্ট-শার্টের দরকার নেই। বারমুডা আর গেঞ্জিতেই বেশি সহজ হয়ে থাকা যাবে।

পরিশ্রান্ত ছিল সে। শুয়ে পড়তেই আরাম হল। জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছে প্রচুর। ঘুম এল চটপট।

ঘুম ভাঙল আচমকা। ভাঙতেই কান্নাটা শুনতে পেল সে। কাছাকাছি কেউ অদ্ভুত নরম গলায় কাঁদছে। সারা শরীরের রোমকূপগুলো রোমাঞ্চিত হল মিলনের। ওটা যে-কোনও প্রাণীর কান্না তো বুঝতে একটু সময় লাগল। এই আওয়াজেই তার ঘুম ভেঙে ছিল।

সে বিছানা থেকে উঠে জানলায় এল। জ্যোৎস্নায় চারপাশ ভেসে যাচ্ছে। গাছের পাতাগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনও প্রাণীকে চোখে পড়ল না। কান্না যেদিক থেকে ভেসে আসছিল, সেদিকে ভালো করে লক্ষ করলেও জঙ্গলের আড়াল থাকায় সে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু এই কান্নাটা এমন যে গা-ছমছম করে ওঠে।

এই সময় অনেক দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতে থাকা প্রাণীটির সুর বদলে গেল। বেশ উত্তেজনার সঙ্গে অভিমান মিশিয়ে সে জানান দিতে থাকল তার অস্তিত্ব। দূর থেকে ক্রমশ কাছে চলে এল দ্বিতীয় প্রাণীর আওয়াজ। তারপর চুপচাপ হয়ে গেল চরাচর। শেয়াল নয়, মিলনের মনে হল ওরা নেকড়ে জাতীয় প্রাণী। তাহলে এই দ্বীপে হিংস্র কিছু প্রাণী আছে? তিরিশ একর জমির বাইরে দ্বীপের যে অংশ, তা কতখানি তা সে জানে না। দ্বীপের বিপরীত প্রান্তে সমুদ্র আছে না দীর্ঘ হয়ে কোনও ভূখণ্ডে মিশে গেছে সেটা জানতে হবে। একটা রাতজাগা পাখি বীভৎস চিৎকার করতে-করতে উড়ে গেল। পাখিটার আকৃতি বাজপাখির চেয়ে বড়। মিলনের মনে হল জায়গাটা একেবারে নিরামিষ নয়। বেশ বৈচিত্র্য এখানে ছড়িয়ে আছে। সে আবার রূপসী জঙ্গলের দিকে তাকাল। চারধার এখন শান্ত। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। জানলা থেকে সরে আসার সময় সেই বড় পাখিটাকে দেখতে পেল সে। একটু নীচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওই দুই পায়ের মধ্যে ছটফট করছে খরগোশ জাতীয় কোনও প্রাণী। ওটা বড়সড় মেঠো ইঁদুর হলেও হতে পারে। পাখিটা জঙ্গলে মিলিয়ে গেলে মিলন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন এই দ্বীপে ঝোড়ো বাতাস বইছে। এই টঙের ওপর ঘরে ঈষৎ দুলুনি। শুয়ে-শুয়ে জানলার বাইরে তাকাল সে। আকাশের রং কীরকম ঘোলাঘোলা। এখন ক'টা বাজে? সুটকেসের ওপর খুলে রাখা ঘড়িটাকে দেখতে আলস্য লাগল তার। ঠিক তখনই হনুমানটা ওপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকে মিলনের পায়ের কাছে বসে দাঁত বের করে চেঁচাতে লাগল। তারই মধ্যে ঘরের মেঝেতে হাত দিয়ে চড় মারতে লাগল। গতরাত্রে যাকে শান্ত বলে মনে হয়েছিল তাকে এরকম কাণ্ড করতে দেখে অবাক হয়ে উঠে বসল মিলন। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

প্রশ্নটা কানে যেতে শান্ত হয়ে গেল হনুমানটা। তারপর একবার নীচের দিকে গিয়েই ওপরে উঠে এল। মিলন অবাক হল। কিন্তু হনুমানটা ওই কাজ বারবার করে যাওয়াতে ওর মনে হল,

তাকে নীচে নেমে যেতে বলছে ও। সে উঠে দাঁড়াতেই মাথা নেড়ে সোজা নীচে চলে গেল হনুমান।

সিঁড়ির মুখে এসে মিলন বুঝল, বেলা হয়ে গিয়েছে। সূর্য অনেক ওপরে চলে গেছে। যেহেতু ঈষৎ মেঘ জমেছে আকাশে তাই রোদ ওঠেনি। হাওয়ারা নীচ দিয়ে বইছে বলে মেঘগুলো নড়ছে না।

ব্রাশে পেস্ট মাখাতে-মাখাতে খেয়াল হল, টিউবটা পেস্টশূন্য হয়ে গেলে ব্রাশ করবে কী দিয়ে? অবশ্য নৌকা এলে মাঝিদের বলে দেওয়া যায় বিন্দু-বাজার থেকে নতুন পেস্ট কিনে নিয়ে আসার জন্যে।

টয়লেট কোথায়? প্রশ্নটা মনে আসতেই হেসে ফেলল মিলন। এরকম নির্জন দ্বীপে সে টয়লেট খোঁজ করছে? মগের জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে সে ওখানকার গাছের আড়ালে গিয়ে জল বিয়োগ করল। গ্রামাঞ্চলে লোকে মাঠেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করত। কিন্তু তার সেই অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি।

লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। হনুমানটাও উধাও। ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খাওয়া তার অভ্যাস। রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কোনও ব্যবস্থাই তার চোখে পড়ল না।

জায়গাটাকে ভালো করে দেখার জন্যে সে পা বাড়াল। একটু পরে বাঁ-দিকে এবং ডানদিকে তারের বেড়া দেওয়া খাঁচা। খাঁচাগুলোতে অনেকগুলো মুরগি ঘুরছে। ওপাশের খাঁচার দরজা খোলা। সেখানে কেউ নেই।

একটু এগোতেই সবজির খেত দেখতে পেল। সদ্য সবুজ পাতা মাটি থেকে মুখ তুলেছে। এগুলো যে লোকটির পরিশ্রমের ফসল তাতে সন্দেহ নেই। এদিকে কলাগাছের সারি, অন্যদিকে ডাব-সুপুরির গাছ। এইসব পরিদর্শনের জন্যে তাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ঘুরতে-ঘুরতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

মিলন দেখল লোকটা জঙ্গলের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে, সঙ্গে হনুমানটা। লোকটার হাতে বেশ মোটাসোটা খরগোশ ঝুলছে। সদ্য মারা হয়েছে ওটাকে। তাকে দেখে দাঁত বের করে হেসে খরগোশ ওপরে তুলে দেখাল লোকটা। তারপর চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

অস্বস্তিতে পড়ল মিলন। এখনও পর্যন্ত খরগোশের মাংস কীরকম খেতে তা সে জানে না। শহরে খরগোশের মাংস পাওয়াও যায় না। কিন্তু ওই প্রাণীটির চেহারা এত আদুরে যে ওকে মেরে মাংস খাওয়ার কথা ভাবলেই খারাপ লাগে।

একবার বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল ওর। সে হরিণ মেরে মাংস খাওয়ার বিরোধী। কারণ হরিণ অত্যন্ত সুন্দর, অসহায় এবং দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এক বন্ধু বলেছিল, 'তাহলে হায়েনা অত্যন্ত কুৎসিৎ, ধূর্ত এবং দেখলেই মনে বিরাগ আসে বলে তার মাংস খেতে হবে? মুরগিও তো আদুরে দেখতে। কোনও-কোনও মোরগ রীতিমতো সুন্দর। তাহলে তার মাংস খাস কী করে।'

আর-এক বন্ধু এক ধাপ এগিয়ে বলেছিল, 'তাহলে আর ইলিশ মাছ খাব না। ওরকম সুন্দর, অসহায় এবং আদুরে দেখতে আর কোনও মাছ নেই।'

শেষপর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মাছের মতো আদুরে প্রাণী খুব কম আছে এবং সেই কারণে মিলনের মাছ খাওয়া উচিত নয়। এসব কথার প্রতিবাদ সেদিন মিলন করতে পারেনি।

তিরিশ একর জমি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি খুঁটি পোঁতা আছে। তার পরেই জঙ্গলের শুরু। মিলন জঙ্গলে ঢুকবে কিনা ভাবছিল। কাল রাত্রে যাদের চিৎকার কানে এসেছিল তারা যদি হিংস্র হয় তাহলে—। পেছনে আওয়াজ শুনে সে দেখল, লোকটা ফিরে আসছে। সঙ্গে হনুমান। হনুমানের হাতে একটা বড় লাঠি। বেশ কসরৎ করে লাঠিটাকে বয়ে নিয়ে আসছে প্রাণীটা।

হনুমানের হাত থেকে লাঠি নিয়ে মিলনকে দিল লোকটা। তারপর ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, সে জঙ্গলের ভেতরে যেতে চায় কিনা?

মিলন মাথা নাড়তে সে কয়েক পা এগিয়ে হনুমানকে ইশারায় ওপরের দিক দেখাল। মিলন

দেখল হনুমান তরতর করে নারকেল গাছের ওপরে উঠে গিয়ে গোটা কয়েক কচি ডাব ছিঁড়ে নীচে ফেলে দিল।

লোকটা তার একটা কুড়িয়ে কোমরে হাত দিতে মিলন ছুরিটাকে দেখতে পেল। দড়ি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধা আছে ওটা। দড়ি খুলে ছুরি দিয়ে ডাবের মুখটা কেটে লোকটা এগিয়ে দিল মিলনের দিকে।

চায়ের বদলে ডাবের জল খেয়ে পেট শুধু ভরেই গেল না, বেশ তৃপ্তি হল। জল মিষ্টি এবং ঠান্ডা। লোকটা আর-একটা ডাব এগিয়ে দিতে সে আপত্তি জানাল। পেটে হাত দিয়ে বোঝাল পেট ভরে গেছে।

মিলন অবাক হয়ে দেখল লোকটা শুধু নিজেই ডাবের জল খেলো না, হনুমানটাকেও খেতে দিল। হনুমান দু-হাতে ডাব মুখের ওপর ধরে জল খাচ্ছে না, অনেকটা কাটা ডাবে মুখ ডুবিয়ে জল চোঁ করে খেয়ে নিল। মিলনের মনে হল, ও আর জন্তু নেই।

জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলার পথ। লাঠি থাকায় দুপাশের ডাল-পাতা সরিয়ে হাঁটতে সুবিধে হচ্ছিল। মিলন বুঝতে পারছিল ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে ওরা। অর্থাৎ টিলার দিকে এগোচ্ছে। মাথার ওপরে একগাদা বানর চিৎকার শুরু করেছে অথচ হনুমানটার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

একসময় লোকটা দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে ইশারায় ডাকল। মিলন দেখল সামনে আচমকা জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে। লোকটার পাশে পৌঁছাতেই সে অবাক হয়ে গেল। সামনেই বিশাল খাল। সমুদ্র থেকে সেটা ভেতরে ঢুকছে। খালের দুপাশে জঙ্গল। এদিকটা বেশ উঁচু বলে জল দেখতে হচ্ছে নীচের দিকে তাকিয়ে। লোকটা হাত তুলে কিছু দেখাতে চাইল। দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারছিল না মিলন। আর-একটু এগিয়ে গিয়ে মনে হল, জলের ওপর কিছু ভাসছে, যা জঙ্গলের আড়াল থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কী?'

লোকটা প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। তারপর হাত নেড়ে ওদিকে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু মিলনের আগ্রহ ওই নিষেধের জন্যেই বেড়ে গেল। জঙ্গল এবং জলের মধ্যে যে চিলতে ন্যাড়া জায়গা রয়েছে সেটা ধরে সে এগোল। লোকটা পেছন-পেছন আসছে কিন্তু তার মুখ থেকে যে গোঙানি বের হচ্ছে সেটা যে আপত্তির, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না মিলনের। কী আছে ওখানে যে লোকটা যেতে দিতে চাইছে না?

একটা জায়গা অবধি এসে লোকটা আর এগোল না। মিলন আর কাছাকাছি গিয়ে দেখল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটা জল থেকে বেশ উঁচুতে। কিন্তু এবার জঙ্গলের আড়ালে পড়ে থাকা বস্তুটির বাইরে বেরিয়ে আসা প্রান্ত দেখে ওর সন্দেহ থাকল না ওটা ছোট লঞ্চ জাতীয় জলযান।

এরকম জায়গায় কে জলযান লুকিয়ে রাখবে? লুকিয়ে রাখছে তার কারণ ওর নব্বই ভাগই জঙ্গলের আড়ালে রাখা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়। এমন হতে পারে ওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে ওর মালিক। কিন্তু ওর কাছে যেতে লোকটা এত ভয় পাচ্ছে কেন? এই অর্থহীন ভয় কি বৃদ্ধ ওর মনে ঢুকিয়েছেন? এখানে এতদিন যখন ছিলেন তখন বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ওর অস্তিত্বের কথা জানেন। তিনি কেন একটা কল্পিত ভয় লোকটার মনে ঢোকাবেন?

প্রায় আধঘণ্টা ধরে অনেক কসরৎ করে নীচে নেমে এসে মিলন দেখল তার অনুমান সত্যি। এটা একটা ছোটখাটো লঞ্চ। লঞ্চে উঠতে হলে একটু কাদাজল পেরুতে হবে। পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে গেল। লঞ্চের গা ঘেঁসে অল্প জলের মধ্যে শুয়ে আছে বিশাল আকারের কুমির। সম্ভবত কুমিরও তার অস্তিত্ব টের পেয়ে গিয়েছে। সামান্য নড়ে পাড়ের দিকে মুখটা ঘোরাল ওটা।

মিলন এতক্ষণে বুঝতে পারল কেন লোকটা নিষেধ করছিল তাকে। এই খাড়ির মতো বিরাট

খালে নিশ্চয়ই প্রচুর কুমির আছে। লঞ্চে যেতে চাইলে কুমিরের পেটে চলে যেতে হবে। যদি একটা লম্বা কাঠের পাটাতন নিয়ে আসা যায় যা বাড়ি থেকে লঞ্চের ডেক পর্যন্ত সেতু তৈরি করবে তাহলেই কুমিরকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। হঠাৎ সামনের জলে আলোড়ন হল। মিলন জলের ওপরে কয়েকটা কুমিরকে নাক উঁচিয়ে স্থির হয়ে ভাসতে দেখল।

ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল সে। তাকে উঠে আসতে দেখে দূরে দাঁড়ানো লোকটার মুখে হাসি ফুটল।

সূর্য মাথার ওপরে আসার সময়েই দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। ভাত, মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল। তাকে খাবার দিয়ে লোকটা একটা ঝুড়ি হাতে তারের জালের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'আঁ, আঁ, আঁ।'

গোঙানির আওয়াজ চারপাশে ছড়িয়ে যাওয়া মাত্র অদ্ভুত কাণ্ড হল। আশেপাশের গাছগাছালি, ঝোপ থেকে দলেদলে মুরগি-মোরগ দৌড়ে চলে এল, ঢুকে গেল খাঁচার ভেতরে। লোকটা তাদের উদ্দেশ্যে ঝুড়ি থেকে শস্যদানা তুলে ছড়িয়ে দিতে লাগল। মুরগিগুলো হুটোপুটি করে খেতে লাগল। খাবার দেওয়া শেষ হলে খাঁচার দরজা বন্ধ করে ওদের গুনতে আরম্ভ করল লোকটা। গোনা শেষ হলে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল।

মিলন লক্ষ করল হনুমানটা এখন লোকটার সঙ্গে নেই। ওটা কোথায় গেল? উত্তরটা পেতে দেরি হল না। প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করতে-করতে কয়েকটা হাঁস ছুটে আসছিল। আর তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল হনুমান। দ্বিতীয় খাঁচায় ওরা ঢুকে গেলে লোকটা ওই খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটা যে চালাঘরে থাকে, সেটা দেখতে পেল মিলন। মাটির ওপর একটা বাঁশের মাচায় বিছানা পাতা। দেওয়াল নেই, মাথায় অবশ্য ছাউনি আছে।

জীবনে প্রথমবার স্নান না করে ভাত খেয়েছে মিলন। খেয়েছে খুব খিদে লেগেছে বলেই। স্নান করতে হলে সমুদ্রে নামতে হবে। অথচ এই সমুদ্রে কুমির অথবা হাঙর আছে কিনা জানা নেই।

লোকটাকে কাছে ডেকে এক মগ জল দেখিয়ে সে ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, এই জল কোথায় পাওয়া যাবে? সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তাকে নিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। মিনিট কয়েকের মধ্যে ওরা টিলার কিছুটা ওপরে উঠে এল। একটা বড় পাথরের পাশ থেকে নীচের জল ওপরে উঠে আসছে! তারপর ঝরনা হয়ে বয়ে যাচ্ছে খাড়ির জলে মিশে যেতে। এই জলই নিয়ে যায় লোকটা। শুধু খাওয়ার জন্যে নয়, শস্যখেতেও এই জল নিয়ে গিয়ে ছড়ায় সে। মিলন মাথা নাড়ল। সমুদ্রের জলে নিশ্চয়ই চাষ করা যায় না, ফলে লোকটাকে খুব পরিশ্রম করতে হয় দিনভর।

মিলন ঠিক করল, বিকেলে এখানে এই ঝরনায় এসে স্নান করে নেবে।

তারপর সে ঘুরে-ঘুরে মালিকের সম্পত্তি দেখে নিল। খাতা-কলমে এগুলো নথিবদ্ধ করতে হবে। কাল থেকে কাজটা শুরু করবে সে।

ফিরে আসার সময়ে সে একটা গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা মই দেখতে পেল। কাঠের মই, বেশ শক্ত। বোঝাই যাচ্ছে নৌকোয় নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। মইটাকে দেখে তার মাথায় বুদ্ধিটা চলে এল। সে দেখল লোকটা কাছেপিঠে নেই, বোধহয় ফিরে গেছে তার কাজে। সে মইটাকে তুলে বুঝল ওটা তেমন ভারী নয়। একহাতে মই অন্যহাতে লাঠি নিয়ে সে ধীরে-ধীরে জলের কাছে পৌঁছে গেল। এখনও সূর্য অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আকাশে থাকবে।

সে লক্ষ করল বিশাল কুমিরটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত গভীর জলে নেমে খাবার খুঁজছে ওটা। মইটাকে সে সেতুর মতো লঞ্চ এবং মাটির ওপর শুইয়ে দিল। লঞ্চের ডেক নীচে হওয়ায় সিঁড়িটা তেরচা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নাড়িয়ে চাড়িয়ে সেটাকে ঠিকঠাক দাঁড় করিয়ে

লাঠি হাতে নিয়ে প্রথম ধাপে পা দিতেই জলে প্রবল শব্দ হল। দাঁড়িয়ে গেল মিলন? সেই ভয়ঙ্কর চেহারার কুমিরটা ভেসে উঠেছে। তার চোখ মিলনের দিকে। কিন্তু জল থেকে দূরত্বটা এত দূরে যে সে মিলনের নাগাল পাবে না।

ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে নেমে এল মিলন। নেমে বুঝতে পারল লঞ্চ মোটেই ছোট নয়। বাইরে থেকে গাছপালার আড়াল থাকায় এর আকার বোঝা যায়নি। কিন্তু ডেক থেকে লঞ্চে ঢোকার দরজা বন্ধ।

দূর থেকে লাঠির প্রান্ত দিয়ে দরজাটা ঠেলতে সেটা খুলল না। কিন্তু অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজ একটু কমতেই আবার জোর করে ঠেলল সে। দরজাটা একটু ফাঁক হল। এবং তখনই বেশ বড় সাইজের সাপের মাথা বেরিয়ে এল ওই ফাঁক দিয়ে।

দ্রুত লাঠি চালাল মিলন। সাপের মাথায় সজোরে আঘাত করা সত্ত্বেও প্রাণীটি আরও হিংস্র হয়ে শরীর বের করতে লাগল ডেকের ওপর। এখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার আগেই সাপের খপ্পরে পড়তে হবে।

মরিয়া হয়ে লাঠি দিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করতে লাগল সে। সাপটা বিশাল হাঁ করতেই লাঠির প্রান্ত ওর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ তৈরি করল। সাপটা যেভাবে শারীর বাড়াচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল লঞ্চটা এবার উলটে যাবে। কিন্তু একটু-একটু করে সেটা নেতিয়ে পড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েও কিছুক্ষণ লাঠিটা বের করল না মিলন। এত বড় সাপ সে কখনও দ্যাখেনি। যেমন লম্বা তেমনি মোটা। গায়ের রঙে কালোর ওপর সোনালি ছাপ। সাপের শরীরের অর্ধেকটাই ডেকের ওপর বেরিয়ে এসেছিল।

লাঠি বের করে বাকিটাকে টেনে আনতে হিমশিম খেয়ে গেল মিলন। তারপরে সমস্ত শক্তি দিয়ে সাপটাকে জলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। প্রথমে মাথার দিকটা ডেক থেকে ঝুলিয়ে দিতে সক্ষম হল। তারপর বাকি অংশটা যখন লাঠি দিয়ে ঠেলার চেষ্টা করছে তখন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

সেই ভয়ংকর চেহারার কুমিরটা লাফিয়ে জল থেকে অন্তত ফুট তিনেক উঁচুতে মুখ তুলে সাপের মাথাটা দাঁতে চেপে হড়হড় করে পুরো শরীরটা জলে নামিয়ে নিল। তার টানে লঞ্চটা টলমল হয়ে যাচ্ছিল। অন্তত পনেরো-ষোলো ফুট লম্বা সাপটা জলে পড়তেই কুমির গপগপ করে গিলতে লাগল তাকে। কিন্তু অত মোটা সাপকে গিলতে যে সময় সে নিচ্ছিল তার মধ্যেই আর-একটা কুমির এসে লেজের দিকটা গিলতে লাগল। তারপর দুজনেই নেমে গেল জলের নীচে।

লঞ্চ স্থির হলে মিলন দেখল সিঁড়িটা আর উঁচু থেকে নীচুতে নেই। ডেক অনেক ওপরে ভেসে উঠেছে বলে অল্প তেরচা হয়ে আছে সিঁড়িটা। অর্থাৎ সাপের ওজন কমে যাওয়ায় লঞ্চ কিছুটা ভেসে উঠেছে ওপরে। সে জলের দিকে তাকাল। কুমিরগুলোর পক্ষে কোনওমতেই লঞ্চের ডেকে উঠে আসা সহজ নয়।

কিন্তু সাপটা কি লঞ্চের ভেতরে একা ছিল? ওর সঙ্গী বা সঙ্গিনী তো থাকতেই পারে। থাকলে এত ঝাঁকুনি, সাপের হিসহিস আওয়াজ, লাঠির শব্দ পেয়ে তার তো বেরিয়ে আসার কথা। মিলন দরজায় শব্দ করল কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পেল না। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে সে ডেকে দাঁড়িয়ে ভেতরে কী আছে দেখার চেষ্টা করল। একটা লম্বা প্যাসেজ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। সাপটা সম্ভবত দরজার গায়ে শুয়েছিল তাই লাঠির ঠেলায় দরজা খোলেনি। ওর শরীরের চাপেই সেটা প্রথমে অনড় হয়েছিল।

সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকল মিলন। বিশ্রী বোটকা গন্ধ নাকে এল। প্যাসেজের শেষে একটা দরজা। দরজাটা বন্ধ এবং মাঝখানের বড় ছিটকিনি টেনে দেওয়া হয়েছে ওটা বন্ধ রাখার জন্যে। প্যাসেজের ডানদিকে আর-একটা দরজা। সেটাও বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছিটকিনি খুলে মুখ

বাড়াতে মিলন বুঝতে পারল এটা ইঞ্জিনঘর।

দ্বিতীয় সাপের হদিস পেল না সে। ইঞ্জিনঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী করে ইঞ্জিন চালু করা যায় তা বোঝার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, শেষপর্যন্ত আন্দাজ করে বোতাম টিপেও কোনও কাজ হল না। ঘরটি থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে দেওয়ালে ইলেকট্রিক মিটারের মতো বাক্স দেখতে পেল মিলন। বাক্সটার গায়ে একটা লিভার উঁচুতে তুলে রাখা আছে। লিভারকে নীচের দিকে টেনে নামিয়ে পাশের একটা সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে গেল চারপাশ।

আলোর তেজ দেখে মিলনের মনে হল ব্যাটারিটা এখনও ভালো কাজ করছে। সে প্যাসেজ এল। প্যাসেজের দেওয়ালের সুইচ টিপতে সেখানেও আলো জ্বলল। ভেতরে ঢোকার দরজার ছিটকিনিটা টাইট হয়ে গিয়েছিল। খুলতে কসরৎ করতে হল। দরজা খুলতেই আবার একটা প্যাসেজ।

তার গা-ঘেঁষে তারপর কয়েকটা ঘর। কোনও ঘরে রান্নার ব্যবস্থা করা আছে, কোনওটা শোওয়ার ঘর, কোনওটা বাথরুম। শোওয়ার ঘরের বিছানা এখনও বেশ পরিষ্কার। সবক'টা আলো জ্বেলে রান্নাঘরে ঢুকল সে। কোনায় একটা ফ্রিজ আছে কিন্তু সেটা খালি। ওপাশে গ্যাসওভেন এবং বাসনপত্র। বাঁ-দিকের দেওয়াল আলমারি খুলতেই অনেকগুলো কৌটো দেখতে পেল সে। কৌটোগুলো টিনফুডের, খোলা হয়নি।

এরকম একটা লঞ্চ পরিত্যক্ত করে কারা চলে গেল?

শোওয়ার ঘরে ফিরে গেল সে। কোনায় একটা টেবিল-চেয়ার। টেবিলের ওপর কয়েকটা বই, একটা ডায়েরি। পাশের ওয়ার্ডরোবে প্রচুর শার্টপ্যান্ট ঝুলছে। তার পাশেই একটা ছোট্ট সেলারে তিনটে স্কচ হুইস্কির বোতল। ওগুলো খোলা হয়নি। ডায়েরিটা খুলল মিলন। দ্বিতীয় পাতায় লেখা, মাই স্টেটমেন্ট। তার নীচে মাইকেল মুরহেড। তার পরের পাতা থেকে সুন্দর হাতের লেখা শুরু হয়েছে।

ডায়েরি নিয়ে সব আলো নিভিয়ে, দরজাগুলো ভালো করে বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে ডাঙায় উঠে এল মিলন। এখন ছায়া ঘনিয়েছে। সূর্য অস্তাচলে। সিঁড়িটা বয়ে নিয়ে মুরগির খাঁচার কাছে ফিরতেই লোকটা ছুটে এসে দু-হাত তুলে নাচতে লাগল। ও যে খুব খুশি হয়েছে, বোঝা যাচ্ছিল। হনুমানও ওকে দেখে লাফাতে লাগল।

সারাদিন স্নান হয়নি। যদিও এখন চাঁদের আলোয় চারপাশ পরিষ্কার তবু সেই ঝরনার কাছে যেতে সাহস হল না। যে সাপটা লঞ্চে বাসা বেঁধেছিল সে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসেনি। এই জঙ্গলে তার ভাইবোন নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া, কাল রাতে শোনা জন্তুর ডাক থেকে বোঝাই যাচ্ছে রাত্রে ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। যে জল বালতি ভরে লোকটাকে নিয়ে এসেছে, তা স্নান করে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আর লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ঝরনায় গিয়ে ওকে পাহারা দিতে বলে স্নান করতে সে পারবে না।

তখন সমুদ্রের কথা মনে এল। এখানে সারাদিন সমুদ্রের ঢেউগুলোর আওয়াজ একটানা হয়ে যায় বলে কান এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এতক্ষণ খেয়ালে ছিল না। মিলন ঠিক করল জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের জলে স্নান করবে। বেশি দূরে না গেলেই তো হল।

একটা গামছা নিয়ে বারমুডা পরেই সে চলে এল সমুদ্রের পাশে। আকাশ পরিষ্কার, ঢেউগুলো চকচক করছে চাঁদের আলোয়। এখন সমুদ্র বেশ শান্ত। একটা জায়গা বেছে নিয়ে জলে নামতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মিলন। বালির ভেতর একটা গর্তে কিছু জল জমে ছিল। সেখানে ছটফট করছে কোনও প্রাণী।

কাছে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সিনেমায় দেখেছে, টিভিতে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডেও বহুবার দেখেছে কিন্তু সামনাসামনি এই প্রথম দেখল সে। একটি বাচ্চা ডলফিন। নিশ্চয়ই জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ওপরে উঠে এসেছিল। জল নেমে গেলে আটকে গেছে এখানে।

শিশু ডলফিন সামনে একটা মানুষ দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। মায়া হল মিলনের। সে সন্তর্পণে ওটাকে তুলে ধীরে-ধীরে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দিল। দু-সেকেন্ড স্থির হয়ে থেকেই ছুট লাগাল গভীর জলের দিকে।

হেসে ফেলল মিলন। তারপর ধীরে-ধীরে কোমর জলে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট-ছোট ঢেউ আসছে তীরের দিকে। সে ডুব দিল। আঃ। কী শান্তি! দুদিন স্নান না করা শরীরটা শীতল জলের স্পর্শ পেয়ে যেন তৃপ্ত হল।

হঠাৎ খেয়াল হল, কে যেন বলেছিল এদিকে হাঙর আছে। কোনও হাঙর যদি জলের নীচ দিয়ে এসে তার পা কামড়ে ধরে তাহলে মৃত্যু নির্ঘাত। সে ধীরে পিছিয়ে আসতে জলে আলোড়ন হল।

ভয় পেয়ে দৌড়ে বালির ওপর পৌঁছে সে পেছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। হাঙর নয়, সেই বাচ্চা ডলফিনটার সঙ্গে দুটো বড় ডলফিন চলে এসেছে জলের ধার পর্যন্ত। বাচ্চাটা আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে। বড় দুটো নিশ্চয়ই তার মা-বাবা। তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে ওরা। মিলনের মনে হল ওই চোখে কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট।

একটু-একটু করে ডলফিনরা পিছিয়ে গেল। তিনজনেই কিছুটা জায়গা খালি রেখে ঘুরতে লাগল। ডলফিন থাকলে কি হাঙর আসে? মিলনের মনে হল ওরা তাকে স্নান করতে দেওয়ার জন্যে পাহারা দিচ্ছে। জলে নামল মিলন। মিনিট পাঁচেক স্নান করে ওপরে উঠে এসে গামছায় জল মুছতে-মুছতে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখল। একটা বড় ডলফিন তীরের কাছে এসে মুখ নেড়ে ছুড়ে দিল মাছটাকে। দিয়ে তিনজনেই সমুদ্রের গভীরে চলে গেল।

মাছটা বালির ওপর পড়ে লাফাচ্ছিল। প্রায় দেড় কেজি ওজনের ভেটকি মাছ। বাচ্চাটাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে ওর বাবা-মা কী এভাবে কৃতজ্ঞতা জানাল!

মাছটাকে ধরে নিয়ে এল মিলন। ওটাকে দেখে চোখ বড় হয়ে গেল লোকটার। খালি হাতে সমুদ্র থেকে কেউ এত বড় ভেটকি ধরতে পারে বলে তার জানা ছিল না। বারবার হাত নেড়ে জানতে চাইছিল, কী করে সে মাছটাকে ধরল?

গরম-গরম ভাতের সঙ্গে ভেটকি মাছ ভাজা আর মুরগির মাংসের ঝোল খেয়ে নিল মিলন। আজ নীচে রান্নাঘরেই খাওয়া সারল। খাওয়ার পরে মনে হল, মুরগির মাংস রান্না করা উচিত হয়নি লোকটার। সে অনেক চেষ্টার পর লোকটাকে বোঝাতে পারল কথাটা। লোকটা একগাল হাসল। তারপর খাঁচার দিকে হাত নেড়ে দুদিকে মাথা ঘোরাতে-ঘোরাতে না কথাটা বুঝিয়ে দিল। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করে দুটো হাত গুলতি ছোঁড়ার মুদ্রা করল। অর্থাৎ সে গুলতি দিয়ে কোনও পাখি মেরে সেটাকে রেঁধেছে।

মাংসটা ভালো ছিল। কথা বাড়াল না মিলন। লোকটা আজ খরগোশ রাঁধেনি।

টঙের ওপরের ঘরে কুপির আলোয় জলচৌকির সামনে বসে ডায়েরি খুলল মিলন। ওপরের তারিখটা আজ থেকে চার বছর তিন মাস আগের। কালো কালিতে মুক্তোর মতো ইংরেজি অক্ষরে লিখেছেন মিস্টার মুরহেড।

...আমরা ঠিক করেছিলাম উপকূল ঘেঁষে লঞ্চ নিয়ে যাব জাপানে। মায়নামারে বেশ সস্তায় লঞ্চটা পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু কার্লোস চমৎকার সাজিয়েছিল লঞ্চটাকে। ঠিক করেছিলাম, কোনও বন্দর পেলে সেখানে নেমে কাঁচা খাবার কিনে নিয়ে রান্না করে খাব। নইলে পর্যাপ্ত টিনের খাবার তো রইলই। কোনও অবস্থাতেই আমরা তীর থেকে কুড়ি কিলোমিটার বেশি সমুদ্রের গভীরে যাব না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করেছিলাম।

যেদিন রওনা হব তার দুদিন আগে কার্লোসের বান্ধবী সাবিতানি এসে উপস্থিত। ওরা ব্রাজিলের মানুষ। কিন্তু ইংরেজি চমৎকার বলে। সাবিতানি আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। দেখলাম কার্লোসেরও সেই ইচ্ছে। কিন্তু সাবিতানির ভিসা বা অন্য প্রয়োজনীয় কাগজ এত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব নয় বলে সে শুধু জাপানে ঢোকার জন্যে ভিসার ছাপ পাশপোর্টে করিয়ে নিল। ঠিক হল পথে কোনও দেশের ডাঙায় সে নামবে না। লঞ্চেই থাকবে।

লঞ্চের ট্যাঙ্ক ভরতি করে নেওয়া হল। এছাড়া কয়েকটা ক্যানেও তেল নিয়ে রাখল কার্লোস। পথে যেখানেই আমরা থামব, তেল নিতে পারব।

সকাল আটটায় আমরা রওনা হলাম। সুন্দর আবহাওয়া। তীর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূর দিয়ে আমাদের লঞ্চ আরামসে যাচ্ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগল। কার্লোসকে আমি বছর দুয়েক ধরে চিনি। হাসিখুশি, বছর পঁয়ত্রিশের পরিশ্রমী যুবক। কিন্তু সাবিতানি আসার পরে সে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। লঞ্চের যাবতীয় কাজ আমি আর কার্লোস করতাম। সাবিতানি দিনের বেলায় চোখে গগলস এঁটে ডেকের ইজিচেয়ার শুয়ে রোদ পোয়াত। সন্ধের পর মদের বোতল নিয়ে বসত। আমাদের লঞ্চে শোওয়ার জন্যে একটাই কেবিন।

আগে ঠিক করেছিলাম পালা করে আমি আর কার্লোস ঘুমাব। যেহেতু লঞ্চের ওপর নজর রাখার জন্যে একজনকে জেগে থাকা দরকার তাই এই ব্যবস্থায় শোওয়ার জায়গা নিয়ে কোনও সমস্যা হতো না। সাবিতানি এসে যাওয়ায় তাকে শোওয়ার কেবিন ছেড়ে দিতে হল। আমি ভেবেছিলাম কার্লোস তার বান্ধবীর সঙ্গে কেবিনটা ব্যবহার করবে। কিন্তু প্রথম রাতেই সে বলল, 'তুমি ইচ্ছে করলে কিচেনে ঘুমাতে পারো। বিছানা করে দিচ্ছি। আমি রাত্রে জাগব।'

আমি প্রতিবাদ না করে কিচেনেই ঘুমিয়েছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। কার্লোস আর সাবিতানির মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া চলছে। যেহেতু সেটা নিজেদের ভাষায় ওরা করছিল, তাই আমি একটুও বুঝতে পারলাম না। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় দেখলাম সাবিতানি তার কেবিনে ঘুমাচ্ছে। কার্লোস গালে হাত দিয়ে বসে আছে ডেকের ওপর। আমায় দেখে বলল, 'সাবিতানিকে নেক্সট পোর্টে নামিয়ে দেবে?'

'কেন?'

'ও থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

'কী হয়েছে বলো তো?'

'ও আমার বান্ধবী ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এখন বলছে ওকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে যদি না করি তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার ওকে দিতে হবে। কারণ ওই টাকা ও ধার করেছিল, শোধ দিতে হবে।'

'মেয়েটি তো সুন্দরী। বিয়েতে আপত্তি করছ কেন?'

'ডলারের কথা যদি না বলত তাহলে আমি ভেবে দেখতাম। কেউ যদি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায় তাহলে আমি মেনে নেব না।'

বেলা এগারোটায় সাবিতানি ডেকে বেরিয়ে এলে কার্লোস শুতে গেল।

একটা মিনি প্যান্টের ওপর ব্রা ছাড়া কিছু নেই ওর শরীরে। সাবিতানি হেসে বলল, 'গুড মর্নিং। কফি পাওয়া যাবে?'

হেসে বললাম, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। ইঞ্জিন ছেড়ে যেতে পারছি না। তুমি কি দয়া করে কিচেন থেকে বানিয়ে আনবে?'

একটু ভেবে হাসল মেয়েটা, 'তুমি বলছ, তাই নিয়ে আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কফি নিয়ে এল। তারপর আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলতে লাগল তাতে যে কেউ শুনলে ভাববে আমরাই প্রেমিক-প্রেমিকা।...

গল্পে জমে গিয়েছিল মিলন। কিন্তু পাতা ওলটাতেই সে অবাক হল। পরপর কয়েকটা পাতা সাদা। তারপর আবার লেখা শুরু হল।...

...ব্যাপারটা যে এভাবে ঘটবে, আমি কল্পনা করিনি। গত আড়াই দিনে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি কেউ। মৃত্যু আমাদের নিয়ে খেলা করে গেছে। সন্ধের মধ্যে আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল চাপচাপ মেঘে। তারপর ঝড় উঠল। সমুদ্র গেল খেপে। আমাদের লঞ্চটাকে বড়-বড় ঢেউ যেন আকাশে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তখনই একটা প্রপেলার ভেঙে গেল। এই অবস্থায় লঞ্চ চালানো বোকামি। ভোর পাঁচটাতেও আলো ফুটল না। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে ঝড় লঞ্চটা নিয়ে গিয়েছে সমুদ্রের আরও গভীরে।

সাবিতানির ক্রমাগত বমি হচ্ছিল। পরের দিন সমুদ্র একটু শান্ত হলে ওকে ওষুধ দিলাম। দ্বিতীয় প্রপেলারটা লাগাতে হিমশিম খেয়ে গেলাম আমি আর কার্লোস। লঞ্চ চলছিল খুব ধীরগতিতে। গতি বাড়াতে গেলেই বিকট শব্দ করছিল ইঞ্জিন।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আবার ঝড় উঠল। সাবিতানি শুয়ে ছিল তার কেবিনে। আমি ইঞ্জিনঘরে। কার্লোস ডেকে। হঠাৎ মনে হল লঞ্চটা জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। বিপুল জলরাশি আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঢেকে ফেলল। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার পরেই আবার ভেসে উঠল লঞ্চটা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, কার্লোস ডেকে নেই। চিৎকার করলাম! কিন্তু ঝড়ের শব্দের কাছে আমার গলার স্বর অসহায়। হাওয়ার টানে লঞ্চ কোথায় ছুটে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না।

শেষ রাতে ঝড় থামল। সমুদ্র একটু শান্ত হল। ডেকে বেরিয়ে এসে কার্লোসকে দেখতে পেলাম না। বুঝলাম জাহাজ যখন জলের নীচে চলে যাচ্ছিল, তখন প্রবল ঢেউ এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অথচ কার্লোসের তখন ওখানে থাকার কথা নয়। সাবিতানি না এলে ওর তখন কেবিনে ঘুমিয়ে থাকার কথা। মনে হল শরীর থেকে সমস্ত শক্তি কেউ বের করে নিয়ে গিয়েছে।

আমরা কোথায় এসেছি জানতে গিয়ে দেখলাম, কম্পিউটার কাজ করছে না। হার্ডওয়্যারের ব্যাপারটা কার্লোস জানত। টেবিলের ওপর ছিল ল্যাপটপটা, ছিটকে চলে গিয়েছে প্যাসেজে। জলেও ভিজেছে বেশ।

যেখানে লঞ্চ ডুবে যাব-যাব হয়েছিল, সেখানে ফিরে গিয়ে কার্লোসকে খুঁজতে চাইলেও কীভাবে যাব, বুঝতে পারছিলাম না। সাঁতার জানত কার্লোস। কিন্তু এই সমুদ্রে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া কতক্ষণ ভেসে থাকা সম্ভব?

বেলা বাড়ল। কিন্তু রোদ উঠল না। আকাশে আবার মেঘ জমছে। আমরা যখন লঞ্চে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম, তখন এরকম ঘটনা ঘটলে কী করব তার একটা ছক করেছিলাম। যেহেতু আমরা তীর থেকে বেশিদূরে থাকব না, তাই ঝড় উঠলেই তীর থেকে মাইল খানেকের মধ্যে চলে আসব। কিন্তু তীরে ভিড়ব না। ঢেউগুলো তীরে ভয়ঙ্করভাবে আছড়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনাটা যখন ঘটল তখন আচমকা সবকিছু আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল।

আমি ইঞ্জিন বন্ধ রাখলেও বাতাস লঞ্চটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে চললে দু-মাসেও আমাদের খাদ্যভাব হবে না এবং ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কোনও জাহাজ আমাদের উদ্ধার করবে। বেচারা কার্লোস! অভিযানের স্বপ্ন ও-ই আমাকে দেখিয়েছিল।

বেলা এগারোটা নাগাদ সাবিতানি ডেকে চলে এল, 'গুডমর্নিং। উঃ। কী ভয়ংকর ঝড়। আমার তো মনে হচ্ছিল আর বাঁচব না।'

আমি কোনও কথা বললাম না।

'তোমার বন্ধু কোথায়? কিচেনেও তো নেই।'

'খুঁজে দ্যাখো। যদি না পাও তাহলে বুঝতেই পারবে, ওর কী হয়েছে।' বেশ বিষণ্ণ গলায় বললাম আমি।

'ও গড!' দ্রুত লঞ্চটা ঘুরে এল সাবিতানি, 'লঞ্চে ও নেই।'

'কাল রাত্রে তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন ঢেউ এসে কার্লোসকে এখান থেকে সমুদ্রের বুকে নিয়ে গেছে।'

শানামাত্র দু-হাতে মুখ ঢেকে সাবিতানি চলে গেল ভেতরে।

বিকেল বেলায় দু-কাপ কফি আর চিজবিস্কুট নিয়ে ও এল ডেকে। বলল, 'নিশ্চয়ই পেটে কিছু পড়নি। খেয়ে শক্তি নাও।'

শোক, দুঃখ, কষ্ট যত প্রবল হোক সময় এবং সমস্যা তার ভার আস্তে-আস্তে কমিয়ে দেয় বলে বেঁচে থাকাটা সহজ হয়। কফি নিলাম।

'আমরা এখন কোনদিকে যাচ্ছি?' সাবিতানি জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না।'

'কম্পিউটার কী বলছে?'

'ওটা কাজ করছে না। কম্পাসের নির্দেশমতো আমরা এখন বে অব বেঙ্গলে চলে এসেছি। ঠিক যেদিকে যাওয়ার কথা তার উলটো দিকে।'

'কাছাকাছি কোন দেশের তীর?'

'হয় বাংলাদেশ, নয় ইন্ডিয়া।'

'তাহলে সেদিকেই চলো। আর তো তুমি জাপানে যেতে পারবে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু ইঞ্জিন চালালেই গরম হয়ে যাচ্ছে। স্পিড বাড়ালে বিশ্রী শব্দ উঠছে।'

'তুমি তাহলে এইভাবে থাকতে চাও?'

'যতক্ষণ না কোনও সাহায্য আসে। যা খাবার আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে।'

সন্ধে থেকে মদ্যপান শুরু করল সাবিতানি, ডেকের ওপর। দুটো টিনফুড গরম করে মুখ কেটে নিয়ে এসেছে, চাট হিসেবে খাবে বলে। আমাকেও খেতে অনুরোধ করল কয়েকবার। হঠাৎ কী মনে হল, হয়তো মন দুর্বল বা শরীর কাহিল হওয়ায় রাজি হলাম।

সন্ধে পার হলে সাবিতানিকে শুতে চলে যেতে বললাম। লক্ষ্মীমেয়ের মতো রাজি হল সে। সে শুতে চলে যাওয়ার পরে আকাশে কিছু উড়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হল। আজ জ্যোৎস্না নেই, চাঁদ মেঘের আড়ালে, তাই দেখতে পেলাম না কিছু। মনের ভুলও হতে পারে।

কিছুক্ষণ বাদে লঞ্চের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল সাবিতানির। আমি তাড়াতাড়ি ওর কেবিনে ঢুকে দেখলাম, বিছানার ওপর বসে কাঁপছে সে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে মরে যাব। লঞ্চটা ডুবে যাবে।'

'কিছু হবে না। ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

আমি ফিরে আসছিলাম। কিন্তু সাবিতানি চেঁচিয়ে বলল, 'না! তুমি যেও না। এখন তো ইঞ্জিন চলছে না। তুমি এখানে থাকলে আমি ঘুমাতে পারব।'

ভয় পাওয়া বাচ্চা মেয়েকে যেভাবে বড়রা সান্ত্বনা দেয় সেভাবে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।'

হঠাৎ সাবিতানি আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখ ঘষতে লাগল আমার বুকে। যদিও আমি অবিবাহিত, কিন্তু নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত নই। তবে বেশ কিছুদিন আমি কোনও কারণ ছাড়াই নিজেকে আর জড়াইনি। সেদিন ওই মাঝসমুদ্রে লঞ্চের কেবিনে যখন সাবিতানি আগ্রাসী

হল, তখন নিজের অজান্তেই সাড়া দিয়ে ফেললাম।

শরীরের ঝড় থেমে গেলে পাশাপাশি শুয়েছিলাম আমরা। সাবিতানি আমার মাথায় আঙুল বোলাচ্ছিল। হঠাৎ বলল, 'আমাকে তোমার ভালো লেগেছে?'

সঙ্গে-সঙ্গে কার্লোসের মুখ মনে পড়ে গেল আমার। সাবিতানি কি সেই পঞ্চাশ হাজার ডলার পাওয়ার জন্যে আমার ওপর ভর করতে চাইছে? উত্তর না দিয়ে চুপচাপ উঠে ডেকে চলে এলাম।

ডেকে পা দিয়ে আমি স্তম্ভিত। দূরে তটরেখা দেখা যাচ্ছে। অস্পষ্ট গাছপালার রেখা ফিকে অন্ধকারেও বুঝতে পারছি। ঝটপট ইঞ্জিনঘরে চলে গিয়ে ওটাকে চালু করলাম। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম তীরের দিকে। ইঞ্জিন চালু হতেই বিবস্ত্র অবস্থাতে সাবিতানি ছুটে এল, 'কী হল, ইঞ্জিন চালু করলে কেন?'

'আমরা তীরের কাছে পৌঁছে গেছি।' উল্লসিত হয়ে বললাম।

ছুটে ডেকে চলে গেল সে। তার পরেই সে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের সম্পর্কটা হওয়ায় কপাল ভালো হয়ে গেল। তাই না?'

আমি আপত্তি করলাম না।

তীরের দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। ওটাকে দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনও আগুন না জ্বলায় মানুষ আছে বলে মনে হল না। একটু-একটু করে এগিয়ে একটা চওড়া খাড়ি দেখতে পেয়ে তার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম লঞ্চটাকে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর প্রপেলারে কিছু জড়িয়ে যেতে জলে তোলপাড় হল এবং সেটা আটকে গেল। স্থির হয়ে গেল লঞ্চ। ওটাকে নাড়ানো যাচ্ছে না। ধীরে-ধীরে ঢেউয়ের ধাক্কায় ওটা সরে এল গাছগাছালির ভেতর। এসে আটকে স্থির হল।

নতুন জায়গা। হুহু করে পোকা ঢুকছিল আলো দেখে। তাড়াতাড়ি সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলাম। সাবিতানি পাড়ে নামতে চাইছিল। কিন্তু তাকে আমি নিষেধ করলাম। দিনের আলো ফোটার আগে নামা ঠিক হবে না। এই দ্বীপে হিংস্র জন্তু বাস করতে পারে।

সাবিতানি বলল, 'তাহলে চলো শুয়ে পড়ি। ভোর হতে দেরি আছে।'

আমি রাজি হলাম। কারণ মাটির গায়ে এসে যাবতীয় উদ্বেগ চলে গিয়েছিল। এমনকি কার্লোসের মুখটাও মনে পড়ছিল না।

সকাল হল। জানলা দিয়ে দেখে বুঝলাম, বেশ জঙ্গুলে দ্বীপ এটা। নিশ্চয়ই বাংলাদেশ অথবা ইন্ডিয়ার কোনও জায়গা। অনেকক্ষণ লক্ষ করে কোনও বন্য প্রাণীকে দেখতে পেলাম না।

সাবিতানি ডাঙায় ওঠার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি নিষেধ করলাম। যেহেতু জায়গাটা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই হুট করে পা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একটা বেলা অপেক্ষা করে দেখা যাক, আমরা এসেছি বলে এখানে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কিনা।

সাবিতানির এখন খুব আনন্দ। সে রান্না করতে গেল। জোরে-জোরে গান গাইছে। এখন আর কার্লোসের কথা তার মাথায় নেই।

আমি কাচের জানলাগুলোতে চোখ রেখেছিলাম। একটা দিক জঙ্গলের জন্যে দেখতে পাচ্ছি না। আর-এক দিকে শুধু জল। লক্ষ করলাম নদীতে, অবশ্য এটাকে নদী বলা যায় কিনা জানি না, কুমির আছে। মাঝে-মাঝেই তারা মুখ তুলছে আবার ডুবে যাচ্ছে। ইঞ্জিনঘরের জানলা দিয়ে তীরের একাংশ দেখা যাচ্ছিল। সেখানে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

সাবিতানি এল। এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'আচ্ছা, আমরা দুজনে যদি সারাজীবন এখানেই থাকি, তাহলে কেমন হয়?'

'সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে।' বললাম।

'কেন?'

'আমি ছাড়া কথা বলার লোক পাবে না। ক'দিনের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হবে। দুজন মানুষকে

শান্তিতে বাস করতে হলে কথা বলার আরও সঙ্গী দরকার।'

'তার চেয়ে মাইকেল বলো, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'না সাবিতানি। তোমাকে অপছন্দ কোনও পুরুষ করবে না।'

'কিন্তু আমি দেশে ফিরতে চাই না। গেলেই পঞ্চাশ হাজার ডলার শোধ করতে হবে। তার চেয়ে যদি এখানে থাকি তাহলে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।' সাবিতানি আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'কিন্তু এখানে বেশিদিন থাকলে খাবে কী?'

'কিচেনে যা আছে তাতে কয়েকমাস চলে যাবে। আমি না-হয় আর মদ খাব না। জঙ্গলে ঢুকলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবেই। নইলে আমরা চাষ করব। হরিণ, শুয়োর বা খরগোশ মারব। তুমি কিন্তু না করো না।'

এসব কথা শুনতে ভালো লাগছিল। এই দ্বীপে মানুষ আছে কিনা জানি না। বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর দ্বীপ আছে, যেখানে মানুষ থাকতে পারে না। এটা সেরকম হতে পারে। না থাকলে এখান থেকে ফিরে যাব কী করে? আর মানুষ থাকলে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া অথবা বাংলাদেশে যাওয়ার একটা উপায় হবে।

সাবিতানি আমাকে হঠাৎ আদর করতে শুরু করল। আমি মৃদু আপত্তি জানালাম, 'এসব এখন থাক।'

'না। এসো, আমরা মাটিতে পৌঁছেছি বলে সেলিব্রেট করি।'

দুপুরে খাওয়া শেষ করার পরেও বাইরে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব টের না পেয়ে সাবিতানি বলল, 'তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। চলো, এবার ঘুরে দেখি।'

আপত্তি করার আর কোনও কারণ না থাকায় এগিয়ে গিয়ে ডেকের দরজা খুললাম। চমৎকার হালকা রোদ ছড়িয়ে আছে নদীর ওপর। তীরের গাছপালায়। দেখলাম ডেক থেকে পাড়ে যেতে গেলে জলে নামতে হবে। সেটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। সাবিতানি বলল, 'কী সুন্দর জল। এসো স্নান করি।'

'মাথা খারাপ! ভালো করে লক্ষ করো।' হাতের ইশারায় ওকে দেখালাম।

দুটো বেশ বড় সাইজের কুমির এগিয়ে আসছে লঞ্চের দিকে। তাদের চোখ দুটো জলের ওপরে, আমাদের দেখছে।

সাবিতানি আঁতকে উঠল, 'সর্বনাশ। যদি আক্রমণ করে?'

'আমরা অনেক উঁচুতে আছি, নাগাল পাবে না। তা ছাড়া, নৌকো বা লঞ্চে থাকলে ওরা সাধারণত আক্রমণ করে না, কিন্তু জলে নামলে ছেড়ে দেবে না।'

'তাহলে আমরা পাড়ে যাব কী করে? লঞ্চটাকে আরও একটু ওপাশে নিয়ে যাওয়া যায় না?' সাবিতানি পরামর্শ দিল।

ইঞ্জিনঘরে ঢুকে লঞ্চটাকে চালু করতে চাইলাম। কিন্তু একটুও আওয়াজ হল না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলাম। কিছু একটা বিকল হয়েছে। কার্লোসের কথা মনে এল। ও থাকলে এখনই সারিয়ে ফেলতে পারত।

আবার ডেকে এলাম। সাবিতানি বলল, 'কী হল?'

'ইঞ্জিন গোলমাল করছে।'

'ও। এক কাজ করতে পারি। লঞ্চের ছাদে উঠলে ওই গাছটার ডাল ধরা যাবে। বেশ শক্ত ডাল। ওই ডাল ধরে সহজেই পাড়ে নেমে যেতে পারব।'

'ওই একইভাবে ফিরব।'

'যদি তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়, যদি কেউ তাড়া করে তাহলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক।'

আমি লঞ্চের স্টোররুম থেকে অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়িটা বের করে নিয়ে ডেক থেকে পাড়ে লাগাতে চেষ্টা করে দেখলাম, ওটা একটু ছোট হচ্ছে। কিন্তু ওই প্রান্ত জলের তলায় মাটিতে লাগালে দেখা গেল সিঁড়ির জলের ওপর ধাপ পর্যন্ত নেমে লাফিয়ে ডাঙায় ওঠা যাবে।

বললাম, 'কাছেপিঠে কুমির না থাকলে এভাবেই যাওয়া সহজ হবে।'

সাবিতানি খুশি হয়ে আমাকে চুমু খেল।

ডাঙায় নামার আগে মনে হল, একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মায়নামারের কাস্টমসের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কোনও আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে আনতে পারিনি। যদিও কার্লোসের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয়েছিল যে সে ওইরকম কিছু লঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করলে হেসেছিল, কিছু বলেনি। ঠিক করলাম লঞ্চের সম্ভাব্য লুকোনোর জায়গাগুলো পরে খুঁজে দেখব।

কুমিরগুলো পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছিল। আমি অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়িটা দেখিয়ে ওদের তাড়াতে চেষ্টা করলাম। ওরা একটু সরে গেল কিন্তু সেটা বেশি দূরে নয়। সাবিতানিকে বললাম, 'এখন চেষ্টা না করলেই ভালো, ওরা যদি ছুটে এসে সিঁড়িটাকে ধাক্কা দেয় তাহলে আর দেখতে হবে না।'

সাবিতানিও একমত হল।

আমরা ডেকের ওপর বসে গল্প করছিলাম। এমন নির্জন জায়গায় বিকিনি পরা সুন্দরী নারীর সঙ্গ পেতে ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ সাবিতানি উত্তেজিত হয়ে আমাকে এক ঝাঁক মাছ দেখাল। মাঝারি সাইজের মাছ, যার একটা আমাদের দুজনের পক্ষে দু-বেলার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু ওই মাছ ধরার কোনও ব্যবস্থা লঞ্চে নেই।

সাবিতানি বুদ্ধি বের করল। অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ির ফাঁকগুলোতে কাপড় এমনভাবে বেঁধে ফেলল যাতে দুটো ধাপের ভেতরের ফাঁকা অংশে ফুলে ফেঁপে থাকে সেটা। পরপর অনেকগুলো ধাপে কাপড় বেঁধে সে তৈরি হল। যেই আর-একটা মাছের ঝাঁক সে দেখতে পেল অমনি সিঁড়িটাকে জলের ভেতর তেরচা করে ডুবিয়ে দিল। জলের স্রোতে কাপড় বেলুনের মতো ফুলে গেল। মাছের ঝাঁকটা ওটাকে পাশ কাটালেও দুটো মাছ ওই কাপড়ের গর্তে ঢুকে গেল নির্বোধের মতো। অমনি সিঁড়ি ওপরে তুলে ডেকে নিয়ে এল সাবিতানি। এগুলোকে আমরা ক্যাটফিশ বলি। খুব সুস্বাদু। মাছ দুটো পালাতে চাইল, কিন্তু পারল না।

সাবিতানি বলল, 'আজ তোমাকে মাছ ভাজা খাওয়াব।'

খুশি হয়ে বললাম, 'দারুণ লাগবে।'

মাছ দুটোকে ভেতরে রেখে এসে সাবিতানি বলল, 'শোন, তুমি রাজি হয়ে যাও। এখানে খাবারের অভাব নেই। আমরা সারাজীবন শান্তিতে থাকতে পারব।'

রসিকতা করলাম, 'যখন ছেলেমেয়ে হবে?'

'ওরাও আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা যা জানি, সব ওদের শেখাব।'

সেই সন্ধেটা চমৎকার কেটেছিল। সাবিতানি মাছ রান্না করল। সঙ্গে হুইস্কি। ঢেউয়ের ধাক্কায় লঞ্চ দুলছিল। বুঝলাম ওটা জঙ্গলের ভেতরে আরও ঢুকে যাচ্ছে। আমি সিদ্ধান্তে এলাম, এই দ্বীপে মানুষ নেই। থাকলে এতক্ষণে তাদের দেখতে পেতাম। একটা লঞ্চ খাড়িতে ঢুকেছে দেখে তারা নিশ্চয়ই দূরে থাকবে না।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় যাওয়ার আগে সাবিতানি একবার ডেকে গেল রাত্রের

দৃশ্য দেখতে। আমি নিষেধ করেছিলাম। সন্ধের মুখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সে বলল, 'একটু ঠান্ডা হাওয়া মেখে আসি। তুমিও চল। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।'

হাতের কাজ সেরে আমি ডেকের দিকে পা বাড়ালাম।

দেখলাম লঞ্চের একেবারে প্রান্তে বসে আছে সাবিতানি। তার চোখ জলের দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল ওপরের গাছ থেকে কিছু একটা দ্রুত নেমে আসছে। আমি চিৎকার করতেই সাবিতানি ঘুরে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ মোটা মাথার সরীসৃপ জাতীয় কিছু সাবিতানির মুখ গিলে ওপরের দিকে টানতে লাগল। ওটা যে বিরাট আকারের সাপ, তা বুঝতে পেরে আমি অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়ি দিয়ে ওটাকে আঘাত করতে লাগলাম।

ততক্ষণে সাবিতানির কাঁধ সাপের পেটে চলে গেছে। গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে রেখে সে অনায়াসে গিলে ফেলছে মেয়েটাকে। আমি ছুটে গিয়ে সাবিতানির পা ধরে টানতে লাগলাম। কিন্তু ততক্ষণে ওর শরীর প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সাপটা এবার লঞ্চের ওপর শরীর নামাল। সঙ্গে-সঙ্গে লঞ্চ জলের নীচে অনেকটা নেমে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সাপের গলা থেকে পেটের ওপর পর্যন্ত চামড়া উঁচু হয়ে আছে।

এবার সাপটা আমার দিকে তাকাতেই আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু প্রথম দরজাটা বন্ধ করতে পারলাম না সাপের মাথা সেখানে চলে আসায়। ছুটে দ্বিতীয় দরজা বন্ধ করে এপাশে চলে এলাম। এই দরজা সাপের শক্তির কাছে কিছু নয়। হাতের কাছে যা পেলাম তা দিয়ে দরজাটাকে মজবুত করার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ দরজায় শব্দ হল। তারপর সব চুপচাপ। আমি শোওয়ার কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। চোখের সামনে সাবিতানির শরীর ভাসছিল। এই সাপটা এখানে এল কী করে? এ তো প্রায় অ্যানাকোন্ডা। এই ভূখণ্ডে ওর থাকার কথা নয়।...

কতক্ষণ কেবিনের বিছানায় মড়ার মতো পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম লঞ্চের সামনের দিকটা অনেকটা নীচু হয়ে গেল। ফলে পেছন দিকটা বেশ ওপরে ভেসে উঠেছে। এখনও গভীর অন্ধকার।

সকালে ইঞ্জিনঘরের মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম প্রতিদিনের অভ্যাসে। আলো জ্বালাতে গেলে ওখানে যেতে হবে। কিন্তু দরজা খুলে প্যাসেজে যেতে সাহস পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছিল, সাপটা এখন প্যাসেজের ওপর আস্তানা গেড়েছে। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমাকে ওই পথ দিয়েই বেরুতে হবে। আমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ও।

লঞ্চের এই অংশে বন্দি হয়ে কয়েকদিন থাকা হয়তো সম্ভব। কিন্তু ওপরের জলের ট্যাংক শূন্য হয়ে গেলে পাম্প চালাতে না পারলে সমস্যা শুরু হবে। যা খাবার আছে, তাতে বহুদিন চলে যাবে। হয়তো এর মধ্যে কেউ এসে উদ্ধার করতে পারে আমায়। আমরা জাপানে পৌঁছইনি দেখে কি খোঁজখবর করা হবে না? মিডিয়া নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। কিন্তু সমস্যা হল, আকাশ থেকে এই লঞ্চ জঙ্গলে ঢুকে থাকায় ওরা দেখতেই পাবে না।

রাতটা কেটে গেল।

একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছিল না। সাপটার যা শক্তি, তাতে ও স্বচ্ছন্দে দরজা ভেঙে এদিকে আসতে পারে। দরজা ভাঙা ওর পক্ষে খুব সহজ কাজ। কিন্তু সেই চেষ্টাগুলো ও করছে না। হয়তো সাবিতানির শরীরটা সম্পূর্ণ হজম না হওয়া পর্যন্ত ও আরাম করছে। একা কিনা তাও বুঝতে পারছি না। সাধারণত এই ধরনের সাপ একাই থাকতে ভালোবাসে। তবে বিশেষ সময় এলে সঙ্গিনীর খোঁজ করে।

এই ডায়েরি আমি কেন লিখছি, জানি না। কোনওদিন এটাকে সভ্য সমাজে নিয়ে যেতে পারব কিনা তাও জানা নেই। তবে আমি যদি না থাকি তাহলে যদি কারও হাতে পড়ে, সে বুঝতে পারবে আমি কীরকম মানসিক অবস্থায় রয়েছি।

দিন কাটল, রাতও। মাঝে-মাঝে জানলা খুলে উঁকি মেরে দেখেছি। জলে মাছের ঝাঁক। একটা কুমির সাঁতরে গেল। মনে পড়ল সাবিতানি দুটো মাছ ধরেছিল যার একটা সেইরাত্রে আমরা খেয়েছিলাম। ফ্রিজ খুলতেই দ্বিতীয় মাছটাকে দেখতে পেলাম। ভেতরটা বহুক্ষণ ইলেকট্রিক না থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা রয়েছে। কিন্তু মাছটাকে দেখে আমার খেতে ইচ্ছে করল না। যে ধরেছিল সে নেই। আমি জানলা দিয়ে মাছটা জলে ফেলে দিতেই কোত্থেকে একটা ছানাকুমির ছুটে এসে ওটাকে গিলে ফেলল।

পরদিন সকালের পর একটা কাণ্ড হল। লঞ্চ দুলতে লাগল, পেছনের এবং সামনের অংশ সমান হয়ে জলের ওপর আগের মতো ভাসল। অর্থাৎ সাপটা লঞ্চ ছেড়ে নেমে গিয়েছে।

আমি উত্তেজিত হলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। সাপটা যদি কিছু দূরে চলে যায়, তাহলে একটা সুযোগ আমি নিতে পারি। লঞ্চ ছেড়ে ডাঙায় নেমে গেলে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু যদি কোথাও থাকার জায়গা না পাওয়া যায় তাহলে এই লঞ্চেই ফিরে আসতে হবে আমাকে। তাই যাওয়ার সময় প্যাসেজের এদিকটার দরজা ভালো করে বন্ধ করে যাব। আর সময় নষ্ট না করে এবার উঠতে হবে।...

এরপর ডায়েরির পাতাগুলো একেবারে সাদা।

মিলনের খেয়াল হল প্যাসেজের শেষে ভেতরে যাওয়াটা দরজাটা সে বন্ধ দেখেছিল। মাইকেল মুরহেড নিশ্চয়ই আর লঞ্চে ফিরে যাননি। গেলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরিতে লিখতেন। যদি ডাঙায় পা দিয়ে থাকেন, তাহলে কিছুক্ষণ হেঁটে জঙ্গল পেরিয়ে এলে এই চাষের জমিতে পৌঁছে গেছেন। তখন বৃদ্ধ এবং কাজের লোকটি নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেছে।

সকালে কাজের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল মিলন। কিন্তু তার প্রশ্নের কোনও অর্থই লোকটা ধরতে পারল না। সে যা জিজ্ঞাসা করছে তার জবাবে মাথা নেড়ে না বুঝিয়ে যাচ্ছে লোকটা। তখন ইশারায় সে বোঝাতে চাইল। জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাল কেউ সেখান থেকে হেঁটে এসেছে কিনা? এবার সেই একই উত্তর—না।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আসার পর কখনও তিনজন মানুষ ছিলে?'

সে মাথা নেড়ে দুটো আঙুল দেখাল।

অর্থাৎ মাইকেল মুরহেড এখানে আসেনি। তাহলে কী হল তাঁর? তিনিও কি সাপের পেটে গিয়েছেন? অথবা কুমিরের? লঞ্চ থেকে নেমেছিলেন কীভাবে? অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়িটা তো চোখে পড়েনি তার। তাহলে কি সেই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কুমির তাকে জলে টেনে নিয়ে গিয়েছে? সিঁড়িটাও নিশ্চয়ই জলের তলায় তলিয়ে গেছে! একজন অচেনা মানুষের জন্যে মন বিষণ্ণ হয়ে গেল মিলনের।

কিন্তু কাজ শুরু করতেই হল! খাতায় এখানকার যাবতীয় গাছগাছালি, শস্য, হাঁস এবং মুরগি নথিভুক্ত করল। সামনের সপ্তাহে নৌকো এলে কী-কী বস্তু পাঠানো যেতে পারে তার একটা তালিকা করে লোকটাকে বোঝাল। এখানে বস্তা এবং পিচবোর্ডের বাক্স রাখা আছে। কী করে প্যাক করতে হবে, লোকটা জানে।

ঘুরতে-ঘুরতে জমির শেষপ্রান্তে এসে মিলন দেখল, পরপর কয়েকটা টিনের কৌটো রাখা আছে জঙ্গল বরাবর। কৌটোর ভেতর তরল পদার্থ যে অ্যাসিড তা বুঝতে অসুবিধে হল না। লোকটা সঙ্গে ছিল। হেসে হাত ভাঁজ করে সাপের ফণা দেখাল।

কাল জঙ্গলে যাওয়ার সময় সে লক্ষ করেনি। এখন লোকটা তাকে দেখাল। পাঁচ হাত দূরে-দূরে অ্যাসিড কৌটোয় রাখা হয়েছে। সম্ভবত কার্বলিক অ্যাসিড। লোকটা সাতটা আঙুল তুলে বোঝাল

সাতদিন অন্তর অ্যাসিড পালটে দেওয়া হয়।

এতক্ষণে স্পষ্ট হল। এই কার্বলিক অ্যাসিডের জন্যে জমিতে সাপ ঢুকতে পারে না। এই বিশাল সাপটিও নিশ্চয়ই কার্বলিক অ্যাসিড সহ্য করতে পারেনি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইভাবে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আজ দুপুরে খাওয়ার আগে সমুদ্রে স্নান করল মিলন। যখন প্রায় স্নান শেষ, তখনই ডলফিন তিনটে দেখা দিল। বাচ্চাটা তার শরীর ঘেঁষে চলে গেল। মিলনের খুব মজা লাগছিল। ওরা বোধহয় মাছ খেয়েই বেঁচে থাকে। অতএব ওদের খাওয়ার জন্যে সে কিছুই আনতে পারে না। সে পাড়ে উঠে গামছায় শরীর মুছতে-মুছতে দেখল, আজও একটা মাছ ছুড়ে দিল বড় ডলফিনের একজন। এটা একটা পেল্লাই পমফ্রেট মাছ।

মাছ দেখে লোকটা খুব খুশি। গতদিনের করা মাংসের ঝোল আর পমফ্রেট ভাজা দিয়ে তাকে খেতে দিল দুপুরে। বারংবার মাছ দেখিয়ে আঙুল নেড়ে জিজ্ঞাসা করছিল, কী করে মিলন ওটাকে ধরল? মিলন হাসল, কোনও জবাব দিল না।

সারাটা দিন ধরে নিজের এলাকা বুঝে নিয়েছে মিলন। নিতে গিয়ে মনে হয়েছে, এখানে আরও বেশি ফসল ফলানো সম্ভব। হাঁস-মুরগি ছাড়াও ছাগল এনে তাদের বংশবৃদ্ধি করার সুবিধে আছে। এবার নৌকো এলে মালিককে এসব বৃত্তান্ত চিঠি লিখে জানাতে হবে। বদলে বেশ কিছু জিনিস শহর থেকে আনানো দরকার। সেটার তালিকাও করতে হবে।

বিকেল নামতেই আকাশের চেহারা বদলাল। সমুদ্রের ওপর দূর দিগন্তে একটুকরো মেঘ হঠাৎ ঘনিয়ে গেল। অর্থাৎ আজ বৃষ্টি হবে।

বৃষ্টির কথা মনে আসতেই লঞ্চের কথা মনে এল। এখন ওখানে সাপ নেই। নিশ্চিন্তে সুন্দরভাবে থাকা যায় ওখানে। সে জঙ্গলের দিকে তাকাল। এর মধ্যে সেখানে ঘন ছায়া জমে গেছে। এই সময় জঙ্গলে পা রাখা ঠিক নয়। মিলন ঠিক করল কাল দুপুরের পরই সে লঞ্চে চলে যাবে।

সন্ধের পরেই ঝড় উঠল। টঙের ঘরে বসে সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড ভয় পেল মিলন। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঝড় ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে দ্বীপের ওপর। নারকেল গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যেন মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ টঙের ঘরটা কেঁপে উঠল। তারপর মাথার চালটা উড়িয়ে নিয়ে গেল দানববাতাস। টংটা যদি মাটিতে আছড়ে পড়ে তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেও থেমে গেল। ঝড় তার শরীরটাকে অবলীলায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। অন্ধকারে গাছ পড়ার আওয়াজ হল। মিলন তৈরি থাকল। যদি টং ভেঙে পড়ে তাহলে সে লাফ দেবে। তাতে হাত-পা ভাঙতে পারে কিন্তু টঙের তলায় চাপা পড়ে মরতে হবে না।

তারপর ধীরে-ধীরে ঝড়ের তাণ্ডব কমতে লাগল এবং তখনই সমুদ্রের গর্জন কানে এল। এখানে আসার পরে সমুদ্রের এমন গর্জন শোনেনি মিলন।

সে ধীরে-ধীরে নীচে নেমে এল। এসে অবাক হয়ে গেল। সমুদ্রের জল চলে এসেছে রান্নাঘরের পেছনে। এতটা ওপরে কী করে জল উঠে এল? রান্নাঘরের এবং স্টোররুমের অবস্থা শোচনীয়। দরজা ভেঙে গেছে, একখানা জানলাও। সে লোকটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। ও কথা বলতে পারে না বটে। কিন্তু গোঙানি তো মুখ থেকে বের হয়।

অন্ধকার ঝাপসা দেখাচ্ছে চারপাশ। এই সময় বৃষ্টি নামল হুড়মুড়িয়ে। রান্নাঘরের ভাঙা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মিলন। বৃষ্টি পড়ছে সপাটে। হঠাৎ মনে হল ঘরের অন্ধকারে কেউ নড়াচড়া করছে। ঝড়ের তাণ্ডবের সময় কোনও বন্যপ্রাণী এখানে আশ্রয় নিতেই পারে। ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে টঙের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে মাথা রক্ষা পেল।

সেই সময় বিদ্যুৎ-এর ঝলকানিতে সে দেখতে পেল রান্নাঘরে ভাঙা দরজায় নিরীহ মুখে হনুমানটা বসে আছে। তার মানে সে যে আওয়াজ পাচ্ছিল তা ওই হনুমানের কারণে।

ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থামলে সে সোজা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে হনুমানটা যেন আনন্দে লাফিয়ে-লাফিয়ে কিচিরমিচির শব্দ করতে লাগল। ভেতরে ঢুকে হাতড়ে-হাতড়ে কুপি আর দেশলাই খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালাতেই অবাক হয়ে গেল মিলন।

ঘরের এক এক কোণে মরার মতো পড়ে ঘুমাচ্ছে লোকটা। সে এগিয়ে গিয়ে জোরে ঝাঁকুনি দিতে কোনওমতে ঘুম ভাঙল। মিলন বলল, 'এত বড় প্রলয় হয়ে গেল আর তুমি ঘুমাচ্ছ?'

লোকটা খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে উঠে বাইরে এসে অদ্ভুত গলায় কাঁদতে লাগল। এই পাতলা অন্ধকারেও সে ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে পেয়ে গেছে।

মিলন দেখল, আকাশ ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা ফুটল। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হতাশ হল। তার শোওয়ার বিছানা ভিজে চপচপ করছে। ওগুলো সরিয়ে কাঠের ওপর চিৎ হয়ে শুতেই আকাশটা যেন চোখের সামনে চলে এল। অগুনতি তারা জ্বলজ্বল চোখে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। কে বলবে একটু আগে ঝড় এবং বৃষ্টি ওদের মুখ ঢেকে রেখেছিল!

সকাল থেকে মেরামতের কাজ শুরু করেছিল ওরা। মিলন দেখল লোকটার এই ব্যাপারে দক্ষতা আছে। টঙের ছাদটা উড়ে খানিকটা দূরে পড়লেও ভেঙে চৌচির হয়নি। সেটাকে কয়েক অংশে খুলে সিঁড়ি বেয়ে ও ওপরে নিয়ে এল। হাত মেলাল লোকটি। ধীরে-ধীরে ছাদ তার নিজের জায়গায় চলে এল। পেরেক পুঁতে সেটাকে শক্ত করল ওরা। ভেজা বিছানা রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর রান্নাঘরের দরজা নিয়ে ব্যস্ত হল লোকটা।

মিলন দেখল যে গাছগুলো পড়েছে, সেগুলো কেটে পরিষ্কার করতে কত করাতের প্রয়োজন। ওদের আর মাথা তুলে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই। তার চেয়ে কিছুদিন পড়ে থাকার পর শুকিয়ে গেলে কাটতে সুবিধে হবে।

হঠাৎ হনুমানটা একটা উঁচু গাছের ডালে বসে চিৎকার শুরু করল। সঙ্গে লম্ফঝম্প। ওর এই আচরণের কারণ বুঝতে পারছিল না মিলন। কিন্তু লোকটা দৌড়ে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। তার মুখ থেকে গোঙানি বের হল। ফিরে এসে উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে মিলনকে ডাকতে লাগল।

মিলন সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দেখল বহুদূরে কিছু একটা ভাসছে। এখান থেকে সেটা দেশলাই কাঠির চেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে না। তার পরেই সে বুঝতে পারল ওটা একটা নৌকো এবং এদিকে আসছে।

আজ নৌকো দ্বীপে আসবে, একথা তার জানা ছিল না। সে লোকটাকে ইশারায় বোঝাল প্যাক করা ডিম এবং ফলগুলো সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে আসতে। লোকটা সমানে মাথা নাড়তে লাগল। বোঝাল সেটা করার দরকার নেই। ওই নৌকা তাদের জিনিস নিয়ে যাওয়ার নৌকা নয়। মিলন বুঝতে পারল না এত দূর থেকে লোকটা বুঝছে কী করে। নৌকার তীরে ভেড়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করলে বোঝার উপায় নেই।

সমুদ্রের জল কাল রাত্রে বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এখনও ঢেউগুলোর চেহারায় রাগী ছাপ আছে। এই ঢেউ ভেঙে নৌকো কী করে আসবে সে ভাবতে পারছিল না।

হঠাৎ নৌকাটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। দিগন্তের কোথাও সেই কালো দাগটা নেই। তার পরেই সেটা ভেসে উঠল ওপরে। সেটা যে নৌকা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকটা এগিয়ে এসেছে ওটা। ঢেউ-এর দোলায় দুলছে, আড়ালে চলে যাচ্ছে আবার দৃশ্যমান হচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে যুদ্ধ করে নৌকাটা পাড়ের কাছে চলে আসতে লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পেল মিলন। ছ'টা পুরুষ এবং একটা মেয়ে ওখানে রয়েছে। বসে থাকা সত্ত্বেও চুল এবং শরীরের গঠন থেকে ও যে মেয়ে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। মেয়েটা কোথায় যাচ্ছে? এই

দারুচিনি দ্বীপের পরে তো কোনও জনবসতি নেই। আর এই দ্বীপেও মানুষ তো তারা দুজন।

আজ জল বেশি থাকায় নৌকো যখন বালি পর্যন্ত উঠে এল তখন উঠে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল মিলন।

নৌকা থেকে নেমে মেয়েটা বলল, 'ও। আপনারা বেঁচে আছেন।'

'মানে?'

'আমরা খবর পেয়েছিলাম আপনারা মরে গেছেন।'

'কে খবর দিল?'

'খবর বাতাসে উড়ে যায়। বাবা বলল, অফিসকে জানাতে হবে যে, লোকটা মরে গেছে বিদেশ বিভুঁইতে এসে। তাই জানাবার আগে তুই একবার দারুচিনিতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আয়। আমার তো একদম ইচ্ছে ছিল না আসার। শুধু বাবার কথা রাখতে আসতে হল। তাও যদি এই মাঝিরা বলত ঝড়ের পরের দিন এখানে আসবে না, তাহলে রক্ষে পেতাম। ওরা এককথায় রাজি হয়ে গেল বলে চলে এলাম।'

এর মধ্যে সত্যি কথা কতটুকু ঠাওর করতে পারল না মিলন। এই মেয়ে মিথ্যে ছাড়া সত্যি বলে না। তাহলে তাদের মরে যাওয়ার খবর বিন্দুতে পৌঁছায়নি। ওর বাবাও ওকে এখানে দেখে যাওয়ার জন্যে পাঠায়নি। তাহলেও ও এল কেন?

'তুমি এখানে কাজ করো?' লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি।

'ও কানে শুনতে পায় না। তাই আপনার সত্য বা মিথ্যে ওর কাছে এক।'

'মিথ্যে মানে? আপনার ধারণা আমি মিথ্যে বলি? অদ্ভুত লোক।' বলে মেয়েটি এগিয়ে গেল লোকটিকে ইশারা করে। সম্ভবত দ্বীপ ঘুরে দেখতে চায় সে।

মিলন মাঝিদের জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে কষ্ট হয়নি তো?'

'কষ্ট? প্রাণ হাতে করে এসেছি। মেয়েমানুষ এমন কান্নাকাটি করল যে, না বলতে পারলাম না। এখন তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে বিপদে পড়ব।'

'কীসের বিপদ?'

'ভাটার সময় সমুদ্র ভেতরে টানে।'

'কিন্তু ও বলল তোমরা এককথায় রাজি হয়ে এসেছ।' মিলন বলল।

'বিন্দুর মানুষ তো। তার ওপর মেয়েমানুষ। যে জানে সে বিন্দুতে বিয়ের সম্বন্ধ করে না। যাক গে, ওকে বলুন পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা কাজ, তা করে ফেলতে। জলে টান পড়েছে।'

মিলন সমুদ্রের তীর ছেড়ে ভেতরে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখতে পেল না সে। লোকটাও ধারে-কাছে নেই। রান্নাঘর, স্টোররুম, টঙের ঘর, কোথাও নেই। সে চিৎকার করল, 'আপনি কোথায়? মাঝিরা ডাকছে।' কিন্তু কোনও সাড়া এল না।

মুরগিরা যেখানে থাকে, তার তারের বেড়া নুইয়ে পড়েছিল। সেটাকে সোজা করতে কিছুটা সময় লাগল। কাল রাত্রের ঝড়ে মুরগি এবং হাঁসের কোনও ক্ষতি হয়নি। কারণ, ঝড় ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল।

মিনিট কুড়ি পরে ওদের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল মিলন। মেয়েটার দুই হাত বুকের ওপর কিছু সন্তর্পণে ধরে রেখেছে। কাছে এসে বলল, 'খুব আহত হয়েছে পাখির ছানাটা। আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, বাঁচিয়ে রাখলে আপনার মঙ্গল হবে।'

মিলন বলল, 'তাড়াতাড়ি যান। মাঝিরা ডাকছে।'

'যাচ্ছি। এই জায়গাটা কেমন লাগছে?'

'খুব খারাপ।' একটু রেগে গিয়ে বলল মিলন।

'অ্যাতো ভালো জায়গা, কী সুন্দর গাছপালা, সমুদ্র, তবু আপনার খারাপ লাগছে? আপনারা,

যারা শহরে থাকেন, তারা যাচ্ছেতাই লোক।' মেয়েটি বলল।

'তাই নাকি! আপনি এখানে কতদিন থাকতে পারবেন?'

'সারাজীবন। কিন্তু বাবা থাকতেই দেবে না।' বলেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমার নামটা মনে আছে আপনার?'

মাথা নাড়ল মিলন, 'না' ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল সে।

'তা তো থাকবেই না। আমার নাম ঝিনুক। আর ভুলবেন না কিন্তু।'

'আপনি কিন্তু স্টেশনে এসে অন্য নাম বলেছেন।'

'ইস্! কী যে বলে! আমি ঝিনুক, ঝিনুক, ঝিনুক।'

'আপনার জন্য মাঝিরা—।'

'অপেক্ষা করে থাকবে।'

লোকটি চলে গিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ দৌড়ে এল। এসে হাত নেড়ে গোঙাতে লাগল। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছে ও?'

মিলন দ্রুত সমুদ্রের ধারে চলে এল। পাড় ছেড়ে নৌকা ততক্ষণে চলে গিয়েছে অনেক দূরে। বড়-বড় ঢেউ মাঝে-মাঝেই তাকে আড়াল করছে।

সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভাটার ভয়ে ওরা অপেক্ষা করে থাকল না!'

'ওমা! তাই তো! এখন কী করে যাব?' ঝিনুক করুণচোখে তাকাল।

'আবার নৌকা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি সাঁতরে যেতে পারেন তাহলে—।'

'আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চান?'

'আপনাকে আমি অনেকবার বলেছি। আপনি কেয়ার করেননি।'

ঝিনুক তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে বোতাম টিপল। তারপর মাথা নাড়ল, 'দুর। এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না।' সেটটা বন্ধ করে পকেটে রেখে বলল, 'একবস্ত্রে থাকতে হবে এখানে। খেতে পাওয়া যাবে?'

'আমরা যা খাই, তাই পাবেন।'

'শুনুন। আমি একজন অল্পবয়সি মেয়ে আর আপনারা দুজন পুরুষ। হনুমানটাকে নিয়ে ভয় নেই। ওটা মেয়ে হনুমান। দেখবেন, আমার সম্মান যেন হানি না হয়। যদি সেই চেষ্টা করেন, তাহলে বিন্দু পেরিয়ে ট্রেনে উঠতে এ জীবনে পারবেন না। মনে থাকবে তো?' ঝিনুক তাকাল।

'খামোকা আপনার সম্মান নষ্ট করব কেন?'

'ছেলেদের বিশ্বাস নেই। যাক গে, আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

মিলন লোকটিকে ইশারায় বোঝাল ঝিনুকের খিদে পেয়েছে। ওকে ডিম সেদ্ধ বা ডিমের ওমলেট করে দিতে। লোকটা চলে গেল।

এখন সূর্য অনেকটা পশ্চিমে ঢলেছে। ঝিনুক জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় ঘুমাব? কোন ঘরে?'

'জানিয়ে এলে একটা চেষ্টা করা যেত। এখন হয় রান্নাঘরে ঘুমাতে হবে। নয়তো টঙের ঘরে।'

'টঙের ঘরে মানে?'

মিলন তাকে টঙের নীচে এনে দেখাল। ঝিনুক ঘাড় উঁচু করে দেখে বলল, 'ওখান থেকে পড়ে যাব না তো?'

'না! বরং অত উঁচুতে ঘুমালে নিরাপদে থাকবেন। উঠে দেখুন।'

ঝিনুক ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঘর দেখে আনন্দে চিৎকার করল, 'খুব ভালো!

আপনি ওপরে আসবেন?'

'এখন না।'

রান্নাঘরে গিয়ে লোকটাকে বোঝাল মিলন, তাকে কী-কী করতে হবে। দুটো ডিম সেদ্ধ আর এক বাটি মুড়ি নিয়ে ওপরে উঠে গেল লোকটা। পেছন-পেছন হনুমানটাও।

হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল মিলনের। ওটা যে একটা হনুমতী, হনুমান নয় তা তার নজরে পড়েনি। কিন্তু প্রাণীটা আর একটু ওপরে উঠতেই সে হাঁ হয়ে গেল। ওর যৌনাঙ্গ বলছে ও অবশ্যই হনুমান। তার মানে ঝিনুক তখন মিথ্যে বলেছে। কীভাবে অবলীলায় মিথ্যে বলে যায় মেয়েটা?

মিলন মনস্থির করল। মেয়েটা যখন টঙের ঘরে থাকবে, তখন সে নিশ্চিন্তে লঞ্চে চলে যেতে পারে। আর দেরি করলে অসুবিধে হবে। সেই শক্ত লাঠিটা খুঁজে বের করে সে হাঁটতে শুরু করতেই দেখল হনুমানটা তরতর করে নেমে তার পেছন-পেছন আসছে। জমির সীমা পার হওয়ার সময় তার নজরে পড়ল সাপটাকে। অ্যাসিডের কৌটোর পাশে মরে পড়ে আছে কালো লম্বা সাপটা। এটা কেউটে জাতীয় কিছু। হনুমানটা সেই সাপ দেখে চেঁচাতে লাগল। মিলন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

লাঠি দিয়ে গাছের ডাল সরিয়ে-সরিয়ে সে খাড়ির কাছে যখন পৌঁছাল তখন সূর্য ডুবতে চলেছে। এখনও আলো আকাশে, গাছের মাথায়। কিন্তু দিক ঠিক করতে না পেরে সে লঞ্চ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

আর একটু এগোতেই বেশ বড়সড় চেহারার দুটো জন্তুকে উলটোদিকে ছুটে যেতে দেখল। বেশ ভয়ে-ভয়ে সে লঞ্চের কাছে পৌঁছে দেখল কাল রাত্রের ঝড়ে ওপরের গাছটা আরও নীচু হয়েছে।

একটা ডাল প্রায় নেমে গেছে ছাদের ওপর। সেই গাছ ধরে সে বেশ সহজে চলে এল ডেকের ওপর। সতর্ক হয়ে চারপাশে তাকাল। জলের কুমিরগুলো চারপাশ থেকে ছুটে এসে ভিড় করেছে লঞ্চের পাশে। কিন্তু সেই সাপের কোনও জোড়াকে দেখতে পেল না সে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই সেটা ভালো করে বন্ধ করল মিলন। ইঞ্জিনঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলল।

এত কাছে, বড়জোর পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটলে এমন আরামদায়ক লঞ্চে পৌঁছানো যায় জেনেও তার আগের বৃদ্ধ অথবা লোকটা এটাকে ব্যবহার করেনি শুধু সাপটার ভয়ে। লোকটা এখনও জানে না, সাপটা কুমিরের পেটে চলে গেছে।

মিলন ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়াল। ভালো করে দেখে স্টার্ট লেখা বোতামটা টিপতেই লঞ্চ কেঁপে উঠে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল। সে বড় হুইলটা বাঁ-দিকে ঘোরাতে লঞ্চ বাঁ-দিকে সরে এল। শব্দটা এত প্রবল যে তাড়াতাড়ি স্টপ লেখা বোতামটা টিপল সে। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশ চুপচাপ হয়ে গেল। মাইকেল মুরহেড ঠিকই লিখে গেছেন, ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে কিন্তু একদম বিকল হয়নি।

প্যাসেজের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে বন্ধ করল মিলন। জানলা দিয়ে দেখল, এখনও দিনের আলো মরেনি। সে রান্নাঘরে ঢুকে একটা টিনফুডের কৌটো তুলে নিল। তারপর টিনকাটার বের করে সেটাকে কাটতে যেতেই ছাদে শব্দ হল। যেন কেউ লাফিয়ে নামল।

সতর্ক হল মিলন। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান জন্তু ছাড়া কেউ লঞ্চের দরজা ভাঙতে পারবে না। সাবিতানিকে যে সাপটা হজম করে ইঞ্জিনঘরের পাশের প্যাসেজে বাসা বেঁধেছিল তার পক্ষে ভেতরের দরজা ভেঙে মুরহেডকে আক্রমণ করা অতি সহজ ছিল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ দেখায় তার মাথা কাজ করেনি।

শব্দটা এগিয়ে গেল সামনে। মাথায় ওপরে লঞ্চের ছাদে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখতে যাওয়া নির্বোধের কাজ হবে।

গ্যাস জ্বেলে টিনের খাবার গরম করে খাওয়া শুরু করল মিলন। ঝাল নেই, নুনও কম। এ ধরনের খাবার সে আগে খায়নি। খেতে ভালো লাগছিল না। কিন্তু খাবারটা একটুও নষ্ট হয়নি বলে জোর করে শেষ করল সে।

এখন অন্ধকার নেমে গেছে। শুলেই ঘুম আসবে না। হঠাৎ নজরে পড়ায় মিলন একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে দেখল, মেড ইন স্কটল্যান্ড। তাহলে একেই স্কচ হুইস্কি বলে?

একটা গ্লাসে সামান্য তরল পদার্থ ঢেলে বোতলের মুখ বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিল মিলন। তারপর চুমুক দিল। প্রথমবার গিলতে গিয়ে মনে হল গলা দিয়ে আগুনের গোলা নামছে। সে মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হল। সে আর-এক চুমুক দিল। এবার গলায় আগের মতো তাপ লাগল না।

সে একটা মোমবাতি খুঁজে বের করে ওটাকে জ্বালাল। এই লঞ্চে মুরহেডরা প্রচুর মোমবাতি আর লাইটার রেখেছিল। ইঞ্জিনঘরে গিয়ে সুইচ অফ করে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে গ্লাস তুলল সে। বেশ মৌজ আসছে। এখন লঞ্চে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু মোমবাতির আলোয় আরও বেশি মজা লাগছে।

হঠাৎ জানলায় শব্দ হতে চোখ গেল সেদিকে। কাচের বাইরে লম্বা কিছু ঝুলছে। সাপ? সে কাচের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে দেখল যেটা ঝুলছে সেটা লোমে ঢাকা।

ওটা নড়তেই হেসে ফেলল মিলন। লেজ। নিশ্চয়ই হনুমানের লেজ। অর্থাৎ লঞ্চের ছাদে হনুমানরা আসর জমিয়েছে। গ্লাস শেষ করতেই কেমন ঘুমঘুম ভাব এসে গেল। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল মিলন।

গোটা রাত একটানা ঘুমিয়ে যখন সে চোখ মেলল, তখন সবে দিনের আলো ফুটেছে। কাল রাত্রে খুব সামান্য ঘুম হয়েছিল। সারাদিন নানান টেনশনে কেটেছিল। তাই এতটা ঘুম ঘুমাতে পারল ভাবতেই হুইস্কির কথা মনে এল। এই ঘুম কি হুইস্কির সৌজন্যে?

জানলার কাছে চলে এল সে। জলের ওপর নদীর আলো সুন্দর দৃশ্য তৈরি করেছে। নদীতে প্রচুর মাছ আছে। সাবিতানি যদি ধরতে পারে, তাহলে তারও পারা উচিত। কিন্তু কোনও ঝুঁকি নিয়ে নয়।

জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এখানে আনা হয়নি। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখল সে। আঙুল দিয়ে চুল ঠিক করে নিল। এখানে থেকে সে রোজ ভোরে জমির কাজ দেখতে যেতে পারে। বিকেলের পর ওখানে কিছু করার নেই। তাই তখন ফিরে এসে এখানে রাতটা আরামে কাটানো যায়। মিলন সেটাই করবে বলে ঠিক করল। তারপর কিচেনে গিয়ে গ্লাসে জল গরম করে টি-ব্যাগ আর চিনি ফেলে দিয়ে চা বানিয়ে ফেলল। ভালোই লাগল খেতে।

ওদের হনুমানটাই ওর খবর দিল। তাকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে চিৎকার করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছিল সে খুব খুশি হয়েছে। ওর চিৎকার শুনে লোকটি ছুটে এল। হাত-পা নেড়ে অবোধ্য শব্দে প্রশ্ন করতে লাগল যার একটা সরল অর্থ, কোথায় গিয়েছিলে রাত্রে?

মিলন ওর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। এই সময় কানে এল, 'তাহলে আপনি বেঁচে আছেন।'

ঝিনুকের কথা ওর খেয়ালই ছিল না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'হলে আজ সকালে কী সুরাহা করতেন?' মাথা ঝাঁকাল, 'ধরুন কাল রাত্রে এই লোকটি আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল। এখন শুনে কী করবেন?'

'আমি অবিশ্বাস করব।' জবাব দিল মিলন।

'বাঃ! তাহলে তো কোনও দায় নিতে হয় না। কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে? আমি অবশ্য সকালে জানতে পারলাম আপনি ছিলেন না!'

'ও আপনাকে এসে বলায় জানলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী ভাষায় বলল?'

'হাত নেড়ে। বোবারা যেভাবে বোঝায়।' ঝিনুক বলল, 'নিশ্চয়ই ওই জঙ্গলের ওপাশে কোনও আদিবাসীদের গ্রাম আছে। সেখানকার কোনও মেয়ের সঙ্গে এই দুদিনেই ভাব জমিয়ে নিয়েছেন।'

'কী করব বলুন। এই জনমানবশূন্য জায়গায় একা থাকা যায়!'

'চমৎকার।' হনহন করে চোখের সামনে থেকে সরে গেল ঝিনুক। ডিমের ঝোল আর অল্প ভাত দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াল লোকটা। ঝিনুক ওই টঙের ওপরের ঘরে চলে গেছে। সেখানে তার খাবার পৌঁছে দিতে হল।

আজ আলু লাগানো হল। প্রায় দশ কাঠা জমি মসৃণ করে আলু চাষের জন্যে উপযুক্ত রাখা হয়েছিল। স্টোররুম থেকে বস্তাবন্দি কনকে ওঠা আলু আধ হাত ব্যবধানে পুঁতে দিল লোকটা। মিলন তদারকি করল। কাজ শেষ হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। এবার লোকটা গেল দুপুরের খাবার রান্না করতে। মিলন টঙের দিকে তাকাল। কীরকম মায়া তৈরি হল মনে। সে ওপরে উঠে দেখল, ঝিনুক চিত হয়ে শুয়ে আছে।

'শরীর ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞাসা করল মিলন।

'বেঠিক হলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন!' শুয়ে-শুয়ে জবাব দিল ঝিনুক।

'আপনি আমার ওপর অযথা রাগ করছেন।'

'মোটেই না। নিজেকে অতটা দামি ভাববেন না।'

'মানে?'

'আমি আলতুফালতু লোকের ওপর রাগ করি না।'

'খুশি হলাম।'

'আমার শরীর খারাপ।'

'ও। তাহলে আপনি রেস্ট নিন।' নামার জন্যে নীচে পা নামাল মিলন। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসল ঝিনুক, 'রেস্ট নিয়ে-নিয়ে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে থাকা যায়?'

'ও। তাহলে ওই লোকটার সঙ্গে হাত মেলান না। ও এখন রান্না করছে। আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো রান্না করেন।' মিলন বলল।

'না। খুব খারাপ রান্না করি বলে কেউ খেতে চায় না।'

'তাহলে একটু পরে মুরগিগুলোকে ডেকে খাইয়ে বেড়ার ভেতর নিয়ে আসুন। এটাও একটা কাজ।'

'আপনি এখন কী করবেন?'

'স্নান করব।'

'স্নান? কোথায়?'

'সমুদ্রে।'

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল, 'আমিও স্নান করব। কাল থেকে গায়ে জল না দিয়ে বিশ্রী লাগছে।'

এক মুহূর্তে ভাবল মিলন, তারপর বলল, 'আপনি তো সঙ্গে কিছু আনেননি, কীভাবে স্নান করবেন?'

'এখানে বাথরুম নেই?'

হেসে ফেলল মিলন, 'না।'

'উঃ। যতদিন আবার নৌকা না আসবে ততদিন এইভাবে থাকতে হবে?'

'ওপাশে জঙ্গলের গায়ে একটা ঝরনা আছে। পাখি ছাড়া কিছু নেই ওখানে। নিরাপদে

জামাপ্যান্ট ছেড়ে স্নান করতে পারেন।'

'অসম্ভব। ওই লোকটা আছে, হনুমানটা আছে।'

'ওটা তো মেয়ে হনুমান, আপনি বলেছেন।'

নেমে এল মিলন।

বারমুডা পরে আরামসে স্নান করতে-করতে মিলনের খেয়াল হল, ডলফিনদের আজ দেখা যাচ্ছে না। এটা কেন হল? কাল রাত্রের ঝড়, সমুদ্রের উত্তাল হওয়ার সঙ্গে কি ওদের না আসার কোনও সম্পর্ক আছে? হয়তো জোয়ারের সময় বালির ওপরে উঠে এসেছিল, আর ফিরে যেতে পারেনি, অবশ্য সেটা বাচ্চাটার ক্ষেত্রে হতে পারে, মা-বাবা ওই ভুল করবে না। তারচেয়ে বরং ভাবা ভালো ওরা ওই সময় কোনও নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল। এখনও ফিরে আসেনি।

স্নান শেষ করে ওপরে উঠে এসেই মিলন দেখল, ঝিনুক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গামছা ব্যবহার করে বারমুডা ছেড়ে প্যান্ট পরে নিতেই ঝিনুক বলল, 'দয়া করে ভিজে বারমুডা আর গামছা রেখে এখান থেকে চলে যান।'

মাথা নাড়ল মিলন, 'বেশ। তবে সাবধানে স্নান করবেন।'

'কেন?'

'আপনি বিন্দুতে আমাকে বলেছিলেন এখানে হাঙর থিকথিক করছে। একটা-দুটোও থাকলে বিপদ হবে।'

'আপনার তো হয়নি।'

'আমি অল্প জলে স্নান করেছি।'

'ঠিক আছে। উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। ও হ্যাঁ, আপনি কি আজ রাত্রেও জঙ্গলে গিয়ে থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আপনার মেয়েমানুষটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

মিলন জবাব না দিয়ে ওপরে উঠে এল।

কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের ধার থেকে তীব্র চিৎকার ভেসে এল। মিলন তখন চুল আঁচড়ে একটা শার্ট পরছিল। লোকটাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুজনেই দৌড়ল সমুদ্রের দিকে।

কোমর জলে দাঁড়িয়ে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে ঝিনুক। তার পরনে বারমুডা, ঊর্ধ্বাঙ্গে গামছার আড়াল। ওরা আসতেই সে আঙুল তুলে দেখাল। বালির ওপাশে হনুমানটা বসে আছে। তার হাতে ঝিনুকের ছেড়ে যাওয়া শার্ট-প্যান্ট।

মিলন হেসে ফেলল। মনে-মনে বলল, শেষপর্যন্ত হনুমানই বস্ত্রহরণ করল। লোকটি তার অবোধ্য শব্দে ধমক দিতে হনুমান সুড়সুড় করে নেমে এল জামাপ্যান্ট নিয়ে। যেখানে ছাড়া হয়েছিল সেখানে রেখে চোখের আড়ালে চলে যেতে ওরা ফিরে এল।

খাওয়া শেষ করে মিলন লোকটাকে বোঝাল, সে জঙ্গলে যাচ্ছে। লোকটা হাত নেড়ে আপত্তি জানাল। মিলন হেসে মাথা নাড়ল, 'কোনও ভয় নেই। আমি লঞ্চে থাকব। সেখানে যে সাপটা ছিল, সেটা মরে গেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার চোখ বিস্ফারিত হল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

লাঠিটা নিয়ে মিলন তার সুটকেস তুলে নিতেই ঝিনুক এগিয়ে এল, 'লঞ্চে থাকবেন মানে? আদিবাসীদের গ্রামে কি লঞ্চ আছে?'

'এখানে কোনও আদিবাসীদের গ্রাম আছে কিনা তা আমার জানা নেই।'

'তাহলে লঞ্চ কোথায় পেলেন?'

'কোনও অভিযাত্রী দলের লঞ্চ ঝড়ে খারাপ হয়ে ওপাশের খাড়িতে ঢুকেছিল। তারা হয় সাপের নয় কুমিরের পেটে চলে গিয়েছে। খালি লঞ্চটা এখনও থাকার বেশ উপযুক্ত। অন্তত এই ঘরগুলোর চেয়ে ঢের ভালো। আমি ওখানে রাত্রে থাকব, সকালে এখানে আসব।'

'বাঃ! আপনি ভালো জায়গায় থাকবেন আর আমি একটা মেয়ে এখানে পড়ে থাকব।'

'এখানে আর যাই হোক বিপদের সম্ভাবনা নেই। ওখানে আছে। জানালা-দরজা বন্ধ করে সারারাত কাটাতে হয়। সাপ-কুমির তো আছেই, আর যারা আছে তাদের সংখ্যা কম নয়। চলি।'

'ঠিক আছে। আপনার কথা সত্যি কিনা নিজের চোখে দেখে আসি।' এগিয়ে এল ঝিনুক, 'চলুন।'

'যেতে আসতে কষ্ট হবে। তা ছাড়া ফিরবেন কার সঙ্গে?'

ঝিনুক লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে যেতে ইশারা করল। লোকটা চটপট মাথা নেড়ে না বলে দিল।

'অসভ্য লোক তো! ঠিক আছে। যাওয়ার সময় রাস্তা চিনে নেব, একা ফিরতে অসুবিধে হবে না। আপনি যদি আমাকে ভীতু ভাবেন তাহলে ভুল ভাববেন। তা ছাড়া আমি ক্যারাটে জানি।' ঝিনুক হাঁটতে শুরু করল।

জঙ্গলের ডালপালা সরিয়ে দুবার যাওয়া-আসা করলেও সহজে পথ চেনা সম্ভব হয় না। মিলন আগে যাচ্ছিল, ঝিনুক তার পেছনে। হঠাৎ ঝিনুক চিৎকার করে সামনের দিকে হাত বাড়াতেই মিলন দেখল গাছের ডালে লেজের পাক দিয়ে ফণা তুলেছে বেশ বড়সড় শঙ্খচূড়। দ্রুত লাঠি চালাল মিলন। সাপটা ছিটকে পড়ল পাশের গাছের ডালে। একটু নড়ে স্থির হয়ে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকেছিল ঝিনুক। তার দিকে তাকিয়ে মিলন বলল, 'আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আমি কী করলাম? আপনিই তো মারলেন!' হাত সরাল ঝিনুক।

'ওই চিৎকারটায় কোনও কথা ছিল না বলে সত্যিটা বুঝেছিলাম।'

আজ একটু বেশি সময় লাগল। খাড়ির ওপরে এসে ঝিনুক বলল, 'ও হো! কী সুন্দর। সমুদ্র থেকে ওই জল ভেতরে ঢুকছে, না?'

'সুন্দর দূর থেকে মনে হচ্ছে। জলে কুমির ভরতি।'

'জলে কে নামতে যাচ্ছে?'

'ওই যে, গাছের আড়ালে কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

ঝিনুক লক্ষ করে বলল, 'হ্যাঁ, ঘর মতো। ওটাই লঞ্চ?'

'হ্যাঁ। সামনের ডেকটার এপাশে গাছ পড়ে গিয়ে আড়াল করেছে।'

'ভেতরটা ঠিকঠাক আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এবার আপনি ফিরে যান। যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। এখন না গেলে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতরে দিয়ে হাঁটতে পারবেন না।'

'আমি একা ফিরে যাব?'

'আপনি তো তাই বলেছেন। একা ফিরতে অসুবিধে হবে না, ক্যারাটে জানেন। অতএব আপনার ভয় নেই। আমি বলছি যত শক্তি থাক অন্ধকার নামার আগেই ফিরে না গেলে—।'

'ওই সাপের সঙ্গে আমি ক্যারাটে লড়ব?' ঝিনুক মাথা নাড়ল, 'চলুন, লঞ্চের ভেতরটা আগে দেখি। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

লঞ্চের কাছে এসে হনুমানগুলোকে দেখতে পেল। গাছের ডালে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। মিলন বলল, 'ওই গাছের ডাল ধরে লঞ্চের ছাদে উঠতে হবে। সাবধানে আসুন।'

'ওই হনুমানগুলো?'

'ওরা আছে বলে জানবেন এখানে সাপ নেই।'

মিলনের দেখাদেখি ঝিনুক শেষপর্যন্ত ডেকে পৌঁছেই চিৎকার করল, কী সর্বনাশ। ওরা যে হাঁ করে আছে।'

'সামনে খাবার দেখছে অথচ খেতে পারছে না। কী করবে!' দরজার ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকে মিলন ডাকল, 'আসুন। দরজা বন্ধ করব।'

'এখনও তো বাইরে রোদ আছে।'

'আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।'

এখন লঞ্চের ভেতর ছায়ামাখানো আলো।

মিলন বলল, 'প্যাসেজের ওই দরজাটা খুলে ভেতরটা দেখে আসুন। আমি ইঞ্জিনঘরে ঢুকছি।'

'এটা ইঞ্জিনঘর।'

'হ্যাঁ।'

'ওটা চালু আছে?'

'না। একটু দেখি।' মিলন বলতেই ঝিনুক ওদিকে এগোল। ইঞ্জিনের ঢাকনাটা খুলল মিলন। এককালে গাড়ির মেকানিজম শেখার চেষ্টা করেছিল পাড়ার গ্যারেজে। সেই বিদ্যে নিয়ে লঞ্চ সারানো যায় না। তবু ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বুঝতে না পেরে স্টার্ট বোতামটা টিপতে ইঞ্জিন চালু হয়েই সেই বিশ্রী শব্দটা উত্তাল হল। মিলন ঢাকা খোলা ইঞ্জিনের ভেতরটা লক্ষ করছিল। ছোট্ট আগুনের ঝলক একটা অংশ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন বন্ধ করে সে বুঝতে পারল ওই জায়গায় যে অংশটি ঘুরছে সেটা বেঁকে গিয়ে আটকে যাচ্ছে পাশের অংশের সঙ্গে। হয়তো ইতিমধ্যে সেটা ভেঙেও গেছে। ভেতর থেকে গরম হালকা ওপরে উঠছে। এখন হাত দেওয়া যাবে না।

ঢাকনা বন্ধ করে মিলনের খেয়াল হল, ছায়া ঘন হয়েছে লঞ্চের ভেতরে। ঝিনুকের কোনও শব্দ নেই। সে সুইচ টিপে লঞ্চের আলো জ্বালাল। প্যাসেজ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। তখনই খেয়াল হল নিজের সুটকেসের কথা। ওটা ভেতরে ঢুকে ইঞ্জিনঘরের দরজার পাশে প্যাসেজে রেখেছিল সে। ফিরে এসে দেখল, সুটকেসটা নেই।

সে কেবিনের দরজায় শব্দ করল, 'আমার সুটকেস কি ভেতরে?'

দরজা খুলে গেল। চমকে পিছিয়ে গেল মিলন। ঝিনুক তার শার্টপ্যান্ট ছেড়ে সুটকেসে রাখা মিলনের বারমুডা আর গেঞ্জি পরে ফেলেছে।

হেসে ঝিনুক বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

হতাশ মিলন বলল, 'কী বলব!'

'মেমসাহেবরা পরলে তো চোখ বড় করে প্রশংসা করতেন।'

'আপনার কি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই?'

'আছে।' মাথা নাড়ল ঝিনুক।

'কিন্তু তার কোনও উদ্যোগ দেখছি না।'

'কাল সকালে দেখতে পাবেন। টয়লেট কোথায়?'

হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল মিলন। ঝিনুক সেদিকে চলে গেল। লঞ্চের স্টোররুমে ঢুকল মিলন। নানারকমের জিনিস এখানে সাজানো। হঠাৎ একটা লম্বা শক্ত বেতের ডগায় গোল জাল দেখতে পেল সে। অনেকটা বাস্কেটবল খেলার নেট। সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে একটা লম্বা টিনের বাক্স দেখতে পেল। অনেকটা বিস্কুটের টিনের মতো। সেটা বেশ কসরত করে খুলতে হল।

খুলে চমকে উঠল মিলন। একটা লম্বা রিভলভার। তার পাশে অনেকগুলো গুলি। রিভলভারটা

খুলতেই দেখতে পেল সবক'টা ঘরে গুলি ভরা আছে। বাক্সটার ভেতর ওটা রেখে দিল মিলন। এর কথাই মাইকেল মুরহেড লিখেছিলেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন কার্লোস কাস্টমসকে লুকিয়ে লঞ্চে আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছে।

নেট-এর বেতটার দিকে তাকিয়ে মতলবটা এল। প্যাসেজের পাশে কাচের জানলার পাশে এসে দাঁড়াল সে। তারপর জানলার ছিটকিনি খুলে বাইরে তাকাল। আর একটু পরেই অন্ধকার ঘন হয়ে যাবে। নেট লাগানো বেতের মুখটা জলে ডুবিয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ বেতে টান পড়তেই ওটা জল থেকে তুলে নিয়ে দেখল, বেশ বড়সড় একটা মাছ নেটের ভেতরে ছটফট করছে। ওটাকে ভেতরে টেনে আনতে গিয়ে আর একটু হলে কুমিরের হাঁ মুখে পড়তে যাচ্ছিল মিলন। মাছটাকে প্যাসেজের রেখে দ্রুত জানলা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল সে। ভেতরে আলো জ্বলতে দেখে, যা এখানকার পোকামাকড় দ্যাখেনি, দল বেঁধে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।

এটা বেশ ওজনদার ভেটকি মাছ। ওটাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকে ছুরি দিয়ে আঁশ ছাড়াতে লাগল সে। এই সময় স্নান শেষ করে গামছায় চুল শুকোতে-শুকোতে দরজায় এসে দাঁড়াল ঝিনুক।

'ওমা! মাছ পেলেন কোথায়?'

'জলে।'

'ওখানে তো শুধু কুমির।'

কথা বলল না মিলন। ঝিনুক বলল, 'সরুন। আমি দেখছি।'

'সরি। আমি মাছটাকে ভালোভাবে খেতে চাই। আপনি তো বলেছেন আপনার রান্না খাওয়া যায় না।' মিলন পেছন ফিরে বলতে-বলতে আঁশ ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ঝিনুক সরে গেল শোওয়ার কেবিনের দিকে।

গ্যাস জ্বেলে কড়াইতে তেল গরম করে মাছটাকে ভাজল মিলন। দুজন লোক এই একটা মাছ খেলে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

ঝিনুক ফিরে এল, 'লঞ্চের ব্যবস্থা তেমন ভালো নয়।'

'কেন?'

'মাত্র একটা শোওয়ার কেবিন।'

'এই কিচেনেও শোওয়া যায়। আপনি এখানে শোবেন।'

'অসম্ভব। এখানে খাট নেই।'

'তাহলে আমি শোব কোথায়?'

'সেই জন্যেই তো বলছি লঞ্চের ব্যবস্থা ভালো নয়।'

হতাশ হয়ে তাকাল মিলন। তারপর টয়লেট চলে গেল।

এখন চারধারের পৃথিবীটা অন্ধকারে মোড়া। শোওয়ার কেবিনের বিছানায় পা মুড়ে বসেছিল ঝিনুক। মাছের প্লেট সামনে রেখে চেয়ারে বসে মিলন বলল, 'আলো এখন নিভিয়ে দিতে হবে।'

'সে কী! কেন?'

'লঞ্চে তেল কতখানি আছে জানি না। মোমবাতি জ্বালাতে হবে।'

'ভয় লাগবে না?'

'আলো বেশিক্ষণ জ্বললেই বন্যজন্তুরা আকর্ষিত হবে।'

'ও।'

'নিন, খান।'

'ভাজা?'

'এর বেশি বিদ্যে আমার জানা নেই।'

'এখানে চাল আছে।'

'জানি না। খুঁজে দেখিনি।'

মোমবাতি জ্বালল মিলন। তারপরে ইঞ্জিনঘরের সুইচ অফ করে বাইরে তাকাল। লঞ্চ থেকে কয়েক হাত দূরে জঙ্গলের এধারে দুটো লাল চোখ জ্বলছে। এদিকেই তাকিয়ে আছে জন্তুটা। চোখের অবস্থান দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওর চেহারা বেশ বড়সড়। ইঞ্জিনঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই হনুমানদের চিৎকার শুরু হল। তারপর ধপ শব্দ এবং লঞ্চটা দুলে উঠল খানিকটা। ওপরের দিকে তাকাল মিলন। জন্তুটা লাফিয়ে ছাদে নেমেছে। কিন্তু ওর পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। কেবিনের দরজায় এসে সে দেখল—ঝিনুক বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, তাকে দেখে আবার বসে পড়ল, 'শব্দ হল!'

'একজন শিকারি এসেছেন আমাদের সন্ধানে। ছাদে নেমেছেন।'

'কে?'

'অন্ধকারে চেনা যায়নি।'

'আপনি দেখেছেন?'

'চোখ জ্বলছিল। দেখেছি।'

বুকে হাত দিয়ে শ্বাস ফেলল ঝিনুক। তার পরই বলল, 'যাই বলুন। বেশ থ্রিলিং ব্যাপার! অ্যাডভেঞ্চারের মতো।'

'মাছভাজা খান।' একটা মাছভাজা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসল মিলন। মাছভাজা নিয়ে দাঁতের তলায় রাখল ঝিনুক।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাবা-মা চিন্তা করবেন না?'

'না। বাবাই তো পাঠাল। আমি বাড়িতে না থাকলে মা খুশি হয়।'

'এটা মিথ্যে কথা নিশ্চয়ই।'

'সত্যি কথা। আচ্ছা, আপনি বউকে নিয়ে এলেন না কেন?'

'থাকলে নিয়ে আসতাম।'

'মিথ্যে কথা! ছেলেরা অন্য মেয়ের কাছে বউ-এর ব্যাপারটা বলে না।'

'যা ভাবতে পারেন, ভাবুন।'

'প্রেমে পড়েননি?'

'পড়েছি। আপনি?'

'না। আমার মুখের জন্যে কেউ প্রেমে পড়তে চায় না।'

'কেন? আপনার মুখ তো বেশ সুন্দর।'

'মিথ্যে বলবেন না। আর আমি এই মুখের কথা বলছি না। মুখের কথার কথা বলছি। সত্যি কথা বলি তো তাই ছেলেরা কেটে পড়ে।'

'তাহলে বিয়ে করেননি?'

'করেছিলাম।'

'আচ্ছা। তিনি কোথায়?'

'নেই। আমি এখন বিধবা।'

হাসতে গিয়েও গম্ভীর হল মিলন। বিয়ে করেনি বললে সত্যি কথা বলতে হবে। তাই নিজেকে বিধবা বলতে হচ্ছে ঝিনুককে।

প্লেটের মাছ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক নামল, 'আমি দেখছি। এক্সট্রা মোমবাতি আছে?'

আর-একটা মোমবাতি ধরিয়ে দিল মিলন। সে চলে গেলে মিলন ভাবল, রান্নাঘরে নয়, প্যাসেজে বিছানা করে শুয়ে পড়বে। বিছানা মানে একটা চাদর পেলেই হয়ে যাবে।

মিলন আবিষ্কার করল, একটা লম্বা বাক্সকে খাট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্সের ডালা খুলতেই বেশ কিছু চাদর-বালিশ দেখতে পাওয়া গেল। বাঁ-দিকে অনেকগুলো জামাপ্যান্ট। ডালা বন্ধ করে চেয়ারে বসল মিলন। এখন ক'টা বাজে বোঝা যাচ্ছে না। তার খেয়াল হল ঝিনুকের কাছে মোবাইল সেট রয়েছে। নেটওয়ার্ক না পাওয়া গেলেও ঘড়ি তো সময় দিচ্ছে। সে গলা তুলে ডাকল, 'ঝিনুক।'

'বলুন।' ঝিনুক দরজায় এল।

'আপনার মোবাইলে সময় দেখুন তো।'

'না। দেখব না।'

'কেন?'

'এখানে সময় স্থির হয়ে থাক। ওসব সভ্য জগতের ব্যাপার এখানে চলবে না। আচ্ছা, এখন যদি সাতটা অথবা আটটা বাজে, তাহলে আপনার কি লাভ? আপনি কি সময়মতো কোথাও যাবেন?' ঝিনুক হাসল।

বেশ রেগে গেল মিলন। যে মেয়ে মিথ্যে ছাড়া সত্যি বলে না তার মুখে এরকম জ্ঞানের কথা শুনতে তার ভালো লাগছে না। ঝিনুক খাটের ওপর বসল। বসে একটা পায়ের ওপর আর-একটা পা তুলে দিয়ে দুটো হাত শরীরের পেছনের বিছানায় রেখে বেঁকে বসল।

মিলন বলল, 'মাছভাজা যদি খেতে ইচ্ছে করে, খেয়ে শুয়ে পড়ুন। শোওয়ার আগে মোমবাতি নিভিয়ে দেবেন। একটু সরুন।'

বাক্স থেকে একটা চাদর আর বালিশ বের করে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত বাড়াল হুইস্কির বোতলটার জন্যে।

'কোথায় চললেন?'

'শুয়ে পড়তে।'

'কোথায়?'

'যেখানে শোওয়া যায়?'

'মাছের স্যুপ খাবেন না?'

'না। পেট ভরে গেছে।'

ওটা কী?

'হুইস্কি। কাল খেয়েছিলাম। ভালো লেগেছিল।'

'ঘুমিয়ে পড়ার পর নিশ্চয়ই খাবেন না?'

'তো?'

'এখানে বসেই খেয়ে নিন। খেয়ে তারপর ঘুমাবেন।'

চাদর-বালিশ বিছানার কোণে রেখে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। মনে-মনে বলল, সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। সে তো ডেকে আনেনি। কেউ যদি গায়ে পড়ে এসে তার প্রাইভেসি নষ্ট করে তাহলে সে চক্ষুলজ্জা করবে কেন?

দু-চুমুক দেওয়ার পর সে তাকাল। হঠাৎ তার লজ্জা করতে লাগল। বারমুডার সীমানার বাইরে ঝিনুকের পা কেমন চকচক করছে। আজ অবধি সিনেমার বাইরে কোনও মেয়ের এতটা পা সে দ্যাখেনি। চোখ তুলল। ওর পরনে তার গেঞ্জি। একটু বড় হওয়ায় গলার নীচের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। না। সে দেখবে না। মুখ ঘুরিয়ে নিল মিলন।

'কী হল?' ঝিনুক বলল।

'আপনাকে দেখা যাচ্ছে না।'

'কেন? আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি নাকি?'

'তা বলছি না। এটা খেলে মেয়েদের দিকে তাকাতে নেই। আপনি ওই চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকে বসুন।'

'এই গরমে আমি চাদর মুড়ি দিয়ে বসব? পাগল নাকি?'

'উঃ। তাহলে তাকাতে বলবেন না।'

'ওটা খেয়ে কী হল বলুন তো!'

'কিছু হয়নি।' আবার চুমুক দিল মিলন।

'এইটুকু খেয়েই উলটোপালটা বকছেন। আমি অর্ধেক বোতল খেলেও আপনাকে চাদর মুড়ি দিতে বলব না।'

'অ্যাঁ? আপনি কখনও স্কচ হুইস্কি খেয়েছেন?'

'অনেকবার! বাবার সঙ্গে খেয়েছি। বাবা রাগ করেছেন এই বলে যে, তুই অর্ধেক খেয়ে ফেললি।' হাসল ঝিনুক।

'আবার মিথ্যে কথা! বেশ। এক গ্লাস খেয়ে দেখান।'

শেষ হয়ে যাওয়া গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে ধরল মিলন। একটু ইতস্তত করেও গ্লাস নিল ঝিনুক। একবার দেখল। তারপর এক চুমুকে নির্জলা হুইস্কি কয়েক ঢোঁক গিলে ফেলল। গ্লাসটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এই তো। খেয়ে নিলাম। আমার সঙ্গে পারবেন না।' বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ঝিনুক।

আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল মিলন। একবার চুমুক দিতেই ঝিনুক ফিরল একটা সসপ্যান নিয়ে। তাতে মাছের ঝোল টলটল করছে। টেবিলে সেটা রেখে খাটে বসতেই একটু টলে গেল ঝিনুক।

জিজ্ঞাসা করল, 'খাবেন না?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না। এখন ঘুম পাচ্ছে।'

'তাহলে এখানে শুয়ে পড়ুন।'

'এখানে না। এখানে আপনি। আমি বাইরে।'

এই সময় শোঁশোঁ শব্দ উঠল। লঞ্চটা কেঁপে উঠল থরথর করে। আকাশে যে মেঘ জমেছিল, ওরা বুঝতে পারেনি। মেঘ ডাকল, কাচের জানলা চুইয়ে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। আর তখনই মাথার ওপর ছাদে শব্দ হল। কেউ যেন ছাদে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

মিলন উঠে চাদরের জন্য হাত বাড়াতেই ঝিনুক তার হাত ধরল, 'না, প্লিজ! আমি যদিও ভয় পাইনি, তবু আপনি বাইরে যাবেন না।'

সেই সময় খুব জোরে বাজ পড়ল এবং ঝড়ের দাপটে লঞ্চ দুলে উঠতেই মোমবাতি টেবিলের ওপর পড়ে দপদপ করে নিভে গেল। ঝিনুক দুহাতে জড়িয়ে ধরল মিলনকে। জড়ানো গলায় বলল, 'আমার অবশ্য খুব বেশি ভয় করছে না।'

একটা নারী শরীরের স্পর্শে বাইরের ঝড়টাকে শরীরের ভেতর আবিষ্কার করল মিলন। সে দু-হাতে ঝিনুককে জড়িয়ে গালে ঠোঁট রাখল। যেহেতু এখন বাইরে এবং ভেতরে ঘন অন্ধকার তাই ওরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। লঞ্চটা খুব দুলছে। দুটো শরীর এক হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওরা বাইরের ঝড়, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গর্জন বিস্মৃত হয়ে গেল। দুটো শরীর পরস্পরকে উন্মাদের মতো আবিষ্কার করে যেতে লাগল। তারপর দুজনেই স্থির হয়ে গেল। হয়তো হুইস্কির প্রতিক্রিয়া ঘুম এনে দিল।

*

ঘুম ভাঙল যখন তখন বেশ জোর রোদ উঠেছে। মিলন চোখ খুলতেই তড়াক করে উঠে বসল। ঝিনুক পাশ ফিরে তখনও ঘুমাচ্ছে। ওর শরীরে কোনও পোশাক নেই। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াতেই তার কপালে ভাঁজ পড়ল। এটা কী হল? লঞ্চটা নড়ছে কেন?

প্রায় নিঃশব্দে প্যাসেজের জানলার কাছে চলে এল মিলন। কাচের জানলার বাইরে তাকিয়ে সে হতভম্ব। ওপাশের জঙ্গল, মাটি সরে-সরে যাচ্ছে।

সে দৌড়ে দরজাগুলো খুলে ডেকে চলে এল। লঞ্চ যেখানে আটকে ছিল সেখান থেকে ঝড়ের দৌলতে সরে এসেছে খাড়ির মাঝখানে। এখন স্রোতে ভেসে চলেছে জোয়ারের জলে। অর্থাৎ আরও ভেতর দিকে চলেছে লঞ্চ। যদি ভাটার টানে চলত তাহলে এতক্ষণে মাঝ সমুদ্রে দৌড়ে যেত আর তাহলে বাঁচার কোনও উপায় থাকত না।

খাড়িটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সে ইঞ্জিনঘরে ঢুকে স্টিয়ারিং ঘোরাতে লঞ্চটা একটু বাঁদিকে ঘুরল বলে মনে হল। ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ঝুঁকে হাত দিয়ে সে আগুন বের হওয়ার অংশটার নাগাল পেয়ে গেল। শরীরের সব শক্তি দিয়ে বেঁকে যাওয়া অংশটাকে সোজা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হল। শেষপর্যন্ত সেটা সোজা হল। ঢাকনা বন্ধ করে ইঞ্জিন চালু করতেই সেই বিকট শব্দটা শোনা গেল না। কোনওমতে পাড়ের কাছে নিয়ে গেল সে লঞ্চটাকে।

ঠিক তখনই ঝিনুক এসে দাঁড়াল দরজায়। এখন তার পরনে প্যান্ট আর শার্ট। নিজের পোশাক পরে নিয়েছে সে।

'কী হল?'

'ঝড়ে লঞ্চটাকে আটকে থাকা জায়গা থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। ভাগ্য ভালো যে জোয়ারের জন্যে আমরা ভেতর দিকে ঢুকে পড়েছি।'

'এখন লঞ্চ চলছে?'

'একটু চালু হয়েছে। পরে কী হবে জানি না।'

ডেকে গেল ঝিনুক। তারপর শব্দ করে হাসল। তার পাশে এসে দাঁড়াল মিলন, 'হাসলেন যে!'

'পৃথিবীটা কী সুন্দর।'

'এটা কিন্তু সত্যি কথা!'

'আমি আর মিথ্যে বলব না।'

'এটা মিথ্যে কথা নয় তো?'

দু-হাতে মিলনকে জড়িয়ে ধরল ঝিনুক। তারপর বলল, 'আমি বিয়ে করিনি। তাই বিধবা নই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না?'

তখনই নজরে পড়ল মিলনের। বিশাল চেহারার একটা জন্তু পাড়ের জঙ্গলে তৈরি হয়েছে ডেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ঝট করে ঝিনুককে কোনওমতে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই জন্তুটা ডেকে এসে লাফিয়ে পড়ল। বন্ধ দরজার সামনে রাগে গরগর করতে লাগল।

আতঙ্কিত ঝিনুক মিলনকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে বলল, 'এখান থেকে চলো।'

'কোথায়? বিন্দুতে?'

'না। তোমার বাড়ি যেখানে, সেখানে।' ঝিনুক আদুরে গলায় বলল।

মিলন তাকাল। আমার বাড়ি! যেখানে সে এতকাল থেকে এসেছে সেটা নিশ্চয়ই তার বাড়ি। কিন্তু সেই পলেস্তরা আর ইট বের করা বাড়ির ছোট্ট ঘুপচি ঘরে ঝিনুককে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই শিউরে উঠল সে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি যেখানে থাকব সেটাই তো আমার বাড়ি।'

'তা কেন। এই এখন যেখানে তুমি আছ তার মালিক তো অন্যলোক। তুমি যেখানে এতকাল ছিলে সেই জায়গাটা কী রকম?' ঝিনুক জিজ্ঞাসা করল।

'ওখানে তোমাকে মানাবে না ঝিনুক।'

'তাহলে তুমি নিজের জায়গা বানিয়ে নাও। আমি সেটাকে মনের মতো করে সাজাব।'

'বেশ তাই হবে।'

ডেকের ওপর থেকে জন্তুটা যে আবার জঙ্গলে লাফিয়ে চলে গেল সেটা বুঝতে পারল মিলন। লঞ্চটা বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে যেন একটু ওপরে উঠল।

ঝিনুক হাসল, 'চলে গেছে।'

'হুঁ। কিন্তু ওই জন্তুটার নাম কী? একদম অচেনা মনে হল।'

'আমি তো দেখার সুযোগই পাইনি। তুমি যেভাবে ভেতরে টেনে নিয়ে এলে?'

'নিয়ে না আসলে আমরা দুজনেই এতক্ষণে ওর খাদ্য হয়ে যেতাম। মিলন বলল, 'কিন্তু এখান থেকে জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। অথচ এখন জমিতে যাওয়া খুব দরকার?'

ঝিনুকের কাছ থেকে সরে ইঞ্জিনঘরে ঢুকল মিলন, 'বেশ ভয়ে-ভয়ে ইঞ্জিন চালু করতেই সেটা সচল হল। কিছুটা সময় ধরে সে আগুপিছু, গতি বাড়ানো কমানোর পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করল। ইঞ্জিন চালু হলে তেলের কাঁটা লক্ষ্য করল সে। এখনও এক চতুর্থাংশ তেল ট্যাঙ্কে আছে। তাতে কতদূরে যাওয়া যায় সে জানে না।

ঝিনুক চলে এল, 'এই, আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

'দূর! আমি নিজেই জানি না। হাতড়ে হাতড়ে চালাবার চেষ্টা করছি!'

'ওমা! যদি ডুবে যায়?'

'সেটা হবে না। তোমাকে ডোবাব না কখনও, সে ভরসা রেখো।' হাসল মিলন।

ধীরে-ধীরে লঞ্চ নড়তে লাগল। নড়ামাত্র শব্দটা শুরু হল। যেন কোনও কিছুতে লঞ্চের যন্ত্রাংশ বারবার আটকে যাচ্ছে। সেই আগের জায়গায় ফিরে আসতে অনেকটা সময় লেগে গেল ওদের। ইঞ্জিন বন্ধ করে মিলন বলল, 'চলো। জমিতে ফিরে যাওয়া যাক।'

'যদি ওই জন্তুটা এখানে চলে আসে?'

'মনে হয় এতটা দূরে ও আসবে না। এলে জমিতেও হানা দিত।' দরজা খুলতে গিয়ে খেয়াল হল মিলনের। সে ভেতরে ঢুকে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি আর কয়েকটা টিনফুডের কৌটো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিতে গিয়ে কী ভেবে আগ্নেয়াস্ত্রটিকে কোমরে গুঁজে নিল।

দরজা খুলে সন্তর্পণে চারপাশ দেখে নিয়ে সে লঞ্চের ছাদে উঠে ওপরের গাছের ডালের সঙ্গে লঞ্চটাকে একটা শক্ত দড়িতে বেঁধে নিল। তারপর ঝিনুককে টেনে তুলল লঞ্চের ওপরে। গাছের ডালে পা রেখে ওরা মাটিতে চলে এল। তারপর মনে পড়তে মুখ ঘুরিয়ে দেখে খুশি হল মিলন। আসার আগে ঝিনুক লঞ্চের দরজা বন্ধ করে এসেছে। ভেতরে ঢুকে বসার সুযোগ কোনও প্রাণী পাবে না।

এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। বুনো ঝোপের মাঝখানে পথ করে ওরা হাঁটছিল। এই কয়েকবার যাওয়া-আসা করায় এখন আর অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ ওপাশের গাছের মগডালে প্রবল চিৎকার শুরু হতে মিলন দেখল হনুমানটা দু-হাতে ডাল ঝাঁকাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। বোধহয় ওদের দেখতে পেয়ে ওর মালিককে জানান দিচ্ছে। তারপর দুদ্দাড় করে নেমে গেল।

মিলন হেসে বলল, 'আমরা যে বেঁচে আছি এই খবরটা দিতে ছুটল।'

হঠাৎ ঝিনুকের গলার স্বর বদলে গেল, 'আচ্ছা, আমরা যদি মরে যেতাম তাহলে কি হত?'

'মানে?' অবাক হয়ে তাকাল মিলন।

'ধরো, আমরা দুজনে লঞ্চে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমানোর মধ্যেই একসঙ্গে মারা গেলাম। তাহলে

কি হত?' হাসল ঝিনুক।

'তুমি কী ভাবছ?'

'তাহলে আর আমাদের এখানে ফিরতে হত না।'

'তাতে কি লাভ হত? মরে গেলে কি হয় আমরা কেউ জানি না, বেঁচে থাকলে পরস্পরের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, তাই না?'

'ছাই যায়! আমাকে তো সেই বিন্দুতে ফিরে যেতে হবে।'

'বিন্দুতে!' জমির মুখটায় এসে দাঁড়িয়ে গেল মিলন, 'কেন?'

'বাঃ! ওখানে আমার বাড়ি না? আমার বাবা-মা-ভাই-বোন ওখানেই তো থাকে। এখানে আমি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। পাকাপাকি থাকার কোনও অধিকার তো নেই।'

'সেই অধিকার যদি দিই?'

অবাক হয়ে তাকাল ঝিনুক, 'কেমন করে?'

সঙ্গে-সঙ্গে দুটো হাত দুপাশে ছড়িয়ে চিৎকার করল মিলন, 'হে আকাশ-বাতাস, হে সূর্য, হে গাছেরা, সমুদ্র, তোমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা করলাম ঝিনুক আমার স্ত্রী।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এবার ওদের সাক্ষী রেখে তুমিও বলো আমি তোমার স্বামী।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছিল ঝিনুক। এবার সেটা তুবড়ির মতো ফেটে পড়ল। ঘনঘন মাথা নেড়ে কোনওরকমে বলতে পারল, 'পাগল!'

'না। পাগলামি করছি না, সত্যি বলছি।'

'এই সত্যিটা লোকে মানবে কেন?'

'কেন মানবে না?'

'আমাদের সমাজ আছে। বিয়ে হয় সামাজিক নিয়ম মেনে। চিৎকার করে বললাম আর বিয়ে হয়ে গেল? বাবা-মা মানবে একথা?'

'তাহলে তাঁদের এখানে আসতে বলো। যে নিয়মকানুন তাঁরা চান, সেই মতে আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

'এতক্ষণে ঠিক বললে। আমি যাই, গিয়ে ওদের বোঝাই—তারপর।'

'ওঁরা যদি রাজি না হন? তোমাকে এই দ্বীপে পাঠাতে যদি না চান—?'

ঝিনুক জবাব দেওয়ার আগেই লোকটাকে ছুটে আসতে দেখল মিলন। পেছন-পেছন হনুমানটা আসছে। কাছে এসে লোকটা বিচিত্র শব্দ করে হাত-পা নেড়ে সম্ভবত বোঝাতে চাইল কী উদ্বেগে ছিল সে। মিলন মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'আমরা লঞ্চে ছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল বলে ফিরতে পারিনি। তাড়াতাড়ি ভাত বসিয়ে দাও, খুব খিদে পেয়েছে।'

ঝিনুক বলল, 'না। আজ আমি রাঁধব।' তারপর লোকটিকে বলল, 'চলো। আমাকে দেখিয়ে দাও কী-কী জিনিস তোমার আছে।'

ওরা চলে গেলে জমিটাকে ভালো করে দেখতে লাগল মিলন। এখানে ঝিনুকের সঙ্গে থাকতে হলে মালিককে খুশি করার মতো ফসল ফলাতে হবে। কিন্তু এই বালিমাটিতে বেশি ফসল আশা করা ভুল হবে। তার চেয়ে হাঁস-মুরগি এবং ছাগলের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করলে বেশি লাভ হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে জমির বিভিন্ন জায়গা মেপে পরিকল্পনাটা মাথায় নিয়ে নিল মিলন। মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে যে এই দ্বীপে কোনও শেয়াল জাতীয় প্রাণী নেই। থাকলে তারা ইতিমধ্যে সামান্য যেক'টা হাঁস-মুরগি রয়েছে তা থাকতে দিত না। ওই বিদ্যুতের তার বা জেনারেটারের শব্দ বড় জন্তুদের ভয় পাওয়াতে পারে কিন্তু শেয়াল অনেক বেশি ধূর্ত। হাঁস-মুরগির চাষ বাড়ালে এই আশঙ্কা থাকছে না।

খিদে পেয়েছিল খুব। রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি মারল সে। উনুনে হাঁড়ি চাপানো, তাতে কিছু ফুটছে। ইতিমধ্যে কোনও একটা আইটেম রান্না হয়ে গিয়েছে। সেটা ঢেকে রাখা হয়েছে এবং হনুমানটা যেন পাহারা দিচ্ছে এমন ভাবে পাশে বসে। ঝিনুক ঘরে নেই। লোকটা হাঁড়ির ঢাকনা খুলে পরীক্ষা করছিল সেদ্ধ হয়েছে কিনা। মিলন তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কেন? ঝিনুক কোথায়?'

লোকটা হেসে আঙুল এবং ঠাটের ইশারায় বোঝাল, রান্না ঝিনুকই করেছে, সে শুধু নামিয়ে নিচ্ছে। আর ঝিনুক গিয়েছে স্নান করতে, সমুদ্রে।

মিলনের মনে হল তারও স্নান করে নেওয়া দরকার। সমস্ত শরীরে চিটচিটে ঘাম, গতরাতের অস্বস্তি থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। সে বারমুডা পরে গামছা নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল।

বালির আড়ালটা সরে যেতেই আদিগন্ত নীল জলরাশি। মাঝে-মাঝে সাদা ফেনা ছড়িয়ে ঢেউ গড়িয়ে আসছে কিশোরীর মতো। সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর চেহারার কথা এখন দেখলে কল্পনাতেও আনা যায় না। দূরে বা কাছে কোথাও নৌকো নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লাইনগুলো মনে পড়ল, হঠাৎ, 'ভাবি, বলি সাগরের ইচ্ছে / সাদা ফেনা থেকে শাঁখমাজা ডানা মেলে আকাশে তল্লাশ নিচ্ছে।'

মিলন আর-একটু এগিয়েই থমকে গেল। স্বর্ণচাঁপা পিঠে ভেজা রোদ ঝলসে উঠেছে। নিরাবরণ, নিরাভরণ ঝিনুক এই মুহূর্তে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কোথাও কোনও প্রাণ নেই। এমনকি সাগর-পাখিরাও ডানা মেলছে না।

কাল রাত্রে ওই শরীর তার শরীরে মিশে গিয়েছিল। সে শুধু অনুভব করেছিল মাত্র, অন্ধকার লঞ্চেও দেখার সুযোগ পায়নি। এখন মনে হল এই বিশাল সমুদ্র যেন প্রাণ ভরে উপভোগ করছে ঝিনুককে। ঝিনুক সেটা জানে। জানে বলেই স্থির হয়ে আছে কোমর জলে।

হঠাৎ জলে আলোড়ন শুরু হল। ভয় পেয়ে ঝিনুক দৌড়তে চাইল তীরের দিকে। যারা জলের নীচে ছোটাছুটি করছে, তারা যে ডলফিন তা বুঝতে পেরে হেসে ফেলল মিলন। সে চিৎকার করল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা ডলফিন।'

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটুজলে চলে আসা ঝিনুক স্থির হয়ে পেছন ফিরল। দুহাতের আড়ালে নিজের বুক রেখে চিৎকার করল সে, 'চলে যাও। এখান থেকে চলে যাও।'

'কেন? এই আকাশ, সাগর এমনকী ওই ডলফিনগুলো যদি দুচোখ ভরে তোমাকে দেখতে পারে, আমাকে কেন চলে যেতে হবে?' চিৎকার করল মিলন।

'উঃ! যা বলছি তাই করো।' কথার মধ্যেই বোধহয় একটা ডলফিন ঝিনুকের পা ছুঁয়ে গেল।

ঝিনুক আর দাঁড়াল না। দ্রুত জল ছেড়ে চলে এসে বালির ওপর ফেলে রাখা পোশাক শরীরে জড়াতে লাগল।

কাছে এসে মিলন বলল, 'মন ভরেও ভরল না।'

'এখানে এসে চোরের মতো লুকিয়ে দেখা তোমাকে মানায় না।'

'আমাকে কী মানায়?'

'বন্ধ ঘরের অন্ধকারে তো দেখেছ।'

'অন্ধকারে অনুভব করেছি, দেখতে পাইনি।'

'দেখার চোখ থাকলে অন্ধকারেও দেখা যায়।' কথাগুলো বলে হাঁসের মতো হেঁটে ঝিনুক ফিরে গেল। মিলন তাকিয়ে দেখল। তার বুকে এখন একটা আস্ত সাগর কী এক সুখে দুলছে।

স্নান সেরে উঠে আসতেই নৌকাটাকে দেখতে পেল মিলন। বহুদূরে একটা কালো বিন্দুর মতো দুলছে। প্রথমে খুব খুশি হয়েছিল সে। নৌকো আসা মানে মূল ভূখণ্ড থেকে খবর আসছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সে দৌড়ল।

ঝিনুক তখন শুকনো পোশাক পরে নিয়েছে। বলল, 'ঠান্ডা হওয়ার আগে ভাত খেয়ে নিলে বোধহয় ভালো লাগবে।'

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?'

মুখ ঘোরাল ঝিনুক, 'লুকিয়ে দেখা আমি পছন্দ করি না।'

'বাঃ! লুকিয়ে কোথায় দেখলাম। স্নান করতে গিয়ে তোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বেশ, আর দেখব না। ওহো, একটা নৌকা আসছে।' মিলন বলল।

'নৌকা!' মুহূর্তেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঝিনুকের।

'নিশ্চয়ই বিন্দু থেকে আসছে। এবার ওদের হাতে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিতে হবে।'

মুখ নামাল ঝিনুক, 'এসো, খেয়ে নাও।'

পোশাক বদলে ভাতের থালা তুলে নিল মিলন। তারপর বুদ্ধিটা মাথায় এল। বাঁশের একটা লম্বা টেবিল তৈরি করতে বেশি কষ্ট হবে না। টেবিলের পাশে বাঁশের বেঞ্চি। সেই বেঞ্চিতে বসে টেবিলে থালা রেখে দিব্যি খাওয়া যাবে।

খাওয়া শুরু করে মিলন বলল, 'বাঃ! দারুণ। দারুণ রাঁধো তো!'

'ধুস!' খেতে-খেতে ঝিনুক বলল।

এই সময় হনুমানটা দৌড়ে এসে ওদের সামনে লাফাতে লাগল। আর তার পরেই লোকটা ছুটে এল। হাত নেড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বোঝাতে চাইল নৌকা আসছে। খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে মিলন সমুদ্রের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু ঝিনুক তার হাত চেপে ধরল, 'আমাকে ভুলে যাবে না?'

'মানে?'

'আমি চলে গেলে আমার কথা মনে রাখবে?'

'তুমি চলে যাবে মানে?'

'আমি জানি, ওই নৌকা আমাকে নিতে আসছে।'

'নিতে এলেই হল? তুমি বলবে যাবে না।'

ম্লান হাসল ঝিনুক, 'তা হয় না। আমি এখানে থাকব কোন অধিকারে? বাবা যদি তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয় তাহলেই আমি এখানে ফিরে আসতে পারি। আমি এখনও বাবার অধীনে।'

'মোটেই তা নয়। তোমার বয়স আঠারোর অনেক ওপরে। জোর করে কেউ তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না। বলো তুমি, এখনই ওদের বলবে।'

ঝিনুকের হাত ধরে সমুদ্রের সামনে আসতেই নৌকাটা স্পষ্ট দেখা গেল। জনা চারেক লোক নৌকা বাইছে, মাঝখানে দুজন বসে আছে।

ঝিনুক নীচু গলায় বলল, 'বাবা নিজে আসছে।'

'কোনজন তোমার বাবা?'

'যার মাথায় টাক।'

নৌকা বালিতে ঠেকে যাওয়ামাত্র মাঝিরা জলে নেমে ওটাকে টেনে অনেকটা ওপরে নিয়ে এল। মধ্যে বসে থাকা লোকদুটো মাঝিদের সাহায্যে বালিতে পা রাখল।

মিলন দেখল ঝিনুক এগিয়ে যাচ্ছে। ওই দুজনের মধ্যে যে মানুষটা একটু মোটাসোটা, টাক মাথা, তার সামনে গিয়ে কিছু বলল। লোকটা মাথা নাড়তে লাগল।

তারপর এগিয়ে এল মিলনের সামনে, 'নমস্কার বাবু। আমি ঝিনুকের বাবা বলে পরিচিত। আপনি চাকরি নিয়ে আসছেন তা অফিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল। আমি বিন্দুতে অফিসের হুকুম অনুযায়ী কাজ করি। আমার নাম গিরিধারী।'

'নমস্কার।' মিলন বলল।

'কিন্তু আমি সমস্যায় পড়ে গেছি। বিন্দুর সব মানুষ জেনে গেছে যে ঝিনুক এই দ্বীপে রাত কাটিয়েছে। আমার মেয়ে এখনও কুমারী আছে কিনা সেই সন্দেহ তারা করছে।' গিরিধারী বেশ

ঘুম-ঘুম গলায় বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল মিলন। লোকটা তার উত্তরের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ওর দু-চোখ আধবোজা। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিও কি এক সন্দেহ করছেন?'

'ঘি আর আগুন একসঙ্গে থাকলে যা হওয়ার তা হবেই।'

'সেটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।'

'আপনি এতটা সময় ওর সঙ্গে থেকেও বুঝতে পারলেন না ও মিথ্যেবাদী?'

'আমি যদি বলি আপনাদের সন্দেহ অমূলক, তাহলে বিশ্বাস করবেন?'

'বিশ্বাস করলে আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি হবে।'

'তার মানে?'

'এই নির্জন দ্বীপে ওর মতো আগুনমেয়েকে একা পেয়েও আপনি নিরাসক্ত যদি থেকে থাকেন তাহলে সংসার জীবন আপনার জন্যে নয়।'

হাসল গিরিধারী। তারপর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলল, নৌকো থেকে মালপত্র নামিয়ে দিতে।

মিলন এই লোকটিকে বুঝতে পারছিল না। তার সঙ্গে ঝিনুকের শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে কিনা জানতে চাইছে। না হলে তাকে খারাপ ভাববে। হলে কী বলবে?

নৌকো থেকে দুটো বড় ঝুড়ি নামানো হল। বোবা লোকটি দৌড়ে এসে সেই ঝুড়ির একটা মাথায় নিয়ে দ্বীপের ভেতরে চলে গেল।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এখনই ফিরে যাবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন।'

'বেশ।'

দ্রুত ফিরে এসে একটা বাগানে তার পরিকল্পনার কথা এবং সেজন্যে যা-যা প্রয়োজন লিখে আবার সমুদ্রের ধারে চলে এল সে। গিরিধারী তখন ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলছিল।

তাকে দেখে হেসে বলল, 'মেয়ে বলছে আপনি নাকি দেবতার মতো। ওর দিকে ফিরেও তাকাননি। এমনকি ও যে খেতে পেরেছে বোবা কালাটা খাবার দিয়েছিল বলে। বিন্দুর লোকজন খুব অবাক হয়ে যাবে একথা শুনলে।'

'কেন?' মিলন চোখ ছোট করল।

'আপনার মতো যুবক এসে এই দ্বীপে চাকরি করছে, খবরটা রটে যাওয়ার পর অনেক মেয়ের বাপ ভাবছিল বিয়ের সম্বন্ধ করবে। তারা আর করবে না।'

'কেন?'

উঠে এল গিরিধারী, 'আপনি বয়সে ছোট। কী আর বলব। এই বয়সে যদি যুবতী মেয়েমানুষকে একা পেয়েও ফিরে না তাকান, তাহলে বুঝতে হবে আপনার শরীরে কোনও সমস্যা আছে। সেটা থাকলে বিয়ে দিয়ে কেউ নিজের মেয়ের সর্বনাশ করতে চায়? হ্যাঁ, বলুন, কী বলছিলেন?'

অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলাল মিলন। তারপর বলল, 'এই চিঠিটা হেড অফিসে পাঠাবেন। খুব জরুরি। ওরা উত্তর দিলে জানিয়ে দেবেন।'

গিরিধারী ঝিনুককে ডাকল, 'ও খুকি, এটা রাখ। কালই হেড অফিসের ঠিকানায় পোস্ট করে দিবি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, চল, নৌকোয় উঠি।'

মিলন জিজ্ঞাসা করল 'ঝুড়িতে কী আছে?'

'হেড অফিস থেকে যা-যা বলেছে সব। আচ্ছা—।'

গিরিধারী নৌকোর দিকে এগিয়ে গেলে ঝিনুক তার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'মিথ্যে বলতে

হল। বুঝলে?'

'আমি কিন্তু কিছু বলিনি।'

'কী করব! পাড়া প্রতিবেশীদের মুখ বন্ধ করতে হবে তো।'

'কিন্তু তোমার বাবা ভেবে নিয়েছেন আমার শরীরে অক্ষমতা আছে।'

'ভালোই তো। আবার আসতে চাইলে বাধা দেবে না। চলি।'

'কবে দেখা হবে?'

'আগে গায়ের ব্যথা কমুক। তারপর ভাবব।' ঝিনুক এগিয়ে গেল নৌকোর দিকে। নৌকো জলে ভাসল। গিরিধারী শুয়ে পড়েছে এর মধ্যে।

ঝিনুক তার দিকে তাকিয়ে আছে। নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে। মিলনের মনে হল ঝিনুক তাকে দেখছে না। এই দ্বীপ, দ্বীপের গাছপালা চোখের ভেতর ভরে নিচ্ছে।

দেখতে-দেখতে নৌকোটা বিন্দু হয়ে গেল। গিরিধারী বলল, তার মেয়ে মিথ্যেবাদী। কথাটা সত্যি ছিল মিলনের কাছেও। কিন্তু এই দ্বীপে আসার পরে যা-যা ঘটেছে, যেসব কথা বলেছে ঝিনুক, তার সবটাই কি মিথ্যে?

ফিরে এসে মিলন দেখল দুটো ঝুড়ি থেকে জিনিসপত্র বের করে ফেলেছে বোবা লোকটা। একটাতে সংসার চালানোর যাবতীয় সামগ্রী, যা অন্তত মাসখানেক তাদের সমস্যায় ফেলতে দেবে না। দ্বিতীয়টায় নানান ধরনের বীজ এবং সারের প্যাকেট। দুপুরটা এগুলো নিয়ে কেটে গেল ওদের। ভেঙে যাওয়া বেড়া, ঘরের ভাঙা কাঠ মেরামত করতে-করতে বিকেল এল।

মিলন আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ নেই। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। এখনই হাঁটলে হয়তো অন্ধকার নামার আগে লঞ্চে পৌঁছনো যায়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে হল না। ঝিনুকের স্মৃতি ওখানে ছড়ানো। আজ সে চলে গেছে। ওখানে গেলে নিজেকে খুব একা মনে হবে। তার চেয়ে আজ টঙের ওপর শুয়ে থাকা ভালো।

এই সময় হনুমানটা চেঁচাতে-চেঁচাতে সমুদ্রের দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে এল। লোকটা তার ভাষা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। নইলে সে দ্রুত সমুদ্রের দিকে যাবে কেন? এদের ব্যাপার দেখে কৌতূহলী হয়ে মিলন পা বাড়াল।

একটা ডিঙি নৌকো সমুদ্রের ধার ধরে এগিয়ে আসছে। দুটো লোক নৌকো বাইছে। এই ধরনের অতি সাধারণ নৌকো সমুদ্রের ভেতরে গেলেই ডুবে যাবে। যে লোক দুটোকে নৌকো বাইতে দেখা যাচ্ছে, তাদের পরনে কৌপিন গোছের পোশাক ছাড়া কিছু নেই। নৌকোটা এত হালকা যে হাঁটুজলে চলে আসতে পারল। এবং তখনই নৌকোর খোলের মধ্যে একটি মেয়েকে শুয়ে থাকতে দেখল মিলন।

নৌকোটাকে বালিতে আটকে লোকদুটোর একজন অদ্ভুত ভাষায় আবেদনের ভঙ্গিতে কিছু বলে বারংবার মেয়েটাকে দেখাতে লাগল।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমরা? কোথায় থাকো?'

এবার দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে এল, হাত তুলে ঝাপসা হয়ে আসা একটা দ্বীপ দেখিয়ে দিল। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'হিন্দি জানো?'

লোকদুটো পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সময় বোবা লোকটা গম্ভীরমুখে এগিয়ে এসে হাত নেড়ে জানতে চাইল, কী হয়েছে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে তড়বড় করে যা বলল তার কিছু বুঝতে পারলেও উচ্চারণের জন্যে স্পষ্ট হল না মিলনের কাছে। লোকটা হাত তুলে ওদের থামিয়ে বেশ গম্ভীর মুখে মিলনের সামনে এসে হাতের মুদ্রায় বোঝাতে চাইল, নৌকোয় যে মেয়েটা শুয়ে আছে তার গায়ে খুব জ্বর। কথা বলতে পারছে না। ওরা ভয় পাচ্ছে মেয়েটা মরে যাবে। ওদের কোনও উপায় নেই বলে এখানে এনেছে। যদি ওষুধ দিয়ে বাঁচানো যায়।

মিলন নৌকোর পাশে চলে গেল। মেয়েটি মাথা এক পাশে হেলাল। সারা শরীর গুটিয়ে রয়েছে। পরনে একটি ছেঁড়া শাড়ি, গায়ে জামা নেই। সে কপালে হাত রেখে চমকে উঠল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কিছু ওষুধ আছে। জ্বরের জন্যে ক্রোসিন, ক্যালপল, মাথা ধরার জন্যে ডিসপ্রিন আর পেট খারাপের জন্যে কিছু ওষুধ। একমাত্র ক্রোসিন খাওয়ানো ছাড়া সে আর কোনও ওষুধ দিতে পারে না। সে বোবা লোকটাকে বলল, 'ওকে এখান থেকে তুলে রান্নাঘরে নিয়ে চল।'

বোবা লোকটা সেই আদেশ ইশারায় ওই দুজনকে জানাতে ওরা ধরাধরি করে মেয়েটাকে রান্নাঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল। মেঝেয় বালির ওপরে ত্রিপলের আড়াল ছিল। মিলন তার ব্যাগ থেকে ক্রোসিন বের করে এক কাপ জলে গুলে মেয়েটির মুখ ফাঁক করে ধীরে-ধীরে খাইয়ে দিল।

মেয়েটির চোখ বন্ধ। ওর শরীরে একটা মোটা কাপড় চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'ভগবানকে ডাক। যদি ওষুধে কাজ হয় তাহলে কাল সকালে জানা যাবে।'

তারপর বোবা লোকটাকে বলল, 'রাত হয়েছে। আমার খাবার তুমি ওপরে দিয়ে এসো। আমি উঠে যাচ্ছি।'

টঙে বসে মিলন দেখল যে লোকদুটো মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল তারা ঘরের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। বোবা লোকটা ওদের ভাত আর আলু সেদ্ধ দিয়েছিল। তাই ওরা গোগ্রাসে খেয়ে নিয়েছে।

এই টঙে বসে সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। আজ সমুদ্র শান্ত। এই লোকদুটো খুব ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে নৌকোয় নিয়ে এসেছে। এদিকের শেষ দ্বীপ এই দারুচিনি। আশপাশে কিছু নাম না জানা দ্বীপে মানুষ থাকে। মাছ ধরেই তারা বেঁচে থাকে। কিন্তু সেই বেঁচে থাকাটা একেবারে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ডাক্তার দূরের কথা, কেউ কখনও ওষুধের নাম শুনেছে বা খেয়েছে বলে মনে হয় না।

এই যে মেয়েটাকে ওরা এখানে এনেছে শেষ আশার ওপর নির্ভর করে। এই দ্বীপে নৌকো আসে বিন্দু থেকে, শহরের মানুষ এখানে থাকে, এসব তথ্য নিশ্চয়ই ওরা জানে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে এরা কখনও দ্বীপের বাইরে সমুদ্র ছাড়িয়ে কোথাও যায় না। অন্য দ্বীপে তো নয়ই। হয়তো অনেকে সামান্য অসুস্থ হয়েও ওষুধের অভাবে মারা যায়।

কিন্তু এই মেয়েটির বাবা-কাকার স্নেহ প্রবল বলে ওকে নিয়ে এসেছে এখানে। সে কী করতে পারে? তার ডাক্তারি বিদ্যে নেই। থাকলেও বিনা ওষুধে নিশ্চয়ই ডাক্তারি করা যায় না। নিজের শরীর খারাপ হলে খাবে বলে যে ওষুধ সে নিয়ে এসেছে, তা মেয়েটির কতটা উপকার করবে ঈশ্বরই জানেন।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল মিলনের। জঙ্গলের ওপারে নদীর ধার থেকে হুঙ্কার ভেসে আসছে। কোনও চেনা জন্তুর গলার আওয়াজ ওটা নয়। আত্মরক্ষার জন্যে লঞ্চ থেকে রিভলভারটা নিয়ে আসা দরকার। সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল বোবা লোকটা জমিতে আগুন জ্বালছে। তাকে সাহায্য করছে মেয়েটাকে নিয়ে আসা লোকদুটো। আগুনটা বেশ লকলকে হয়েছে। যত হিংস্র হোক আগুনকে ভয় পায় না, এমন জানোয়ার বোধহয় নেই।

চিত হয়ে শুল মিলন। আকাশটা তারায় ভরে গেছে। অথৈ নীলে অজস্র হিরে জ্বলছে। ঝিনুক চলে গেল। বিন্দুর আকাশে এখন কি এইসব তারাদের এরকম দেখা যাচ্ছে? এই জীবনে ঝিনুকই প্রথম নারী যে সরাসরি তার বুকের ঘর দখল করে নিয়েছে। লঞ্চে রাতের বেলা দিনের বেলা একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখন চোখ বন্ধ করলে ঝিনুকের শ্বাসের তাপ, ঠোঁটের গন্ধ সহজেই টের পাচ্ছে সে। কিন্তু বিন্দুতে পৌঁছে ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলেও সম্ভব নয়। বড় নৌকোয় দক্ষ কয়েকজন মাঝি ছাড়া সমুদ্রের ঢেউগুলো সামলে পৌঁছনো যাবে না ওখানে। বিন্দু থেকে ঝিনুক তার কাছে আসবে। ও যতই মিথ্যে বলুক, মিলন জানে এই কথাটা সত্যি বলেছে ও।

এই যে টঙের ওপর শুয়ে আছে সে তারাদের সঙ্গী করে, কয়েকদিন আগে কল্পনা করেনি। এতদিন যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, অভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে-নিতে একসময় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সেই জীবন থেকে নিষ্কৃতির কোনও পথ জানা ছিল না। মানুষ হিসেবে প্রতিদিন নিজের কাছেই একটু-একটু করে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। হীনম্মন্যতাবোধ ধীরে-ধীরে চেপে বসছিল মনে। একটার-পর-একটা চাকরির আবেদন করে সাড়া না পাওয়ার যন্ত্রণা তাকে কুরেকুরে খাচ্ছিল।

একেবারে হঠাৎই আকাশ থেকে পড়ার মতো এই চাকরিটা তার কাছে এসে গেল। একটি নির্জন দ্বীপে সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে থাকতে হবে যেখানে কোনও সামাজিক জীবন নেই। প্রথমে একটু যে অস্বস্তি হয়নি তা নয়। কিন্তু মন বলেছিল, দেখাই যাক না। আজ সেই মন বলছে, ভালো হয়েছে। এই সমুদ্র, বালিয়াড়ি, ডলফিন, গাছগাছালি, এই পরিত্যক্ত লঞ্চ তার জীবনটাকে চমৎকার বদলে দিয়েছে। শুধু ঝিনুক আসার পরে মনে হচ্ছে তাকে পেলে সে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাবে না।

সকাল হল। টং থেকে নেমে ঝরনা থেকে এনে রাখা জলে মুখ ধুয়ে দেখল রান্নাঘরের দরজায় লোকদুটো বসে তাকে দেখছে। বোবা লোকটা কাছাকাছি ছিল। তাকে ইশারায় ঘরের ভেতর যেতে বলল। সে এগোতে লোকদুটো সরে গেল জায়গা করে দেওয়ার জন্যে।

মেয়েটা শুয়ে ছিল কাল রাতের মতো। একটু ঝুঁকে ওর কপালে হাত রেখে অবাক হল মিলন। জ্বর অনেক কমে এসেছে। এখন একশোর আশেপাশে রয়েছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকদুটোকে বলল, 'মনে হচ্ছে ভালো হয়ে যাবে।'

তার হাত নেড়ে কথা বলা থেকেই বোধহয় ওরা আশার খবর পেল। দুজনের মুখে হাসি ফুটল। একজন ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে এখন নিয়ে যেতে পারে কিনা!

মাথা নাড়ল মিলন, না। আরও তিন-চার দিন ওর শুয়ে থাকা উচিত।

লোকদুটো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারপর ধীরে-ধীরে নৌকোয় উঠে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল। সঞ্চয় করে রাখা মুরগির ডিম খান ছয়েক সেদ্ধ করে ফেলল মিলন। কাল যে ঝুড়ি এসেছিল, তাতে আলু পেঁয়াজ ছাড়া প্রচুর তরিতরকারি, তেল নুন রয়েছে। খানিকটা চা পাতা আর চিনিও দেখতে পেল সে। কালো চা চিনি মিশিয়ে চুমুক দিয়ে দেখল, মন্দ লাগছে না। তারপর মেয়েটার পাশে বসে ডাকল, 'এই যে মেয়ে, শুনতে পাচ্ছ? এই যে।'

চোখের বন্ধ পাতা সামান্য নড়ল। তারপর অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকল মিলনের দিকে। বোবা লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিলন বলল, 'এই দুটো ডিম তোমার। আর বাকি দুটো চামচ দিয়ে কেটে কেটে ওকে খাইয়ে দাও। মাঝে-মাঝে চা মুখে দিয়ে দিও। বুঝতে পেরেছ?'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা দু-হাত নেড়ে আপত্তি জানাল। তারপর নিজের ভাগের ডিম তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটা প্লেটে ডিমদুটো, চামচ আর চায়ের কাপ নিয়ে মেয়েটার পাশে বসতেই সে ওর মুখে প্রতিবাদ এবং ভয়ের মিশেল দেখতে পেল। মিলন নরম গলায় বলল, 'ভয় নেই। তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে এখানে আনা হয়েছে। এখন তোমাকে কিছু খেতে হবে।'

কথাগুলো যে কোনও কাজে লাগছে না তা বলতে-বলতেই বুঝতে পারছিল মিলন। মেয়েটা চোখ বন্ধ করল। সে ওর কপালে হাত রাখল। মেয়েটা মুখ সরাতে চাইল। শরীরে শক্তি না থাকলেও সে প্রতিবাদ করতে চাইছিল।

বেশ জোর করেই মাথায় হাত বুলিয়ে গেল মিলন। কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটা যেন বাধ্য হয়ে মেনে নিল, কিংবা ওর হয়তো একটু আরাম লাগছিল। হাত বোলাবার সময় অবিরাম কথা বলে যাচ্ছিল মিলন নরম গলায়। মেয়েটা আবার চোখ খুলল। সন্দেহের চোখে মিলনকে দেখতে লাগল।

মিলন হাসল, 'তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

মেয়েটার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

চামচ দিয়ে এক টুকরো ডিম কেটে নিয়ে মিলন মেয়েটার ঠোঁটের সামনে ধরতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে বেশ জোরে ধমক দিল মিলন। মেয়েটা এমন হকচকিয়ে গেল যে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। চোখ বড়। মিলন চট করে ডিমের টুকরোটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'খাও।' বলে চিবোনোর ভঙ্গি করল।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতে মেয়েটা চিবিয়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠতে মিলন ধমক দিল আবার। প্রায় বকেঝকে ডিম এবং ক্রোসিন ট্যাবলেট খাইয়ে বলল, 'এবার ঘুমাও।'

দুই ঝুড়ি জিনিসপত্র থেকে বাগানের জন্যে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো বের করে কাজে লেগে গিয়েছিল বোবা লোকটা। বাইরে বেরিয়ে এসে মিলন তাকে দেখিয়ে দিল সে কী চাইছে। মাঝে-মাঝে হাত লাগাল সে।

এই ফাঁকে হনুমানটা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। একটা গাছের মগডালে পাখি বাসা করেছিল। তাতে সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা ছানাদের একটিকে তুলে নীচে নেমে এল। তারপর বেশ মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে দুহাতের পাতায় বাচ্চাটাকে রেখে বোবা লোকটাকে দেখাতে লাগল। বোবা লোকটা অবোধ্য শব্দে ধমকাতে লাগল হনুমানকে। তাতে হনুমান বুঝে গেল, কাজটা ভালো করেনি।

বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়ে সে অপরাধীর মতো মুখ করে একটু দূরে গিয়ে বসল। মাথার ওপরে তখন মা পাখি সমানে চিৎকার করছে আর উড়ছে। মিলন লোকটাকে ইশারায় বলল, ছানা পাখিকে ওর বাসায় রেখে আসতে।

লোকটা মাথা উঁচু করে বাসাটা দেখে হাত নাড়ল। ওই নরম মগডালে তার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়। কথাটা ঠিকই। একমাত্র ওই হনুমান পারে যেখান থেকে এনেছিল সেখানে ছানা পাখিকে পৌঁছে দিতে। কিন্তু ওকে কে বোঝাবে!

ফলে এই দ্বীপের সংসারে আর-একটা প্রাণী বাড়ল। একটা ছোট্ট ঝুড়িতে ঘাস বিছিয়ে তার জন্যে বিছানা করা হল। সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা হল রান্নাঘরের দেওয়ালে। বোবা লোকটা হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটা ফড়িং ধরে নিয়ে এসে হাঁ করে থাকা ছানার মুখে একটার ছোট্ট শরীর ঢুকিয়ে দিতে সে গপ করে গিলে ফেলল। হনুমানটা চোখ বড় করে দৃশ্যটা দেখল।

দুপুরে মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শরীর যে খুবই দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছিল। এখন ওর শরীরে শুধু ছেঁড়া শাড়িটা জড়ানো, মিলন অবাক হল। এত অভাব, এত কষ্টের মধ্যে ভগবান কী করে যে ওর শরীরে এত যৌবন দিলেন কে জানে!

দুপুরে আজ শুধু আলু সেদ্ধ, ডাল ভাত আর ডিমের ওমলেট। লোকটা রাঁধছিল। মিলন গেল সমুদ্রে স্নান করতে। প্রায় কোমর জলে পৌঁছে সামনের দিকে তাকিয়ে সে খুশি হল। আজ কোনও বড় ঢেউ সমুদ্রে নেই। তাই বহুদূর পর্যন্ত জলরাশি চোখের সামনে।

প্যাপিলন নামের একটা আশ্চর্য উপন্যাস পড়েছিল সে। একটি লোককে বিনা দোষে স্প্যানিশ সরকার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়েছিল ডেভিড আইল্যান্ডে। সেখান থেকে কেউ ফিরে আসত না। চারধারে কয়েকশো মাইল ভয়ঙ্কর আতলান্তিক সমুদ্র। তবু লোকটা অনেকবার চেষ্টা করেছে পালাতে। ধরা পড়ে কঠোর শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপনে একটি ডিঙি নৌকো তৈরি করে সে সমুদ্র পার হতে পেরেছিল।

মাথা নাড়ল মিলন। কেউ-কেউ পারে, সবাই নয়।

জলে শব্দ হল। সেই বাচ্চা ডলফিনটা তার শরীর ছুঁয়ে খেলায় মেতেছে। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ

কাটিয়ে স্নান শেষ করে ওপরে উঠে এসে গায়ের জল মুছতে গিয়ে দেখল বাচ্চাটা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। শরীর নাড়িয়ে মুখ থেকে একটা ছোট ভেটকি মাছ ছেড়ে দিয়ে আবার জলে ফিরে গেল। ভেটকিটা মুক্তি পেয়ে লাফাচ্ছিল। তার চেষ্টা ছিল গভীর জলে ফিরে যাওয়া, কিন্তু মিলন চট করে ধরে ফেলল তাকে। বালির ওপর মাছটাকে ফেলে দিয়ে শুকনো বারমুডা শরীরে গলিয়ে সে মাছটাকে নিয়ে ফিরে এসে লোকটাকে দিল।

লোকটা দুবার মাথা ঝুঁকিয়ে মাছটাকে নিয়ে পরমানন্দে বসে গেল তার সদ্‌গতি করার জন্যে। ও যেভাবে মাথা ঝাঁকাল তাতে পরিষ্কার যে খালি হাতে সমুদ্র থেকে মাছ যে ধরে তাকে সে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

মিলন হাসতে গিয়ে অবাক হয়ে তাকাল। ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটা ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হাঁটতে ওর কষ্ট হচ্ছে বোধহয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন এড়াতে পারছে না। একবার মনে হল ওকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু মেয়েটা সঙ্কোচে পড়বে ভেবে স্থির হয়ে থাকল।

কোথায় ছিল হনুমানটা, দৌড়ে চলে গেল মেয়েটার কাছে। মেয়েটা হাত নেড়ে তাকে সরে যেতে বলল। হনুমানটাও নাছোড়! সে পাশে-পাশে হাঁটছে। মিলন চিৎকার করতেই হনুমান দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরেও যখন মেয়েটা ফিরে এল না, তখন মিলন এগিয়ে গেল। সমুদ্রের ধারে গিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাতেই মেয়েটাকে বালির ওপর উঁচু হয়ে বসে থাকতে দেখল। এই বিশাল জলরাশির সামনে ওই ভঙ্গি কী করুণ দেখাচ্ছে।

সে ধীরে-ধীরে মেয়েটার পাশে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কপাল স্পর্শ করল। না। জ্বর নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। এমন হওয়া বোধহয় অসম্ভব নয়। যে মেয়েটি জীবনের কোনওদিন ওষুধ খায়নি, যার শরীর কোনও ওষুধের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত নয়, তার শরীরে ক্রোসিনের মতো একটি জ্বর-ব্যথা কমানো ওষুধ প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তার ফলে জ্বরে মৃতপ্রায় এই মেয়েটি, এখন হেঁটে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে! জ্বরও চলে গেছে। কিন্তু ওর শরীরে সমুদ্রের জোলো বাতাস লাগছে। যে কাপড়টি ও পরে আছে তাতে এত ফাঁকফোকর যে শরীর ঢাকা পড়ছে না।

মিলন বলল, 'এখানে বসে থেকো না। ওঠো।'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই মিলন দেখল দুটো চোখ তো বটেই, গাল জলে ভিজে রয়েছে। মেয়েটা এইভাবে এখানে বসে কাঁদছিল?

সে মাথায় হাত বোলাল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। কালই তুমি তোমার জায়গায় ফিরে যেতে পারবে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই নিতে আসবে।'

মেয়েটা চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। ভাষা বুঝতে পারেনি ও। মিলন হাতের ইশারায় বোঝাল, সে দূরের দ্বীপে চলে যেতে পারবে। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি মাথা নাড়ল প্রবল বেগে। সে যাবে না।

দ্বিতীয় রাত কেটে গেলে মেয়েটি খানিকটা স্বাভাবিক হল। কাল থেকে আর জ্বর আসেনি বলে ক্রোসিনের বদলে ক্যালপল গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে ওকে খাওয়াল মিলন। এখন আর কোনও আপত্তি জানাচ্ছে না খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে। মিলনের মনে হল আজ ওর স্নান করা উচিত। সমস্ত শরীরে ময়লা শক্ত হয়ে বসে আছে। ইশারায় সেটা বোঝাতে মেয়েটা খুব খুশি হল।

কিন্তু যারা ওকে এখানে পৌঁছে দিয়েছিল, তাদের আর দেখা নেই। মেয়েটা শেষপর্যন্ত বাঁচল না মরল সে খবর নেওয়ার গরজ ওদের নেই। ওরা ওর কোনও শাড়ি বা পোশাকও দিয়ে যায়নি। স্নান করে যদি ও ভেজা ছেঁড়া শাড়ি শরীরে জড়ায় তাহলে আবার অসুস্থ হতে বাধ্য। ঝিনুকের ব্যবহার করা বারমুডা আর গেঞ্জি এনে মেয়েটিকে দিল সে। স্নানের পর আপাতত এটাই পরুক।

কাল থেকে আর একটা ঘটনা ঘটছে এখানে। হনুমানটা আচমকা লোকটার সঙ্গ ছেড়ে মেয়েটার কাছে ঘুরঘুর করছে। এখন ওকে একটুও ভয় পাচ্ছে না মেয়েটা। আড়াল থেকে মিলন শুনেছে, মেয়েটা দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলছে আর হনুমান তা শুনতে-শুনতে মাথা নাড়ছে। দেখলে মনে হবে মেয়েটার সব কথা বুঝতে পারছে সে। মেয়েটি যেখানে থাকছে সেখান থেকে নড়ছে না হনুমানটা। তার এতদিনের সঙ্গী বোবা লোকটা বারংবার মুখে আওয়াজ করেও তাকে কাছে আনতে পারছে না।

স্নান করে মেয়েটা যখন সমুদ্র থেকে ফিরে এল, তখন বোবা লোকটাও হাঁ করে থাকল। ছেঁড়া শাড়ির আড়াল যা অনুমানে ছিল তা বারমুডা এবং গেঞ্জির কল্যাণে স্পষ্ট হওয়ায় দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে। মেয়েটার কিন্তু কোনও সঙ্কোচ হচ্ছে না। এখন তার মুখ চোখ এবং হাত-পায়ের চামড়া বেশ পরিষ্কার। তামাটে রংটা অনেকটা উজ্জ্বল।

দুপুরের খাওয়ার পর মিলন লোকটাকে ইশারায় বোঝাল, সে লঞ্চে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল লোকটা। বারংবার মেয়েটার দিকে আঙুল তুলে কিছু বলতে চাইল। মিলন বলল, 'মনে হচ্ছে আজ ওর আত্মীয়রা এসে ওকে নিয়ে যাবে। আমি চেষ্টা করব সন্ধের আগেই ফিরে আসতে।'

মেয়েটার দিকে হাত নেড়ে রওনা হল মিলন।

এখন জঙ্গুলে পথ আর অচেনা নয়। লাঠি দিয়ে ডালপাতা সরিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছিল মিলন। মাঝখানে কয়েক হাত ন্যাড়া জায়গা। সেখানে পা রাখতেই যেন মাটি ফুঁড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল ফণা তুলল সাপটা! তার গায়ের রং কুচকুচে কালো।

সাপটা লেজের ওপর দাঁড়িয়ে একটু দুলছে। সরু জিভ দুবার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। দুজনের যে দূরত্ব তাতে সাপটা ছোবল মারলে মিলনের পা পেয়ে যাবে।

মিলন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সাপের চোখে চোখ রেখে। সামান্য নড়লেই সাপ ছোবল মারবে। শিরশির করছিল মেরুদণ্ড। সে বুঝতে পারছিল তার কপালে ঘাম জমছে। একটা সেকেন্ডকে অনেকটা সময় বলে মনে হচ্ছিল।

এই সময় মাথার ওপরের গাছের ডাল থেকে কিছু একটা পড়ল তাঁর কাঁধে। ওটা নড়ছে। কিন্তু ওদিকে তাকাতে সাহস পেল না সে।

সাপটা যেন হঠাৎ কিছুটা বিভ্রান্ত। আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাল মিলন। ডান হাতে ধরা লাঠিটা সজোরে চালাল সাপের শরীর লক্ষ করে। এরকম আক্রমণ ভাবতে পারেনি সাপটা। মাজা ভেঙে ঘাসের ওপর পড়ে ছটফট করতে লাগল।

চটপট হাত দিয়ে গলার কাছে উঠে আসা প্রাণীটিকে সজোরে আঘাত করতেই সেটা ছিটকে পড়ল সামনে। একটা লালচে রঙের বড় মাকড়সা। সারা শরীরে শুঁয়ো। কাঠির ডগায় চেপে ওটাকে মেরে ফেলল সে। সাপটা বোধহয় এটাকে দেখেই মনোসংযোগ হারিয়েছিল।

এর আগেও সাপ এখানে দেখেছে সে। এর চেয়ে ঢের বড় সাপ এই জঙ্গলে বাস করছে। কিন্তু আজ সাপের সঙ্গে চোখাচোখির মুহূর্তগুলো সে সারাজীবনে ভুলবে না।

যেখানে লঞ্চ থাকার কথা সেখানে গিয়ে অবাক হল মিলন। লঞ্চ নেই। কেউ ওই লঞ্চ চালিয়ে নিয়ে যাবে, এমন কোনও সম্ভাবনাই নেই। যাওয়ার সময় সে ওটাকে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। তাহলে কী করে এখান থেকে চলে গেল?

জঙ্গল ভেঙে নদীর ধার দিয়ে হাঁটা বেশ মুশকিল কাজ। তবু সেই চেষ্টা করল সে। মিনিট দশেকের মধ্যে ছোট সাপ, বিছে, মাকড়সার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে হল। নদী যেখানে ঈষৎ

বাঁক নিয়েছে, সেখানে জঙ্গলটা যেন হুমড়ি খেয়ে জলে নেমে পড়েছে। তার ভেতরে লঞ্চের পেছন দিকটা দেখতে পেল সে। হয় দড়ি কোনও কারণে ছিঁড়ে যাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে লঞ্চ ওখানে ঢুকে পড়েছে, নয়তো কেউ ওই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়টি ঘটনা হলে বুঝতে হবে এই দ্বীপে আরও মানুষ আছে।

দ্বীপে মানুষ থাকলে তারা একবারও জমিতে আসবে না, এটা ভাবা যায় না। এলে তাদের কথা আগের বুড়ো নিশ্চয়ই জানাত। ওইসব মানুষরা, তর্কের খাতিরেও যদি ধরা হয়, বুড়ো এবং বোবা লোকটাকে এড়িয়ে চলত বলে জমির দিকে পা বাড়িয়ে দেখা দেয়নি, তাহলেও তাদের পক্ষে কি একটা লঞ্চ লুকিয়ে রাখা সম্ভব?

লাঠির সাহায্যে পথ কোনওরকমে করে মিলন নদীর বাঁকের জায়গায় চলে আসতে পারল। এখন লঞ্চটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই পেছনের দিক থেকে। গাছের ডালগুলো ওর ওপর আড়াল তৈরি করেছে। কিন্তু পাড় থেকে লঞ্চে ওঠা যাবে না। কারণ দূরত্বটা অনেক। জলে পা দেওয়ার কথাই ওঠে না। কুমিরগুলোকে আশপাশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শেষপর্যন্ত নীচু হয়ে থাকা একটা শক্ত ডালে উঠে দাঁড়াল মিলন। ডালটা দুলছে। এবং তখনই পায়ে লাল-লাল পিঁপড়ে পিলপিল করে উঠে কামড়াতে লাগল। দ্রুত কিছুটা এগিয়ে ঝাঁপ দিল মিলন। লাঠিটা লঞ্চের ছাদে পড়ে আটকে রইল। অনভ্যাসের আঘাত সামলে উঠতে কয়েক সেকেন্ড লাগল।

মিলন লাঠি তুলে নিয়ে গুঁড়ি মেরে সামনের দিকে এগিয়ে লঞ্চের সামনের ডেকে নেমে পড়ল। নামতেই চক্ষু স্থির। ডেকের অনেকটাই কেউ ভেঙে ফেলেছে। ভেতরে ঢোকার দরজা অবশ্য বন্ধ। সেখানে কোনও ভাঙচুর হয়নি।

দরজা খুলে ভেতরে পা দিল মিলন। দিয়েই দরজাটা বন্ধ করল। দুটো পা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে গিয়ে বুঝল আলো দরকার। লঞ্চের ভেতরটায় তখন সন্ধের অন্ধকার। বাইরে যদিও সূর্য ডুবে যায়নি, কিন্তু গাছগাছালির মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা জানলাবন্ধ লঞ্চে আলো ঢুকছে অতি সামান্য।

মোমবাতি কোথায় রেখেছিল জানা ছিল। সেটা জ্বালিয়ে মিলন দেখল দুটো পায়ে প্রচুর চাকাচাকা ফোলা তৈরি হয়েছে। খুব চুলকোচ্ছে। যে ক'টা পিঁপড়ে তখনও সেঁটে ছিল তাদের পা থেকে ফেলে পিষল সে। তারপর দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে হুইস্কির বোতল বের করে খানিকটা হুইস্কি ফোলা জায়গাগুলোতে বুলিয়ে দিতে একটু আরাম লাগল।

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে চারপাশে তাকাল মিলন। মোমবাতির আলোয় চারপাশ বেশ রোমান্টিক লাগছে। এই ক'দিনেই লঞ্চের ভেতরটা যেন তার নিজের বাড়িঘর হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে লঞ্চ থাকলে সে নিরাপদে থাকবে না। যে জন্তু ওই ডেকের ওপরের অংশ ভেঙেছে সে সহজেই গাছ বেয়ে নেমে আসবে। ভেতরে মানুষ আছে বুঝতে পারলে দরজা ভাঙতে তার কোনও অসুবিধে হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে হলে লঞ্চটাকে এখান থেকে সরাতে হবে। মিলন দ্বিতীয় ঘর থেকে বেরিয়ে ইঞ্জিন ঘরে চলে এল।

সুইচ টিপতেই একশো পাওয়ারের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইঞ্জিন চালুর বোতাম টিপল সে। প্রথমবার কোনও শব্দ হল না। দ্বিতীয়বারে বেশ জোরে আওয়াজ করে উঠল ইঞ্জিন।

লঞ্চের সামনের দিকটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। এর আগে সে লঞ্চ চালিয়েছে সামনের দিকে। পেছনে কী করে চালাতে হয় তা অজানা। ফাঁপরে পড়ল মিলন। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে যন্ত্রের গায়ে লেখাগুলো পড়ে হাতল ঘোরাতেই লঞ্চটা দুলে উঠে পেছন দিকে যেতে শুরু করল। কিন্তু সেইসঙ্গে বিকট শব্দ বেরুতে লাগল ইঞ্জিন থেকে।

শেষপর্যন্ত জঙ্গলের আওতা থেকে বেরিয়ে এল লঞ্চটা। খোলা নদীর বুকে কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মিলন। সঙ্গে-সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল জলযান। আলো নিভিয়ে দিল সে। এখন যথেষ্ট আলো ভেতরে ঢুকছে জানলা দিয়ে।

এই নদীতে ঢেউ নেই। স্রোতও। কিন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল যখন ঢোকে তখন তা ভেতরে চলে যায় আবার ভাটার সময় টান পড়ে সমুদ্রের দিকে এগোবার। বাকি সময়টা জল থাকে স্থির। কখন ভাটা বা জোয়ার আসবে জানা নেই। তাই এখন যেখানে লঞ্চ রয়েছে, সেখানে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মিলন লঞ্চটাকে আগের জায়গায় নিয়ে এসে দেখল, যে দড়িতে সে লঞ্চটাকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধেছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া অংশ এখনও গাছের ডালে ঝুলছে। মিলনের মনে পড়ল স্টোররুমে অনেক কিছুর মধ্যে একটা লম্বা কিছু দেখেছিল। সেটা শেকল হতে পারে। মোমবাতি নিয়ে স্টোররুমে গিয়ে খানিকটা খোঁজাখুঁজির পরে বেশ লম্বা একটা শেকল পেয়ে গেল সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাছের ডালে নয়, গুঁড়ির দিকটায় শেকল জড়িয়ে লঞ্চের সঙ্গে আটকে দিল সে। এর ফলে শেকলটা জলের একটু ওপরে ঝুলে থাকল। ডাঙা এবং লঞ্চের দূরত্ব অন্তত পনেরো ফুট তো বটেই।

যদি কেউ শেকল ধরে আসতে চায় তাহলে তাকে জলে পড়তেই হবে। জলে পড়া মানে কুমিরের পেটে যাওয়া। লঞ্চ থেকে ডাঙায় যেতে হলে শেকল ধরে টান দিলে লঞ্চ এগিয়ে যাবে ওদিকে।

নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা ভালো করে বন্ধ করেও ভেতর থেকে গোঁজ দিয়ে রাখল যাতে সহজে কেউ ঢুকতে না পারে। সন্ধে নামছে। এখন জমিতে ফিরে যেতে চাওয়া মানে সরাসরি যমের বাড়ি যাওয়া।

হয়তো মেয়েটাকে এর মধ্যে ওর অভিভাবকেরা নিয়ে গেছে। না নিলেও হনুমানটার সঙ্গে দিব্যি থাকবে। বোবা লোকটা, হনুমান আর এই মেয়েটার একটা মিল আছে। ওদের কথা বলার জন্যে কোনও ভাষার দরকার হয় না।

এ্যাকুয়াগার্ড খুলে জল খেল মিলন। তারপর কিচেনে চলে এসে ডাবলডিমের ওমলেট বানাল। একটা টিনফুড তুলে নিয়ে দেখল, ওপরে টুনা ফিশ লেখা রয়েছে। রাত্রে ভাতের সঙ্গে এই টুনা মাছ চলতে পারে।

সঙ্গে-সঙ্গে পুরোনো অভিজ্ঞতা মনে পড়ে যাওয়ায় খুশি হল সে। ছিপটা খুঁজে বের করে বড়শিতে ওমলেটের টুকরো গেঁথে জানলা খুলে দেখল, কুমিরগুলো আশেপাশের জলে আছে কিনা। জল নিস্তরঙ্গ দেখে সে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর বড়শি জলে ফেলল। মিনিট খানেক যেতে-না-যেতে সুতোয় টান পড়ল। ছিপ ওপরে তুলতে গিয়ে মিলন বুঝল, বেশ ভারী কিছুর মুখে বড়শি আটকে গেছে।

সে ছিপ নীচে নামাল যাতে সুতো ছিঁড়ে না যায়। ঠিক তখনই প্রবল বেগে একটা ছোট কুমির ছুটে এসে সুতোর পাশ দিয়ে চলে যেতেই ওজনটা কমে গেল। দ্রুত ছিপ ওপরে তুলতেই একটা কাতলা মাছের অর্ধেকটা দেখতে পেল সে।

মাছটাকে ওপরে নিয়ে এসে জানলা বন্ধ করে বুঝল, ওর পেট থেকে লেজের অংশটা কুমিরের পেটে চলে গেছে। বাকি অর্ধেকটা বড়শির কল্যাণে এখনও আটকে রয়েছে। এই অংশের সাইজ দেখে অনুমান করা যায়, অন্তত চার কেজি ওজন ছিল মাছটার। ওটাকে সে কিছুতেই জলের ওপর থেকে তুলতে পারত না। কুমির তার উপকারই করেছে।

এখন কথা হল, কুমিরে কাটা মাছ খাওয়া উচিত হবে কিনা। কুমিরের দাঁতে বিষ থাকে বলে সে শোনেনি। তবু কাটা অংশের এক ইঞ্চিটাক সে ছুরি দিয়ে বাদ দিল। তারপর মাথা ছেড়ে বাকি অংশের আঁশ ছাড়িয়ে টুকরো করে ভেজে ফেলল। এতে অনেকটা সময় চলে গেল।

বাইরে নিস্তব্ধ পৃথিবী। শুধু হাওয়া বইলে জলে শব্দ বাজছে।

ওমলেট এবং মাছ ভাজা নিয়ে আরাম করে বিছানায় বসে হুইস্কির বোতল খুলল মিলন।

খানিকটা গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে সে হেসে ফেলল। কে বলবে যে এখানে আসার আগে সে এভাবে জমিয়ে মদ খাওয়ার কথা ভাবেনি। বিদেশি মদ তো ভাবনায় ছিল না। বস্তুত, মদ খাওয়ার চিন্তা মাথায় আসেনি তখন। অথচ এখন তাকে দেখলে যে কেউ ভাববে, সে এব্যাপারে রীতিমতো দক্ষ।

মদে চুমুক দিয়ে এক টুকরো ওমলেট চিবোতে-চিবোতে সে নিজেকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, একেই কি সুখ বলে? অন্যের সাজানো সংসার দিব্যি উপভোগ করছে। আপত্তি করার কেউ নেই। প্রথম যেদিন সমুদ্র পেরিয়ে বালির চরে পা রেখেছিল সেদিন সে জানতই না এসব তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওই উঁচু টঙের ওপর রাত্রিবাস করার সময় মনে হয়েছিল পেটের দায়ে মানুষকে কত কী করতে হয়, তাকেও করতে হবে।

মিলন ঠিক করল, রোজ সকালে এখান থেকে বেরিয়ে জমিতে যাবে। সারাদিন কাজ করে বিকেলে ফিরে আসবে। কিছু সবজি, ডিম, মুরগির মাংস লঞ্চে এনে রাখতে হবে। কিন্তু হুইস্কির বোতলগুলো খালি হয়ে গেলে কিছু করার থাকবে না। সে হাসল। হেড অফিসকে যদি সে স্কচ হুইস্কি পাঠাতে বলে তাহলে কি প্রতিক্রিয়া হবে?

তিনবার খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডিম এবং মাছ ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখন আর একটুও খিদে নেই। বাথরুমে যাবে বলে পা বাড়াতেই শরীর ঈষৎ টলল। তার নেশা হয়ে গেল নাকি? যাচ্চলে! সাবধানে বাথরুমে গেল মিলন। না, তেমন কিছু নয়। তবে আর রাত্রে খাওয়ার জন্যে কিছু রান্না করার দরকার হবে না।

মোমবাতির আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ামাত্র ঝিনুকের মুখ মনে হল। ঝিনুক তার সঙ্গে এই বিছানায় শুয়েছিল। এই সময় ঝিনুক থাকলে? বড় শ্বাস পড়ল তার। যদি কোনও মন্ত্র জানা থাকত তাহলে সে ঝিনুককে এই মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে আসত। মেয়েটার মিথ্যে বলার অভ্যেস থাকলেও তাকে ভালোবেসেছে, এটা ঠিক। ভালো না বাসলে মানুষের হাতের স্পর্শে অত আদর থাকে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মিলন। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। এই চিৎকার সে টঙের ওপর শুয়ে শুনেছিল। এই চিৎকারের পর বোবা লোকটা আগুন জ্বেলেছিল। মিলন বিছানার ওপর উঠে বসল।

দ্বিতীয়বার চিৎকার ভেসে এল কাছাকাছি পাড় থেকে। কোনও জন্তু রেগে গর্জন করছে। ও নিশ্চয়ই লঞ্চে তার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। জলে নামতে হবে বলে সে এগোতে পারছে না। এ যা দূরত্ব তা বাঘ বা চিতা হলে লাফিয়ে অতিক্রম করতে পারত। বেশ কিছুক্ষণ পরপর জন্তুটার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।

মিলন নিশ্চিত হল, ও লাফাতে পারে না। পারলে এতক্ষণে নেমে এসে দরজা ভাঙার চেষ্টা করতে পারত। সে রিভলভার তুলে নিয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে-হাতড়ে প্রথম ঘর ডিঙিয়ে ইঞ্জিন ঘরে চলে এল। দরজা খুলে ডেকে গিয়ে জন্তুটাকে দেখবে নাকি?

ঠিক সেই সময় ইঞ্জিনঘরের জানলায় ঠক করে শব্দ হল। চমকে সেদিকে তাকাতেই একটা ঝাপসা মুখ আর দুটো চোখ দেখতে পেল সে। ডেক থেকে অনেক ওপরে জানলাটা। যেটা খুলে ড্রাইভার লঞ্চ চালায়। যদিও ওখানে লোহার গ্রিল আছে। ওখানে উঁকি দেবে যে জানোয়ার তাকে অবশ্যই লম্বা হতে হবে।

হঠাৎ মাথায় মতলবটা এল। শব্দের জবাব শব্দ দিয়ে দিলে কেমন হয়? চট করে ইঞ্জিনঘর এবং ডেকের আলো জ্বেলে দিতেই সাপটাকে দেখতে পেল। এতবড় মাথা কোনও সাপের হতে পারে? তখনই ডাঙা থেকে চিৎকারটা আরও প্রবল হয়ে ভেসে আসতেই মিলন বুঝল, চিৎকারটা

সাপের গলা থেকে বেরুচ্ছে না। এখন তাকে দুটো শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

মিলন চটপট ইঞ্জিন চালু করল। কেঁপে উঠল লঞ্চ। বিকট শব্দ বেরুতে লাগল ইঞ্জিন থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে সাপটা নেমে গেল ডেকের ওপর। শব্দ হল, নড়ে উঠল লঞ্চটা। অথচ ওটা যখন ডেকে এসে জানলা পর্যন্ত উঠে ছিল তখন শব্দ দূরের কথা, লঞ্চ নড়েনি। এখন এই ইঞ্জিনের শব্দে ও পালাতে পারলে বাঁচে। জানলার কাচের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে মিলন দেখল সাপটা শেকল বেয়ে ডাঙায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সাহস পেয়ে ডেকের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গুলি চালাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মিলন। সাপের মাথাটা ডাঙায় পৌঁছেছে, লেজের অনেকটা ডেকের ওপর।

ঠিক তখনই একটা কালো শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটার মাথার ওপর। বিশাল শরীর ওপরে তুলে সাপটা আক্রমণকারীকে জড়াতে যেতেই জলে পড়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে আসা একটা কুমিরের হাঁ মুখ সাপের শরীরের মাঝখানটা গিলে ফেলতে চাইল। ওপরের জন্তুটা সাপের মাথা মুখে পুরে টানছে প্রবলভাবে, কুমির শরীরের মধ্যভাগ টেনে নামাতে চাইছে বাকিটা। প্রায় দড়ি টানাটানির মতো ব্যাপারটা।

কয়েক সেকেন্ড চলতেই সাপের শরীর দু-টুকরো হয়ে গেল। কুমির তার অংশ নিয়ে জলের তলায় চলে যেতে সেখানে হুটপুটি শুরু হয়ে গেল। সম্ভবত তার ভাগ বসাতে এসেছে ওর আত্মীয়রা।

ডেকের আলো ডাঙার যে জায়গায় পৌঁছেছে সেখান থেকে সাপটাকে অর্ধেক শরীর তুলে সরে যেতে চাইছিল জন্তুটা। যে অতবড় সাপের মাথা মুখে পুরে ফেলতে পারে অনায়াসে, সে কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর হবে তা আন্দাজ করে জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। পরপর দুবার। সঙ্গে-সঙ্গে জন্তুটা দাঁড়িয়ে গেল।

মুখ থেকে সাপের মাথাটা বের করে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে উন্মাদের মতো চিৎকার করে মিলনকে লক্ষ করে লাফ দিল। তৃতীয় গুলিটা ওর বুকে লাগতেই শরীরটা উলটে জলে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মহাভোজ শুরু হয়ে গেল কুমিরদের। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব শান্ত। ঝিঁঝিরা ডাকতে শুরু করল আবার।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে-না-করতেই মিলন দেখল, এই ফাঁকে প্রচুর পোকা ঢুকে পড়েছে আলোর টানে। ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে সে ভেতরের ঘরে চলে এসে দ্বিতীয় দরজা বন্ধ করল। এখন আলো জ্বালার প্রশ্নই ওঠে না। যারা ঢুকেছিল তারা ইঞ্জিন ঘরে বন্দি থাক। কাল সকালে দেখা যাবে।

বিছানায় বসল মিলন। এরকম আদিম পরিবেশ সহ্য করা মুশকিল। তবে এই ঘটনা নিশ্চয়ই জঙ্গলের অন্য প্রাণীরা দেখেছে। তারা আর কিছুদিনের মধ্যে লঞ্চের কাছাকাছি হবে না। মিলন হুইস্কির বোতলটা টেনে নিয়ে কাঁচা মদের খানিকটা গলায় ঢাকতেই শরীর গরম হয়ে গেল। শুয়ে পড়ল সে।

তখন কত বেলা, দিনের কোন সময় জানে না সে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বাইরের পৃথিবীতে আলো নেই। মিলন উঠল। জানলার কাচে মুখ নিয়ে গিয়ে দেখল যদিও এখন দিন কিন্তু সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেছে।

তখনই অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজ আর সেইসঙ্গে লঞ্চের ওপর পাথরের টুকরো এসে পড়ল। ঘুমটা ভেঙেছিল ওই পাথরের শব্দে। বুঝতে পেরে সে ইঞ্জিনঘরে চলে এল। তখনই দরজায় শব্দ হল। আর কাচের জানলায় যে মুখটা ভেসে উঠল, সেটা অপরিচিত নয়।

ডেকের দরজা খুলতেই হনুমানটা জানলা থেকে নেমে এসে ডেকের ওপর লাফাতে লাগল

আনন্দে। যেন দারুণ কাজ করে ফেলেছে সে। ডাঙার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মিলন। বোবা লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটা হাসছে। মেয়েটা তার ভাষায় কিছু বলল। বোবা লোকটার মুখে হাসি।

ইঞ্জিন ঘরে ঢুকে লঞ্চটাকে চালু করতেই বিকট শব্দ বাজল। মিলন দেখতে পেল, ভয় পেয়ে হনুমানটা শেকল বেয়ে সোজা চলে গেছে ওই দুজনের কাছে।

লঞ্চটাকে ধীরে-ধীরে ডাঙার কাছে নিয়ে গেল মিলন। সঙ্গে-সঙ্গে বোবা লোকটা, হনুমান এবং মেয়েটা উঠে দাঁড়াল ডেকে। ইঞ্জিন বন্ধ করল মিলন। বোবা লোকটা তার সামনে এসে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে চাইল যে সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বসে থাকতে না পেরে ছুটে এসেছে দিনের বেলায়। জন্তুটার চিৎকার সে নকল করার চেষ্টা করল মুখে ভয় ফুটিয়ে।

মেয়েটা চুপচাপ দেখছিল। ওর পরনে এখনও তার বারমুডা আর গেঞ্জি। গেঞ্জি ওর বুকের সবটা ঢাকতে না পারায় চোখ সরিয়ে নিল মিলন। তারপর হাত নেড়ে বোঝাল, তার কিছু হয়নি। সে দিব্যি আরামে এখানে ঘুমিয়েছে।

ওরা তিনজন ঘুরে-ঘুরে লঞ্চটাকে দেখল। এবং তখনই বৃষ্টি নামল। মিলন লঞ্চ চালু করে ডাঙা থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে এল ওটাকে। বৃষ্টি পড়ছে সজোরে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা শব্দ করে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

বোবা লোকটা নিজের বুকে হাত ছুঁইয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বোধহয় জানতে চাইল কী করে জমিতে ফিরে যাবে! মেয়েটা হেসে উঠল খিলখিল করে। বোঝা যাচ্ছে ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। মিলন বলল, 'বৃষ্টি না থামলে তো যেতে পারব না। আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। তোমরা খেয়েছ?'

বোবা লোকটা মাথা নড়ল। খায়নি।

মোমবাতি জ্বেলে রান্নাঘরে ঢুকে মিলন আবিষ্কার করল, গতরাতের মাছভাজার অনেকটাই রয়ে গেছে। সে গ্যাস ধরিয়ে ভাতের জল বসিয়ে দিল। বোবা লোকটা অবাক হয়ে দেখছিল। ইশারায় মেয়েটাকে ডাকতে, সে দরজায় এসে গ্যাসের আওয়াজে প্রথমে চমকে গেল। তারপর মিলন জলে চাল ছাড়তে সে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল।

ফেনা ভাত, মাছ ভাজা আর টুনামাছের ঝাল কৌটো থেকে বের করে খেতে বসল ওরা। ভাতের মধ্যে ফ্যান থাকায় খেতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

খাওয়া শেষ করে প্লেট ধোয়ার পর একটু টুনা মাছ বড়শিতে গেঁথে জানলা দিয়ে জলে ফেলল মিলন। আকাশ অন্ধকার। জলের রং কালো। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। হনুমানটা গম্ভীর মুখে বসে আছে। বোবা লোকটা ওকে যে ভাত খেতে দিয়েছিল, তা খেয়ে নিয়েছে চেটেপুটে।

সুতোয় টান পড়তেই ছিপ ওপরে তুলল মিলন। বেঁকে গেল ছিপের মাথা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর কুমির এগিয়ে আসার আগেই মাছটাকে ওপরে তুলতে পারল সে। একটা কেজি দেড়েকের ভেটকি মাছ। বড়শি ছাড়িয়ে নিলে লাফাতে লাগল সেটা। মেয়েটা খুশিতে খপ করে ধরল মাছটাকে।

মিলন বলল, 'ওটার আঁশ ছাড়িয়ে কেটে ফেলো।'

লোকটা মাছের দখল নিলে মেয়েটা ওর সঙ্গী হল।'

মুরহেডের সংগ্রহ থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল মিলন। বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে। জমি পাহারা দেওয়ার দরকার নেই, তবু লোকটার ওখানে থাকা দরকার ছিল। যদি ওই মেয়েটার আত্মীয়রা খোঁজ নিতে আসে, তাহলে কিছু জানতেই পারবে না। অবশ্য এই আবহাওয়ায় সমুদ্রে ডোঙা ভাসাতে নিশ্চয়ই কেউ চাইবে না।

মেয়েটার ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটার সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়েছে। লোকটা বোবা হলেও শরীর স্বাস্থ্য ভালো। ওরকম ভয়ঙ্কর যৌবন যে মেয়ের শরীরে, তার সঙ্গ কি ওকে প্রলুব্ধ করবে না? সেটা কি গতরাতেই হয়ে গেছে? মেয়েটার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওদের

বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। চুরুট টানতে-টানতে মিলন ভাবল, এ ব্যাপারে মেয়েটার অভিভাবকরা এলে কথা বলবে।

দিন কখন শেষ হল, কখন রাত নামল বোঝার আগেই চারপাশ আঁধারে ভরে গেল। জল পড়ছে অঝোরে। হাওয়া নেই বলে বাঁচোয়া। হনুমানটা এই ঘরে ঢুকতেই মিলন তাকে ডাকল, 'এই, আয় এখানে।'

পাত্তাই দিল না হনুমান। দরজার কাছে গিয়ে সেটাকে খোলার চেষ্টা করল। মিলন নিশ্চিত ও খুলতে পারবে না। হনুমানটাকে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখে কী করবে বুঝে ওঠার সময় লোকটা চলে এল এই ঘরে। তাকে দেখে হনুমান একটু শান্ত হতেই লোকটা মিলনকে ইশারায় বোঝাল, ও দরজা খুলতে চায়! আঙুল দিয়ে হনুমানকে দেখিয়ে হাসল সে।

'এই অন্ধকারে দড়ি বেয়ে কেউ এসে ডেকে বসে থাকতে পারে। দরজা না খুলে ওকে টয়লেটে নিয়ে যাও। নিয়ে এসো ওকে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভেতরের ঘরে গিয়ে টয়লেট দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ভালো করে জল ঢেলে দিও। কোনও হনুমান কমোডে বসে পটি করছে তা জীবনে শুনিনি।

লোকটা বুঝিয়ে-টুঝিয়ে হনুমানটাকে টয়লেটে নিয়ে যেতে মিলন দেখল, মেয়েটা তার বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। আপত্তি জানাতে গিয়েও সে থমকে গেল। মেয়েটা সবে সুস্থ হয়েছে। এখানে আসার ধকলে কাহিল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মোমবাতি জ্বালা হয়েছে দুটো ঘরে। বোবা লোকটা হনুমানকে নিয়ে বাইরের ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে চুপটি করে। একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু এখন লঞ্চ দুলছে। মিলন অনুমান করল জোয়ার এসেছে। ঢেউ-এর তালে লঞ্চ যদি পাড়ের দিকে চলে যায়, তাহলে যে-কোনও জন্তু পায়ে হেঁটে উঠে আসতে পারবে। উঠুক। ভরসা দুটো। সহজে দরজা ভাঙতে পারবে না। আর সে এই রাত্রে একা নেই।

এখন সন্ধে পেরিয়েছে অবশ্যই। মিলন কিচেনে ঢুকে ভেটকি মাছের টুকরোগুলো ভেজে অনেকটা ঝোল বানিয়ে ফেলল। তারপর ভাত চাপাল। লোকটা চলে এসেছিল দরজায়। চোখাচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

সে ঘাড় নড়ল, 'ভালো।'

কয়েকটা ভাজা মাছ আলাদা রেখেছিল মিলন। ভাত হয়ে গেলে কী করে গ্যাস নিভিয়ে সসপ্যান নামাতে হবে শিখিয়ে দিল সে বোবা লোকটাকে। লোকটা চটপট শিখে ফেলল। এবার মিলন বলল, 'ওই মেয়েটাকে ওখান থেকে ওঠাও। বাইরের ঘরে গিয়ে শুতে বলো। ওটা আমার ঘর।'

লোকটা মাথা নড়ে চলে গেল। একটু পরে গোঙানি কানে এল। মেয়েটাকে বেশ বকেঝকে ঘুম থেকে তুলল লোকটা। তারপর ফিরে এসে মাথা নেড়ে জানাল, কাজটা করে ফেলেছে। ভাতের দিকে নজর রাখতে বলে মাছের প্লেট নিয়ে মিলন শোওয়ার ঘরে এল। একটু শীত-শীত করছে এখন। বৃষ্টি থামার পরই বাতাস বইতে শুরু করেছে। ফলে শীতের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে।

সে লক্ষ্য করল মেয়েটা বালিশে মাথা রেখে শোয়নি। বালিশ সযত্নে ওপাশে সরিয়ে রেখেছিল। চাদরটাকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে তার ওপর বসল মিলন। হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে জল মেশাল। লঞ্চ দুলছে। এদিক ওদিকে যাচ্ছে। কিন্তু দড়ির বাঁধা থাকায় লঞ্চটাকে একটা বিশেষ জায়গায় দুলতে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবারের ঘষাঘষিতে যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়, তাহলে জোয়ারের জল হয়তো পেছনে নিয়ে যাবে। কিন্তু ভাটা শুরু হলে আর দেখতে হবে না।

হেসে ফেলল মিলন। তখন থেকে সে যাকে দড়ি বলে ভেবে চলেছে সেটা যে আর দড়ি

নেই, লোহার চেন তা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। শেকল ছিঁড়বে না কিছুতেই।

মাছের টুকরো দিয়ে হুইস্কি খেতে-খেতে মিলন খেয়াল করেনি, ঘরের দরজায় কখন লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। পাশে হনুমান। লোকটা অবাক হয়ে মিলনের হাতে ধরা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

লোকটা আঙুল তুলে গ্লাস দেখাল।

'এটা হুইস্কি। বিলিতি মদ। ভাত হয়ে গেছে?'

লোকটা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। কিন্তু নড়ল না।

'খেতে ইচ্ছে করছে?' মিলনের মনে মায়া এল।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লোকটা।

একটা খালি গ্লাসে সামান্য মদ ঢেলে জল না মিশিয়ে এগিয়ে ধরল, 'খাও। তুমিই বা বঞ্চিত হবে কেন?'

লোকটা গ্লাস নিয়ে এক ঢোকে তরল পদার্থ গলায় চালান করেই অন্য হাতে বুক আঁকড়ে ধরল চোখ বন্ধ করে। তারপর মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে গ্লাস নিয়েই চলে গেল পাশের ঘরে। তার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হনুমান পেছনে ছুটল।

মিলন হাসল। বোধহয় একবারেই সাধ মিটে গেল লোকটার। কিন্তু একটু পরে মেয়েটাকে ঘরে আসতে দেখে অবাক হল সে। বোকা-বোকা হাসি ওর মুখে, হাতে বোবা লোকটার নিয়ে যাওয়া গ্লাস। আমাদের টেবিলে গ্লাসটা রেখে নিজের ভাষায় কিছু বলল মেয়েটা।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'হিন্দি জান না?'

মাথা নেড়ে হাসল মেয়েটা। এই দেশের যে-কোনও জায়গার মানুষ অল্প হলেও কিছুটা হিন্দি বুঝতে পারে। ওকে যারা এনেছিল, তাদের মুখে ভাঙা হিন্দি ছিল বলে আবছা মনে পড়ছে। মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু চাই?'

মেয়েটা কী বুঝল সে-ই জানে, আঙুল তুলে গ্লাস দেখিয়ে দিল।

অবাক হল মিলন। তারপর ইশারায় বোঝাল, ওটা খেলে মাথা ঘুরবে, পড়ে যাবে।

মেয়েটা শব্দ করে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে যেটা বলল, তার বাংলা বোধহয়, কিছু হবে না। আমি আগেও খেয়েছি।

ওকে হুইস্কি দেওয়াটা উচিত হবে কিনা ভাবল মিলন। তারপর অল্প কিছুটা গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে দিল।

মেয়েটা গ্লাস তুলে চলে গেল ঘর থেকে।

দ্বিতীয় গ্লাস শুরু করার সময় আবার ফিরে এল মেয়েটা। গ্লাস সামনে রেখে হেসে কিছু বলল। মিলন ধমক দিল, 'না। যথেষ্ট হয়েছে। যাও, ভাত খেয়ে শুয়ে পড়।'

হাসল মেয়েটা। কিন্তু গেল না। মিলন বাধ্য হল, আবার গ্লাস ভরে দিতে। এবার যদি বোবা লোকটা এসে দ্বিতীয়বার খেতে চায় তাহলে তার বোতল শেষ হতে বেশি দেরি হবে না। মেয়েটা দরজায় হেলান দিয়ে চুমুক দিতে লাগল। চোখাচোখি হলেই সে হেসে উঠছে। মিলনের মনে হল, ওর নাম হাসি হলে মন্দ হয় না।

তৃতীয় গ্লাস না নিয়ে ছাড়ল না মেয়েটা। নিয়ে ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল। এখন ওর হাসির আওয়াজ বেড়ে গেছে। কথা বলছে আর হাসছে।

হঠাৎ অদ্ভুত সুরে গান ধরল কিছুক্ষণ। গ্লাস শেষ হওয়ার আগেই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ সরিয়ে নিল মিলন। মোমবাতির আলোয় ওর শরীরের উন্মুক্ত অংশ প্রলোভন তৈরি করছে। সে দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে বাইরের ঘরে এসে দেখল বোবা লোকটা মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে।

পেট ভরে ভাত খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল মিলন। মেয়েটার দিকে একবারও তাকাল না। সে বুঝতে পেরেছে, তাকালে দুজন যুবতীকে একসঙ্গে প্রতারণা করবে সে।

সকালে চমৎকার রোদ উঠল। নদীর জলে তার প্রতিফলন চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল। বোবা লোকটা ঘুম ভাঙিয়েছিল মিলনের। মিলন উঠতেই সে ব্যস্ত হল জমিতে ফিরে যেতে। মেয়েটা তখনও মেঝেতে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওকে জাগানো হল।

লঞ্চটাকে চালু করে পাড়ের কাছে নিয়ে যেতে বোবা লোকটা আগে নামল। তার পেছনে হনুমান। ইঞ্জিন বন্ধ করে ডেকে বেরিয়ে মেয়েটাকে দেখতে পেল না মিলন। ওকে ডাকতে গিয়ে কাল রাত্রে ভাবা নামটা মনে পড়ল। সে চেঁচিয়ে ডাকল, 'হাসি, হাসি?'

হাসি সাড়া দিল না। মিলন লঞ্চের ভেতর ঢুকল। দুটো ঘরে হাসি নেই। কিন্তু কিচেনের ভেতর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

মিলন বিরক্ত হল, 'আরে! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চলো।'

হাসি জোরে মাথা নাড়ল। সে যাবে না।

'যাবে না কেন? এখানে একা থাকা যায় না। চলো!'

মেয়েটা পেছন ফিরে দাঁড়াল। যেন মিলনের কথা সে শুনতে চায় না। ডাঙায় দাঁড়ানো বোবা লোকটার গোঙানি ভেসে এল। সে অধৈর্য হচ্ছে। মিলন হাত বাড়িয়ে হাসির কনুই ধরে টানল, 'তাড়াতাড়ি বলো।'

সেই টানটা হয়তো একটু বেশি জোরে হয়ে গিয়েছিল কারণ হাসির শরীরটা ঘুরে গিয়ে মিলনের সঙ্গে ধাক্কা খেল। যেন বিদ্যুতের স্পর্শ পেল মিলন। হাসি যেন মজা পেয়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে তার দিকে মুখ তুলে হাসল।

ঝট করে সরিয়ে নিল নিজেকে। নিয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে বেরিয়ে আসতে বলল মিলন। হাসিহাসিমুখে মাথা নাড়ল, না।

অসহায় বোধ করল মিলন। ওকে নিয়ে যেতে হলে গায়ের জোর দেখাতে হবে। এটা সে কিছুতেই করবে না।

তারপর মনে হল, থাক ও এখানে। দ্রুত হেঁটে ডেকে চলে এসে খেয়াল হল মিলনের। ডেকের দরজা যদি খোলা থাকে, তাহলে ফিরে এসে মেয়েটাকে আর দেখতে পাবে না। ওকে বন্ধ করতে বলেও লাভ নেই। খেয়াল হলেই দরজা খুলে ডেকে দাঁড়াবে।

লঞ্চটা যেহেতু ডাঙার গায়ে লাগানো তাই ভয়ঙ্কর প্রাণী বা বিরাট সাপের খাবার হতে ওর দেরি লাগবে না। মিলন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিল। তাতেও ভরসা না করে ডেকের একটা ভাঙা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে শেকলের হুকে গুঁজে দিল।

ডাঙায় নেমে সে বোবা লোকটাকে বলল, 'ও আসতে চাইছে না। কি করা যাবে।' বোবা লোকটা নির্লিপ্তচোখে একবার লঞ্চটাকে দেখে হাঁটা শুরু করল।

সারাদিন জমিতে কাজ করে গেল ওরা। গত রাত্রে এখানে কেউ না থাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি। একফাঁকে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিয়েছিল লোকটা। মেয়েটা আজ সারাদিন অভুক্ত থাকবে। কিছু করার নেই।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে ডোঙাটাকে দেখা গেল। দুটো লোক দাঁড় বেয়ে আসছে। হনুমানটা খবর দিতে ওরা ছুটে এল সমুদ্রের ধারে।

মিলন অস্বস্তিতে পড়ল। মেয়েটা যে লঞ্চে আছে, তা ওদের বোঝাতে জেরবার হতে হবে। কেন এখানে না থেকে লঞ্চে গেল সে, এই প্রশ্ন ওরা করতেই পারে।

ডোঙাটাকে বালিতে তুলে লোকদুটো আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। তারপর ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা বেঁচে আছে কিনা।

মিলন ইশারায় জানাল, 'একটু ভালো। ওকে দেখতে হলে দূরে যেতে হবে।'

লোকদুটোর মুখ দেখে মনে হল, ওরা খুশি হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ডোঙার মধ্যে থেকে শক্ত শণে গাঁথা গোটাদশেক বেশ বড় আকারের কাঁকড়া বের করে মিলনের পায়ের কাছে রেখে কোনও কথা না বলে লোকদুটো ডোঙা নিয়ে সমুদ্রে ভাসল। দ্রুত দাঁড় বেয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ওদের এই যাওয়ার ভঙ্গিটা যেন পালিয়ে যাওয়া বলে মনে হচ্ছিল মিলনের। অসুস্থ একটা মেয়েকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এসে ওরা সারারাত ছিল। মেয়েটা একটু ভালোর দিকে দেখে সেই যে চলে গেল আজ আসার সময় পেল।

ইশারায় সে বুঝিয়ে ছিল মেয়েটা এখন ভালো আছে এবং তাকে দেখতে হলে খানিকটা দূরে যেতে হবে। শোনামাত্র কাঁকড়াগুলো উপহার দিয়ে ওরা এভাবে পালিয়ে গেল কেন? তবে কি সুস্থ অবস্থায় মেয়েটাকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না?

সে বোবা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা পালাল কেন?'

বোবা লোকটা হাসল। তারপর ইশারায় বোঝাল, ওরা ভেবেছে যে মেয়েটা মরে গেছে।

হতভম্ব হয়ে গেল মিলন। তার ইশারার ভুল অর্থ করল ওরা। সে দূরের দিকে হাত দেখিয়েছে মানে ভেবেছে, মেয়েটা মরে গেছে! কিন্তু তাহলে মৃতদেহ দেখতে চাইল না কেন?

হঠাৎ হনুমানটা চিৎকার করতে আজব দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। কাঁকড়াগুলো নড়ছে দেখে হনুমানটা কৌতূহলী হয়ে ওদের কাছে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। বোধহয় খেলতে চেয়েছিল। প্রথম কাঁকড়াটার সামনে হনুমানের লেজ চলে যাওয়ায় সেটা কামড়ে ধরেছে। এখন হনুমান পরিত্রাণের জন্যে লাফাতে দশটা বড় কাঁকড়া তার লেজে ঝুলে থাকছে। তাদের ওজনটাও হনুমানের পক্ষে বেশি হয়ে গেছে। লোকটা তড়িঘড়ি গিয়ে হনুমানকে কাঁকড়ামুক্ত করতে সে লাফিয়ে দূরে সরে গিয়ে ভয়ভয় চোখে তাকাতে লাগল।

লোকটা কাজ পেয়ে গেল। তিনটে কাঁকড়া ছাড়িয়ে ভালো করে চচ্চড়ি রেঁধে ফেলল চটপট। বাকিগুলোকে যেমন ছিল তেমনি রেখে দিলে একটা বালতিতে চাপা দিয়ে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলতেই মিলন লোকটাকে ইশারা করল, সে লঞ্চে যাবে কিনা? লোকটা মাথা নাড়ল, যাবে না। উলটে একটা বড় বাটিতে কাঁকড়ার চচ্চড়ি দিয়ে দিল সে।

প্রায় দিনে-দিনেই নদীর কাছে পৌঁছে গেল মিলন। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে লঞ্চটাকে দেখা যাচ্ছে। পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল। লঞ্চের ছাদে বসে আছে বিশাল আকারের একটা কালো জীব যার আদল অনেকটা হায়েনার মতো। কাল রাত্রে যে গুলি খেয়ে কুমিরের পেটে গিয়েছে এটি বোধহয় তার সঙ্গী। মাঝে-মাঝেই লঞ্চের ছাদ আঁচড়াচ্ছে ও। পাড়ের গায়ে লঞ্চ লাগানো বলে ওর পক্ষে লঞ্চে উঠতে অসুবিধে হয়নি। মেয়েটার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা পাথর তুলে লঞ্চের দিকে ছুঁড়ল মিলন। সেটা ডেকে লেগে জলে পড়তেই জন্তুটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর তার গলা থেকে অবিকল গতরাতের জন্তুটার আওয়াজ বের হল। এক লাফে সে ডেকে নেমে পড়তেই লঞ্চের সামনের দিকটা ঈষৎ নীচু হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ চোখে জন্তুটা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে এখন।

কোমর থেকে রিভলভার বের করে গুলি চালাল মিলন। সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে মাটিতে পড়েই জঙ্গলের উলটো দিকে ঢুকে গেল জন্তুটা। গুলি ওর গায়ে লাগেনি।

মিলন আর দেরি করল না। দৌড়ে ডেকে উঠে এসে শেকল খুলে ভেতরে ঢুকেই দরজা

বন্ধ করে দিল। তারপর ইঞ্জিন চালু করে যতটা সম্ভব পাড় থেকে দূরে নিয়ে গেল লঞ্চটাকে। আপাতত নিশ্চিন্ত।

শেষ রোদের প্রতিফলন এখন জলে। তাই লঞ্চের ভেতরে অন্ধকার আসেনি। ভেতরের ঘরে ঢুকে মিলন ডাকল, 'হাসি!' কোনও সাড়া এল না।

তার শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে থমকে গেল সে। ঘরের মেঝেতে আরামসে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। তার পাশে পড়ে আছে খালি গ্লাস আর হুইস্কির বোতল। তার মানে সারাদিন মেয়েটা মদ খেয়েছে। এখন আউট হয়ে ঘুমোচ্ছে। খুব রাগ হয়ে গেল ওর। পাশের জলের বোতলের খানিকটা জল ওর মুখে ঢেলে দিল সে। মেয়েটার চোখ একটু পিটপিট করল শুধু।

এখন ওকে জাগানো অসম্ভব। মিলন উঠে কিচেনে চলে এল। কাঁকড়ার বাটি রেখে দিয়ে দেখল, মেয়েটা কিচেন ব্যবহারের কোনও চেষ্টা করেনি। স্বস্তি পেল সে। গ্যাস জ্বালাতে গিয়ে লম্ফটাকেই পুড়িয়ে ফেলত হয়তো।

ডিমের স্টক শেষ হয়ে এসেছে। জমি থেকে কিছু ডিম এখানে এনে রাখতে হবে। বেশ বড় একটা ওমলেট বানাতে-বানাতে ভাবল মিলন। খেয়াল হল, ওপরের বাক্সের মধ্যে টি ব্যাগ যেন দেখেছিল। খুঁজতেই পেয়ে গেল। গরম জলে টি ব্যাগ ডুবিয়ে দিতেই রং পালটে গেল। দুধ চিনি ছাড়া চা অনেকেই খায়।

ওমলেটটা বেশ বড় হয়ে গেছে। অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে সে বাইরের ঘরে এসে জানলার পাশে ওগুলো রেখে খাওয়া শুরু করল। সূর্য ডুবছে।

এখন মেয়েটাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? ওর সঙ্গীরা যদি নিতে না আসে তাহলে ওকে সরানোর একটাই উপায় আছে। বিন্দু থেকে নৌকো এলে তার মাঝিদের বলতে হবে, ফেরার সময় মেয়েটাকে যেন ওদের দ্বীপে নামিয়ে দেয়। হয়তো ঘুরপথ হবে, কিন্তু এছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।

কিন্তু মেয়েটা ফিরে যেতে চাইছিল না কেন? ও যেখানে ছিল সেখানে কি এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে, যার জন্যে ও ফিরতে চাইছে না? হয়তো দ্বীপের লোকও সেই কারণে ওকে এখানে পাচার করে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে। কী ঘটনা? মেয়েটাকে হাজারবার জিজ্ঞাসা করলেও সেটা জানা যাবে না। প্রথমতঃ ভাষায় প্রতিবন্ধকতা, দ্বিতীয়তঃ মেয়েটা হয়তো এড়িয়ে যাবে।

চা এবং ওমলেট খাওয়ার পর মিলন কাগজ-কলম নিয়ে আর-একটা লিস্ট তৈরি করল। রান্নার গ্যাস, তেল, নুন, চিনি, রান্নার মশলা থেকে সাবান কিছুই বাদ গেল না। সেইসঙ্গে সাতদিনের আলু, পেঁয়াজ, আদা আর কাঁচা সবজি। লঞ্চের গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই নতুন গ্যাস সিলিন্ডার চাই। এখন দেশের সব মফস্‌সল শহরেও ওটা সহজে পাওয়া যায়। বিন্দুতেও নিশ্চয়ই ওর ডিলার আছে। বাকিগুলো জোগাড় করা মোটেই অসুবিধের নয়।

কিন্তু একটা ভাবনা যেন ঠিক মিলছে না। সে ভেবেছিল, বোবা লোকটা হাসিকে পছন্দ করেছে। হাসির কাছে বোবা মানুষ আর কথা বলতে পারার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভাষা যদি বুঝতে না পারে তাহলে ইশারায় কথা বলতে হবে। এই ইশারার ব্যাপারে বোবা লোকটা খুব দক্ষ। এক রাত একলা কাটিয়েছিল দুজনে। ফলে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলে ভেবেছিল মিলন।

কিন্তু আজ স্বচ্ছন্দে হাসিকে লঞ্চে ফেলে রেখে বোবা লোকটা নির্দ্বিধায় নেমে গিয়েছিল। ওখান থেকে ফেরার সময় মিলন ডাকলেও সে আসতে চায়নি। সম্পর্ক তৈরি হলে মনে দুর্বলতা আসত। সারাদিন একা পড়ে থাকা মেয়েটাকে দেখার জন্যে চলে আসাই স্বাভাবিক ছিল। তাহলে ওদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়নি। এক্ষেত্রে, মেয়েটির আত্মীয়রা না ফিরিয়ে নিলে ওদের বিয়ে দেওয়াটা সম্ভব হবে কী করে?

মিলনের খেয়াল হল, সন্ধে হয়ে গেছে। লঞ্চের ভেতর অন্ধকার ঢুকে গেছে। সে কাল রাতের

নিভিয়ে রাখা মোমবাতিটা জ্বালতেই ঘরটা মোলায়েম আলোয় ভরে গেল। এই ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো র‍্যাকে কিছু বই আছে। সবক'টা ইংরেজি থ্রিলার। এই আলোয় পড়া যাবে না। গেলে চমৎকার সময় কাটত।

দরজায় শব্দ হল। মুখ ফিরিয়ে মিলন দেখল, মাঝখানের দরজায় হেলান দিয়ে হাসি দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি এখনও নেই। চোখ ঢুলুঢুলু, ঠোঁটে হাসি। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'মদ খেয়েছিলে কেন?'

কোনও জবাব এল না। আবার ফিরল মিলন। ইশারায় মদ খাওয়ার ভঙ্গিটা করে আঙুল তুলে জানতে চাইল, কেন খেয়েছে?

আধা জড়ানো গলায় হাসি যে জবাব দিল তা মিলনের অবোধ্য। সে হাত তুলে চড় মারার ভঙ্গি করতেই হাসি এমনভাবে মাথা নাড়ল, যার অর্থ, সে আর খাবে না।

এরপর আর কী বলার থাকে! খালি পেটে মদ গিলে বমি করেনি এই ঢের।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল হাসি। সেদিকে এগিয়ে হাতের ইশারায় সরতে বলল মিলন। বেশ চেষ্টার পরে হাসি তার শরীর সরাল। পাশ কাটিয়ে এসে কিচেনে ঢুকে বাকি ওমলেট প্লেটে তুলে নিয়ে মিলন ডাকল, 'হাসি, হাসি!'

হাসি এল। লঞ্চের দেওয়াল ধরে-ধরে। টলে উঠেই সামলে নিল। কিচেন থেকে একটা টুল বের করে ওর সামনে রেখে মিলন বলল, 'বসো এখানে।'

হাসি হাসল। কিন্তু বসল না। মিলন গজগজ করল, 'আচ্ছা অবাধ্য মেয়ে।'

তারপর প্লেটটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসে ওর কাঁধের নীচেয় হাত দু-হাতে ধরে জোর করে টুলের ওপর বসিয়ে দিল। হাসির মাথা ঝুঁকে গেল। গেঞ্জির স্ট্র্যাপ সরে যেতে বাঁ-দিকের উদ্ধত বুক দৃশ্যমান হল।

হাত বাড়িয়ে গেঞ্জিটাকে টেনে খানিকটা ঠিক করাতেই হাসি অবাকচোখে মুখ তুলে মিলনকে দেখল। দেখে ঠোঁট কামড়ে গেঞ্জিটাকে আর-একটু ওপরে তুলে শরীর ঢাকার চেষ্টা করল।

এবার মিলন প্লেট এগিয়ে ধরে বলল, 'খাও।'

ঢুলুঢুলু চোখে হাসি ওমলেটটাকে দেখে প্লেট হাতে ধরল। তারপর যেন অনন্তকাল ধরে খেয়ে চলার মতো একটু-একটু করে মুখে তুলে চিবোতে লাগল। মিলন সরে এল ওখান থেকে।

মিনিট পাঁচেক পরে মিলন যখন বাইরের ঘরের বন্ধ কাচের জানলায় দাঁড়িয়ে, তখন ওই ঘরে এল হাসি। হাতে শূন্য প্লেট। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'চাই-চাই-চাই-!' শব্দটা তিনবার উচ্চারণ করেই হেসে ফেলল হাসি। তারপর পেটে হাত দিয়ে চিবোনোর ভঙ্গি করে বোঝাল, তার খিদে এখনও যায়নি। আরও খাবার চাই।

ফাঁপরে পড়ল মিলন। সারাদিন অভুক্ত থেকে আধখানা ওমলেটে পেট না ভরাই স্বাভাবিক। ওর খিদে পেয়েছে মানে, নেশা চলে গেছে। এখন ভাত রান্না করে কাঁকড়ার চচ্চড়ি দিলে রাত্রে কী খাবে?

মিলন কিচেনে চলে এল। ড্রাইফ্রুটের টিনটা খুলে তা থেকে দু-মুঠো নিয়ে প্লেটে ঢেলে ডাকল, 'হাসি, হাসি।'

হাসি প্লেট হাতে দরজায় এসে বলল, 'আসি।'

'না। হাসি।' আঙুল তুলে ওর দিকে দেখিয়ে বলল, 'হাসি।'

'হা...আসি।'

'না। হল না। হাসি।'

'হাসি।'

'গুড। তুমি হাসি।'

'হাসি।'

'দয়া করে এগুলো খেয়ে আপাতত থাকো। আর একটু পরে ভাত রেঁধে দেব। তখন পেট ভরে সেগুলো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

মিলন চলে এল তার ঘরে। কাল রাত্রে হাসি ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়েছিল। আজ ওর জন্যে একটা বালিশ আর চাদর আলাদা করে রাখল সে। তারপর আবার গেল কিচেনে। কাঁকড়ার চচ্চড়ি গরম করল। নতুন করে ভাত ফোটাল। এগুলো ঘণ্টা দুয়েক গরম থাকবে। আখরোট চিবোতে-চিবোতে হাসি তার কাজকর্ম দেখে যাচ্ছিল। কিছুটা কাজু আর আখরোট টিন থেকে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে আরাম করে খাটে বসল মিলন। তারপর প্রায় তিনভাগ শেষ বোতল থেকে হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে জল মেশাল। চুমুক দিতেই শরীরে আরাম ছড়িয়ে পড়ল।

এই যে রোজ হুইস্কি খাচ্ছে সে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? নেশায় দাঁড়িয়ে গেলে কী হবে? নিজেকে প্রশ্ন করল। না। হুইস্কির নেশা তাকে দখল করেনি। সারাদিনে একবারও এসব কথা মনে আসে না। এই ঘরে সন্ধের পর সে যে খাচ্ছে, তা স্রেফ একটু মজা পাওয়ার জন্যে।

হাসি ঘরে এল। মেয়েটার মুখে হাসি যেন আঠার মতো লেগে থাকে। একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিলন গ্লাসে চুমুক দিল। হাসি এসে বসল খাটের অন্য প্রান্তে। কিছুক্ষণ উসখুস করে নীচু গলায় কিছু বলল।

মিলন মাথা নাড়ল, 'তোমার ভাষা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না!' শেষ শব্দটা ওর জিভে উচ্চারিত হল।

'হ্যাঁ, না।' গ্লাসে চুমুক দিল মিলন।

হাসি আবার কথা বলল। আবদেরে গলায়। এবার খুব ধীরে-ধীরে। মিলন বোঝার চেষ্টা করল। মুই শব্দটা বুঝতে পারল। মুই মানে আমি। হাসি কি নিজের কথা বলতে চাইছে? মিলন ভাবছিল। বোবা লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু দুটো ভিন্ন এবং পরস্পরের অজানা ভাষা হলে কথা বলা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ হাসি বলল, 'না।'

কপালে ভাঁজ ফেলল মিলন।

আঙুল তুলে বোতল দেখিয়ে হাসি আবার বলল, 'না।'

সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল মিলন, 'লজ্জা করে না তোমার! ওই খেয়ে সারাদিন আউট হয়ে পড়ে ছিলে মেঝেতে। নেশা কাটতে-না-কাটতেই আবার খেতে চাইছ!'

সঙ্গে-সঙ্গে মিলনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একই কথা বলতে লাগল হাসি। অবাক হয়ে সেটা শোনার পর মিলন মাথা নাড়ল, 'না। দেব না।'

হাসির গলার স্বর নেমে এল। হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস তুলে নীচের দিকটা দেখাল। মুখে কিছু বলল।

এরকম নাছোড়বান্দা মেয়েকে সামান্য হুইস্কি না দিয়ে পারল না মিলন।

জল মেশানো হুইস্কিতে চোখ বন্ধ করে চুমুক দিল হাসি। তারপর এক গাল হেসে যেসব শব্দ বের করতে লাগল, তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করেও হাল ছাড়ল মিলন। এটা কী করে সম্ভব? বিন্দু থেকে বিভিন্ন দ্বীপে নৌকো যায়। সেসব দ্বীপ থেকে কেনাবেচা করতেও মানুষ বিন্দুতে যায়। নিজেদের আলাদা ভাষা হওয়া সত্ত্বেও মানুষ বাজারচলতি ভাষা শিখে নেয়। সেটা হিন্দি হওয়াই স্বাভাবিক। হাসির দ্বীপের মানুষ এ ব্যাপারে অন্ধকারে আছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সে ঠিক করল, ওকে কাজ চালাবার মতো বাংলা শেখাতে হবে। অন্তত যতদিন এখানে আছে ততদিন। আর কাল সকালে অতি অবশ্য জমিতে নিয়ে গিয়ে সেখানেই থাকতে বাধ্য করবে। ওখানে আর যাই হোক, হুইস্কির নাগাল পাবে না।

হঠাৎ লঞ্চটা একটু দুলে উঠল। জলের ধাক্কায় যে দুলুনি এটা তা নয়। একপাশ একটু নীচু হয়েই সোজা হল। তারপর লঞ্চের ছাদে ভারী কিছু হাঁটছে, বোঝা গেল। অবশ্যই কোনও জন্তু! কিন্তু সেটা কী ধরনের? মিলন রিভলভারটাকে হাতের কাছে রাখল।

তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব টের পেয়েছে হাসিও। কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছে। হঠাৎ লঞ্চের সামনের দিকের ডেক নীচু হয়ে গেল। তার অর্থ, জন্তুটা ওখানে নেমেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম দরজায় প্রচণ্ড নখের আঁচড়ানি আর বিকট চিৎকার শুরু হল। চিৎকারটা এমন আচমকা এবং ভয়ানক যে হাসি গ্লাস রেখে মিলনের শরীরের পাশে সিঁটিয়ে বসল। ভয়ে সে কাঁপছিল।

বাইরে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত! যদি দরজা ভেঙে ফেলে, তাহলে ওকে দ্বিতীয় দরজা ভাঙতে হবে। মাঝখানের দরজাটা তাই বন্ধ করে দেওয়া দরকার। মিলন উঠতে যেতেই হাসি তার বাজু ধরে বাধা দিল। মাথা নেড়ে যেতে নিষেধ করল। হাতের রিভলভারটাকে দেখিয়ে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলেও হাসি মিলনের সঙ্গে খাট থেকে নেমে পড়ল।

নিঃশব্দে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াতেই চাপা গর্জন কানে এল। জন্তুটা ওদের গন্ধ এখন ভালোভাবে পেয়ে গেছে। দরজায় আঁচড়ের শব্দ হল। দ্রুত ইঞ্জিনঘরে ঢুকে ইঞ্জিন চালু করতে গিয়ে মিলন আবিষ্কার করল, কোনও আওয়াজ হচ্ছে না। ইঞ্জিনটা এবার সত্যি-সত্যি বিকল হয়ে গিয়েছে। ওর শব্দ দিয়ে জন্তুটাকে ভয় পাওয়ানো যাবে না।

দরজাটা ভেঙে পড়ার আগে কিছু করা দরকার। মিলন ইঞ্জিনের সামনের জায়গাটা ধীরে-ধীরে খুলে ডেকের দিকে তাকাতেই সেই বিশাল কালো জন্তুটাকে দেখতে পেল।

টের পেয়ে লাল চোখ তুলে তাকে দেখছে, দ্রুত রিভলভার চালাল মিলন। জন্তুটা আচমকা বসে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি ওর মাথায় লাগতেই শরীরটা এলিয়ে পড়ল ডেকের ওপর। নিজের পিঠ মনে-মনে চাপড়ালো মিলন। জীবনে যে রিভলভার দ্যাখেনি, সে কী অবলীলায় জন্তু হত্যা করছে।

আলো জ্বালল মিলন। চোখে পড়ল, হাসি দু-হাতে মাথা ঢেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। কী হল ওর? তারপর অনুমান করল। রিভলভারের গুলির শব্দ খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে। এত কাছ থেকে ওই শব্দ শোনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ওর নেই।

মিলন দরজা খুলল। এটা সেই জন্তুটার দোসর যাকে সাপ আর কুমির ভাগাভাগি করে খেয়েছে। হয়তো আজ মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। এটা না বাঘ, না নেকড়ে। আবার হায়েনার থেকেও বেশ বড়। একটা লাঠি দিয়ে ওকে ঠেলতে গিয়ে বোঝা গেল, ওর ওজন কম নয়। কোনওরকমে ডেক থেকে লাশটাকে জলে ফেলতে পারল মিলন।

চারপাশ এখন অন্ধকারে ডুবে আছে, ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। এই জঙ্গলে আর কত এরকম ভয়ঙ্কর জীব আছে তা ঈশ্বরই জানেন।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেও হাসি মুখ থেকে হাত সরাল না। একটু মায়া হল মিলনের। সে নীচু হয়ে ওর হাতদুটো ধরে ওপরে টানল। হাসি কোনওমতে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ বন্ধ, শরীরে ঈষৎ কাঁপুনি।

মিলন ওকে ঝাঁকাল, 'আরে! এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। ওটা মরে গেছে। আর কোনও ভয় নেই। চোখ খোলো।'

এতগুলো কথা, অথচ মানে বুঝতে পারল না হাসি। তার মাথা ধীরে-ধীরে মিলনের বুকে নেতিয়ে পড়ল। তারপর দু-হাতে মিলনকে জড়িয়ে ধরল।

অসাড় হয়ে গেল মিলন। হাসির সমস্ত শরীর এখন তার শরীরে লেপ্টে আছে। গলায় গরম শ্বাস পড়ছে, শিরায়-শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত উত্তাল হচ্ছে তার। ঝিনুক তাকে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছে।

এখন সেই অভিজ্ঞতা সহজেই কাজে লাগাতে পারে সে। কিন্তু মেয়েটা এখনও কাঁপছে। এই কাঁপুনি সতর্ক করল মিলনকে। এই মুহূর্তে হাসি অসহায়। তার আশ্রয়ে আছে। ওর অসহায়ত্বের সুযোগ নিলে ঝিনুকের কাছে কী কৈফিয়ত দেবে? ঝিনুক তো তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি মন বলে উঠল, 'দূর। ঝিনুক মিথ্যেবাদী মেয়ে। যা বলে গেছে, তার সবটাই মিথ্যে। আর কোনওদিন ঝিনুক ফিরে আসবে না। তা ছাড়া, ঝিনুক যে সতী, তার কি প্রমাণ আছে? যে মেয়ে একদিনের আলাপে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে পারে, শরীরের আনন্দ নিতে পারে, তার জীবনে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেক পুরুষ এসেছে, চলে গিয়েছে। অতএব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলো মিলন।'

দুই মনের যখন চাপান-উতোর চলছে, তখনই হাসি চোখ খুলল। আঙুল আর মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জন্তুটা কি মরে গেছে?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল মিলন। শোনামাত্র মিলনকে ছেড়ে হাসি চলে গেল শোওয়ার ঘরে। গিয়ে গ্লাস তুলে নিয়ে আরাম করে বসল।

আরও আধঘণ্টা পান করার পরে ওরা দুজনে ভাত এবং কাঁকড়ার ঝাল পেট ভরে খেয়ে নিল। হাতমুখ ধুয়ে চুরুট ধরাল মিলন। লঞ্চ এখন দুলছে। সম্ভবত জোয়ার এসেছে। লোহার শেকল ছেঁড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাসি নিজের ভাষায় জড়িয়ে-জড়িয়ে কিছু বলে মিলনের বিছানায় চলে গিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। চুরুট খেতে ইচ্ছে করছিল না আর।

জানলা সামান্য খুলে ওটাকে জলে ফেলে দিল মিলন। তারপর মোমবাতি নিভিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল। না, আজ আর নরম হবে না। মেয়েটাকে জমিতেই থাকতে হবে, যতদিন না কেউ ওকে নিয়ে যেতে আসে। তার পক্ষে লঞ্চের মেঝেতে শোওয়া সম্ভব নয়।

মিলন ডাকল, 'হাসি, উঠে পড়। নীচে নেমে শোও!'

মেয়েটা নড়ল না। বাধ্য হয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকাল সে। তার প্রতিক্রিয়ায় হাসি দেওয়ালের দিকে শরীরটাকে নিয়ে গেল। প্রায় দেওয়াল চেপে শুয়ে থাকল। মরিয়া হয়ে মিলন খাটের এপাশে শরীর এলিয়ে দিল। দুই তৃতীয়াংশ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে হাসি। ওর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে মিনিটখানেক যাওয়ার পর অস্বস্তিটা কাটল। মদের প্রতিক্রিয়ায় ঘুম এসে গেল তার।

কখন যে ভোর হয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি মিলন। ঘুম ভাঙতেই আলো চোখে পড়ল এবং আবিষ্কার করল, তার কোমরের কাছে মুখ রেখে হাঁটু মুড়ে ঘুমোচ্ছে হাসি। ওকে এখন শিশুর মতো দেখাচ্ছে। মিলন নড়তেই মুখ তুলল। চারপাশে তাকাল। তারপর মিলনকে ডিঙিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল।

দরজার দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল হাসি। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে-হাসতে চলে এল খাটের কাছে। চোখ বন্ধ করল মিলন। গেঞ্জি গুটিয়ে গিয়ে ওপরে উঠে গেছে। হাসির উদ্ধত বুক এখন প্রায় উন্মুক্ত। কিন্তু ওব্যাপারে তার কোনও খেয়াল নেই। নীচু হয়ে মিলনের ঠোঁটে চুমু খেয়ে কয়েকটা কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাসি।

কী কথা বলল, বুঝতে পারল না মিলন। কিন্তু বলার ভঙ্গিতে মনে হল ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সারারাত পাশে শুয়েও মিলন যে সংযম দেখিয়েছে, সেই কারণে কৃতজ্ঞতা? মিলন শ্বাস ফেলল বেশ জোরে। এ সবই ঝিনুকের জন্যে। ঝিনুক বিশ্বাস করবে তো? কোনও পুরুষ ওরকম আগুনের মতো শরীরের পাশে সারারাত শুয়েও কি নির্লিপ্ত থাকতে পারে!

আজ লঞ্চটাকে চালু করে পাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইঞ্জিন প্রাণহীন। অতএব বাধ্য

হয়ে চেনটা ধরে টানতে হল। সেই টানে লঞ্চ পাড়ে এল। সন্ধেবেলায় বড় লাঠি দিয়ে ওটাকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় ছায়ার মতো হাসি মিলনের সঙ্গে হাঁটছিল। পুরো পথ মিলন কোনও কথা বলেনি। জমিতে ঢোকার আগে হনুমানটা গাছের ডালে বসে চেঁচাতে লাগল। ওরা জমিতে পা রাখতেই বোবা লোকটা এগিয়ে এসে হাত নেড়ে যা বোঝাতে চাইল, তা প্রথমে মাথায় ঢোকেনি মিলনের। লোকটা ওকে নিয়ে গেল মুরগির খাঁচার কাছে। খাঁচার বেড়া ভাঙা। একটাও মুরগি নেই। দুটো আধখাওয়া মুরগি পড়ে আছে।

'এর আগে কখনও এমন হয়েছে?' মিলন জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল লোকটা, না।

'শেয়াল বা নেকড়ে হতে পারে। ওদের তো কার্বলিক অ্যাসিডে আটকানো যায় না।'

গোঙানির শব্দ তুলে লোকটা জোরে-জোরে মাথা নাড়ল। তারপর হাত দুপাশে ছড়িয়ে বোঝাল, জন্তুটা বেশ বড়। সে টঙে বসে ওটাকে দেখেছে।

আর-একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ঢুকল। এতদিন ওই সব জন্তুরা এদিকে আসেনি। আজ এল কেন? ধীরে-ধীরে সে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে কোনও নৌকো নেই। জলের গভীরতা বেশি নয় বলেই বোধহয় এদিকে জাহাজ দেখা যায় না।

হঠাৎ পায়ের নীচের বালি নড়ে উঠল। প্রথমে অল্প, তারপর এমন ঝাঁকুনি শুরু হল যে মিলন ছিটকে পড়ে গেল। ভূমিকম্প হচ্ছে। সে ওই অবস্থা থেকে উঠে দৌড়ে জমির দিকে আসতেই দেখল টংটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নীচে। বোবা লোকটা মাটিতে শুয়ে আছে। হাসি উবু হয়ে বসে তাকে ইশারা করছে, বসে পড়তে।

মিলন পেছন ফিরল। সমুদ্রের জল অনেকটা উঠে এসে আবার নীচে নেমে যাচ্ছে। ভূমিকম্প হয়েই চলেছে। ওপাশের একটা বড় গাছ ভেঙে পড়ল শব্দ করে। পায়ের তলায় কাঁপুনি থামলে লোকটা উঠে এল মিলনের পাশে। তারপর হাতজোড় করে ওপরের দিকে তাকিয়ে তার গোঙানির ভাষায় বোধহয় প্রার্থনা করতে লাগল।

হঠাৎ হাসি চিৎকার করে সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলল।

সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মিলন। দিগন্ত দেখা যাচ্ছে না। সেখানে যেন বিশাল পাহাড় জেগে উঠেছে। পাহাড়টা দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

সামুদ্রিক জলোচ্ছাস! কিছুক্ষণের মধ্যে ওই জলের পাহাড় ঝাঁপিয়ে পড়বে এই দ্বীপের ওপর। মৃত্যু একেবারে সামনে। আশ্রয় নেওয়ার কোনও জায়গা নেই। লোকটা সেই দৃশ্য দেখে দৌড়ে জমির বাইরের গাছটায় উঠতে গেল। তার পেছন-পেছন হনুমানটাও।

আচমকা লঞ্চের কথা মনে এল। যত জলই হোক, লঞ্চ জলে ভাসবে। বাঁচার একমাত্র উপায় লঞ্চের ভেতর আশ্রয় নেওয়া। মিলন চিৎকার করে লোকটাকে বলল তাকে অনুসরণ করতে। তারপর হাসির হাত ধরে দৌড়ল।

গাছের ডালে মুখ হাত ছড়ে গেল। কিন্তু গতি কমাল না মিলন। হাসির হাত ছেড়ে দিয়েছে সে জঙ্গলে ঢোকামাত্র। হাসিও বুঝে নিয়েছে, মিলন কোথায় যেতে চাইছে। নদীর কাছে পৌঁছবার আগেই পায়ের পাতায় জলের স্পর্শ পেল ওরা।

নদীটাকে এখন চেনা যাচ্ছে না। জল বেড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে নদী। লঞ্চ উঠে এসেছে পাড়ের গায়ে। চেনটার টানে একপাশে কাৎ হয়ে গেছে। হাসিকে তুলে দিয়ে নিজে লঞ্চে উঠল সে দু-হাতের ওপর ভর করে। তারপর শেকলটা খুলে দিল লঞ্চ থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে সোজা হয়ে গেল লঞ্চ।

মিলন চিৎকার করল। কিন্তু বোবা লোকটার কোনও হদিস নেই। ওপাশের জঙ্গলে শব্দ

হচ্ছে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! জঙ্গলের গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে প্রবল জলের ঢেউ আছড়ে পড়ল নদীর ওপর। তার ধাক্কায় লঞ্চ কাগজের নৌকোর মতো চলে এল মাঝ নদীতে। তারপর স্রোতের টানে ছুটতে লাগল আরও ভিতরে।

মিলন হাসিকে নিয়ে লঞ্চের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে দেখতে-দেখতে মিলনের মনে হল, তারা এখন ভেলায় বসে আছে। ডুবে যাওয়ার আগে লঞ্চ যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় লঞ্চ কেঁপে উঠল।

পড়ে যেতে-যেতে হাসি তাকে জড়িয়ে ধরল। মিলন অবাক হয়ে দেখল লঞ্চ স্থির হয়ে গিয়েছে। সে বাইরের ডেকে চলে এল হাসিকে ছাড়িয়ে।

একটা বিশাল গাছের ডালের মধ্যে জড়িয়ে গেছে লঞ্চ। গাছটা নদীতে ভাসছিল। একটু স্বস্তি হল। যাক, এর ফলে ডোবার সম্ভাবনা কমে গেল। সে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

দ্বীপটা অদৃশ্য। সেখানে সমুদ্রের জল থইথই করছে। তার মানে বোবা লোকটা আর তার হনুমান আর বেঁচে নেই।

সারাদিন ধরে লঞ্চ স্থির হয়ে থাকল গাছের সঙ্গে। এর মধ্যে ওরা টিনের মাছ আর ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নিয়েছে। হাসির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল মিলন। এত কাণ্ডের পরও মেয়েটার মুখ থেকে হাসি মুছে যাচ্ছে না।

দুপুর থেকে জল বেড়েছে অনেকটা। মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে গাছ থেকে খসে যাবে লঞ্চ। তার ওপর আকাশে মেঘ জমছে দ্রুত। বিকেলের আগেই অন্ধকার নেমে এল। সারাদিন ধরে লঞ্চের যন্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে মিলন। নীচের দিকে কী ক্ষতি হয়েছে তা ওপর থেকে দেখা সম্ভব নয়। আর দেখতে পেলেও সারাবার বিদ্যে তার নেই।

শেষপর্যন্ত একটা ছেঁড়া তার পেয়ে গেল সে। তারটার দুটো মুখ জুড়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালুর বোতাম টিপতেই সেটা গর্জন করে উঠল। তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিল মিলন। যদি লঞ্চ নড়াচড়া করে, তাহলে গাছের আশ্রয় সরে যাবে।

লঞ্চে কয়েকটা লাইফবেল্ট আছে। লঞ্চ ডুবে গেলে ওগুলো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাতে চেপে কতক্ষণ ভেসে থাকতে পারবে তারা?

দ্বীপ যখন জলের তলায়, তখন বনের প্রাণীগুলোও আর বেঁচে নেই। কুমিরগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। চারধার এখন কী ভয়ঙ্কর চুপচাপ। ডেকের দরজা বন্ধ করে ভেতরে এল মিলন। এই জলোচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই সুনামির কারণে। গোটা পৃথিবীর মানুষ এতক্ষণে জেনে গিয়েছে দ্বীপগুলোকে সমুদ্র গ্রাস করেছে। তাহলে কি সরকার উদ্যোগী হবে না, কেউ বেঁচে আছে কিনা খবর নিতে?

দরজায় দাঁড়িয়ে মিলন দেখল হাসিকে। কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে হাসি। মুখের হাসির ধরনটা বদলে গিয়েছে। সে ঘরটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

হাসি মাথা নাড়ল।

ঘরে ঢুকে খাটে বসতেই হাসি পেছনে লুকিয়ে রাখা গ্লাসটাকে দেখাতে বাধ্য হল। রেগে গেল মিলন, 'আশ্চর্য! এই অবস্থায় তুমি মদ খাচ্ছ।'

গ্লাস কেড়ে নিতে গেল সে। অথচ হাসি দেবে না কিছুতেই। গ্লাসের মদ মেঝের ওপর গড়িয়ে গেল।

গ্লাস ফেলে দিয়ে হাসি জড়িয়ে ধরল মিলনকে। তারপর একের-পর-এক চুমু খেয়ে যেতে লাগল ওর ঠোঁট, গাল, গলায়।

কয়েক সেকেন্ড চলে গেল। মিলনের মনে হল হাসির দুটো ঠোঁট এক হয়ে সাপের ছোবল

মারছে। খুব দ্রুত তার রক্তে বিষ ঢেলে দিচ্ছে। একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

ঝিনুক, ঝিনুক কোথায়? ওর ওখানে, বিন্দুতে কি সুনামি হয়েছে? সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় মন বলল, 'দূর! ঝিনুকের দেখা আর কখনও পাবে না তুমি। সমুদ্র দুদিককেই গ্রাস করে ফেলেছে।'

মিলন তাকাল। আবছায়ায় হাসি এখন রহস্যময়ী। তার দিকে চোখের কোণে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে তার গেঞ্জিটা তুলে আনল মিলন। আহা, পৃথিবীটা কী সুন্দর!

দুজন মানুষ পরস্পরকে সাপের মতো জড়িয়ে শুয়েছিল লঞ্চের কেবিনঘরের খাটে। আগ্নেয়গিরির সব লাভা বের হয়ে গেলে সে মৃতের মতো হয়ে যায়।

মিলনের মনে হচ্ছিল অনন্তকাল এইভাবে থেকে গেলে ভালো হয়। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। মিলনের মুহূর্তে ওটা তেমন সক্রিয় ছিল না। এখন ফিরে এল। সে ধীরে-ধীরে হাতটা হাসির পেটের ওপর নিয়ে গেল। ঠিক মাঝখানে রাখার পর বুঝল, ওটা উঁচু। বেশ উঁচু। একটু টাইট এবং চর্বি নয়।

তাকে হাত বোলাতে দেখে হেসে উঠে বসল হাসি। নিজেই টেনে নিয়ে মিলনের হাত রাখল পেটে। তারপর মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

সর্বনাশ। উঠে বসল মিলন। মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসে গেছে। এই ক'দিনে সে বিন্দুমাত্র টের পায়নি। হয়তো চার কি পাঁচ মাসের ভ্রূণ ওর পেটে। বাইরে থেকে যা বোঝা যায়নি। হাত সরিয়ে নিল মিলন।

কিন্তু কার বাচ্চা এটা? ওকে যখন অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন কি ওর দ্বীপের মানুষ জানত কথাটা? আর সেটা ওদের অপছন্দ ছিল বলেই কি আর এসে ফিরিয়ে নিয়ে যায়নি?

খুব রাগ হয়ে গেল মিলনের। আগে জানা থাকলে গর্ভবতীর সঙ্গে কখনও সঙ্গম করত না সে। ব্যাপারটা হাসির জানানো উচিত ছিল।

লঞ্চ দুলছে। হাসি হাতড়ে-হাতড়ে চলে গেল টয়লেটে। অদ্ভুত এক পাপবোধে আক্রান্ত হওয়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল মিলন। ঝড় উঠেছে, সে টের পায়নি।

একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে লঞ্চ ছুটতে লাগল। যখন সোজা ছুটছিল তখন একরকম, যখন মুখ ঘুরে যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল উলটে ডুবে যাবে। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে লাইফবেল্ট পরে নিল মিলন। তখনই চলে এল হাসি। হাত বাড়িয়ে সে-ও লাইফবেল্ট নামিয়ে নিয়ে গলায় পরল। বেশ ভালো গয়না পরেছে, এমন ভঙ্গিতে হাসতে লাগল পাশে দাঁড়িয়ে। লঞ্চের ভেতর এখন যথেষ্ট অন্ধকার। বাইরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতেই মিলন দেখল খোলা গেঞ্জিটা আর পরেনি হাসি।

যদি লঞ্চ ডুবে যায়, তাহলে এই ঘরের মধ্যেই মরে পড়ে থাকতে হবে! জলের তলায় চলে গেলে আর দরজা খুলে বেরুতে পারবে না। মিলন সন্তর্পণে ডেকের দরজা খুলল। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জল আছড়ে পড়ছে ডেকের ওপর। লঞ্চটা ছুটছে সামনে।

হাসি পাশে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে জল স্পর্শ করল। তারপর চটপট বারমুডা খুলে ভেতরে রেখে ডেকের ওপর চলে গেল। ওর শরীরে এখন বৃষ্টি। মুহূর্তেই ভিজে গেল চুল, সর্বাঙ্গ। মিলন চিৎকার করে ডাকল, 'হাসি!'

হাসি ঘুরে দাঁড়াল। কিছু বলল।

মিলন চিৎকার করল, 'ভেতরে চলে এসো।' হাত নেড়ে ডাকল সে।

হাসি নিজের পেটে হাত রাখল। কিছু বলল।

বাধ্য হয়ে জলে ভিজে ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল। মেয়েটার মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে।

হঠাৎ হাউহাউ শব্দে কেঁদে উঠল হাসি। বারংবার হাত দিয়ে নিজের পেট দেখিয়ে কিছু বলে গেল।

'আমি তোমার কোনও কথা বুঝতে পারছি না।' মিলন বলল।

আঙুলের ডগায় নিজের পেট দেখিয়ে সেই আঙুলটায় মিলনের বুক ছুঁয়ে মাথা নাড়ল হাসি। যার অর্থ, তুমি এটা পছন্দ করছ না। তারপর চারটে আঙুল দেখিয়ে সে যা বোঝাল তাতে মিলনের কাছে স্পষ্ট হল, চারজন মিলে তাকে ধর্ষণ করেছে। তাকে মেরে ফেলার জন্য কিছু খাওয়াত ওরা। জ্বর আসত।

এখন মিলনও তাকে অপছন্দ করছে। সে কী করবে?

এক ঝটকায় ডেকে চলে গেল হাসি। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নাচের ভঙ্গিতে স্নান করতে লাগল।

ঠিক তখনই ঝড়ের ধাক্কায় ঘুরে গেল লঞ্চ। ডানদিকটা কাত হয়ে গেল। মিলনের চোখের সামনে হাসির শরীরটা টুক করে জলে পড়ে গেল। বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার কানে এল।

হাসি চিৎকার করে সাহায্য চাইছে! ততক্ষণে লঞ্চ আবার সোজা হয়েছে। কিন্তু নিকষকালো অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বিরাট ঢেউগুলো ছোবল মারছিল লঞ্চের গায়ে।

চিৎকার থেমে গেল।

এখন সকাল। আকাশে সূর্য নেই। লঞ্চটা একটু কাত হয়ে ভেসে যাচ্ছে। মিলন কোনওমতে ডেকে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি নেই। হাওয়া আছে। চারধারে কোনও মাটির চিহ্ন নেই। কাল রাত্রে বাতাস লঞ্চটাকে সমুদ্রের ভেতরে নিয়ে এসেছে। এখানে হালকা ঢেউ। চারপাশে কোনও জীবন নেই। সামুদ্রিক পাখিরাও অদৃশ্য।

মিলন বসে পড়ল ডেকে। এইভাবে ভেসে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ লঞ্চে খাবার থাকবে, ততক্ষণ খেতে পারবে। অথবা একটা বড় ঢেউ যদি লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দেয় তাহলে—। কোনদিকে গেলে পায়ের তলায় মাটি পড়বে, সে জানে না। যদি কোনও জাহাজ তাকে উদ্ধার করে সেই আশায় অপেক্ষা করা।

অথবা শেষ শ্বাস ফেলার মুহূর্তের অপেক্ষার জন্যে এখন বেঁচে থাকা।